ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

চতুর্দ্দশ বর্ষ, ১৩১৭ সাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত সেবক রামচন্দ্র প্রবর্ত্তিত
ও সেবকমণ্ডলী সম্পাদিত।

তত্ত্ব-মঞ্জরী কার্য্যালয়।

৮০।১, করপোরেসন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার।

কলিকাতা, ৬ নং ভীম ঘোষের লেন,
গ্রেট ইডেন্ প্রেসে শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৮ সাল।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ এক টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসার।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণচরিত অতি সহজ ও সরল কবিতায় এই পুস্তকে লিখিত। সকলেরই পাঠ করা উচিত। বালকবালিকা ও গৃহলক্ষ্মীগণের বিশেষ পাঠোপযোগী। মূল্য চারি আনা।

—০—

শ্রীরামকৃষ্ণ অষ্টকালীন পদাবলী।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলারস যিনি আস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহার এই পুস্তক পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। পাঠে মনোপ্রাণ ভাবে বিগলিত হইবে। মূল্য চারি আনা। ৮০।১ করপোরেসন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, তত্ত্বমঞ্জরী কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

———

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

বৈশাখ, সন ১৩১৭ সাল।

চতুর্দ্দশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

'নমো রামকৃষ্ণায়'।

আবার আসিল, জগৎ হাসিল,
আনন্দে ভাসিল প্রকৃতি-রাণী।
জয় রামকৃষ্ণ, জয় সমন্বয়,
চারিদিকে আজি উঠিল বাণী॥

ভক্তজন কয় ভক্তিমাত্র সার,
নাই অন্য পথ জগতে আর।
কর্ম্মী ক'ন কর্ম্ম, এক কর্ণধার,
এ ভবসমুদ্র করিতে পার॥

জ্ঞানের মাহাত্ম্য, প্রচারে জ্ঞানীরা,
জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাহিক হয়।
গোলক ধাঁধায়, পড়িয়া মানব,
ইতস্ততঃ ঘুরে পথ না পায়॥

এদিকে আবার, নাস্তিকের দল,
ধরমের নামে শিহরি উঠে।
বিজ্ঞানবাদীরা, রহস্য প্রকাশে,
ফলে কিন্তু জড়-মাহাত্ম্য রটে॥

জিন, অমিতাভ, খৃষ্ট, মহম্মদ,
জগৎ মজিল যাঁদের প্রেমে।
রাম, কৃষ্ণ আদি, শঙ্কর, নিমাই
রাখে নিজ কীর্ত্তি আপন নামে॥

সকলে ডাকিল, সকলে মোহিল,
উদ্ধারিল কোটী মানবকুল।
হাত ধরি নরে, তুলিয়া সাদরে,
নিজ পথে ল'য়ে ভাঙ্গিল ভুল॥
কিন্তু কোথা হ'তে, এল আচম্বিতে,
সাম্প্রদায়িকতা ভেদের জ্ঞান।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব, দিয়া জলাঞ্জলি,
পরস্পরে নর হানিছে বাণ॥
তাই ধর্ম্ম-গ্লানি, অধর্ম্ম প্রবল,
হাহাকার রব জগৎ মাঝে।
ভেদিয়া অম্বর গেল সেই ধ্বনি,
মহাবিশ্বপতি যথায় রাজে॥
করুণাসাগরে উঠিল তরঙ্গ,
উঠে তথা হ'তে নূতন মূর্ত্তি।
মহিমা ছটায় জগৎ মাতায়,
প্রেমঘন কায়, মহান্ স্ফূর্ত্তি॥
নহে গো নূতন, নহে পুরাতন,
পাইল মানব অপূর্ব্ব পথ।
ধর্ম্ম-সমন্বয়, ভাব বিপর্য্যয়,
পুরাতন মাঝে নূতন মত॥
সকলি ত ছিল, ছিল না কেবল,
ধর্ম্ম-মহাসভা মিলন গান।
দূরে পলাইল, গোঁড়ামি অসার,
পাইল মানব নূতন প্রাণ॥
তাই লোকময়, লোকগুরু জয়,
সমস্বরে দেয় জগৎবাসী।
সমন্বয় গানে মত্ত ত্রিভুবন,
কে আছ কোথায় দেখ গো আসি॥

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

নবযুগের নব সংবাদ।

"The breeze of His Grace is blowing night and day over thy head. Unfurl the sails of thy boat (mind) if thou wantest to make rapid progress through the ocean of life."

Sayings of Ramkrishna by

Prof. Max Muller, K. M.

এখন বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না যে, ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এ মরজগতে অবতীর্ণ হইয়া পয়োদাচ্ছন্ন ভারতাকাশে একদিন চপলার মত প্রতিভাসিত হইয়া ভারতের এবং ভারতেতর দেশের যেরূপ ভাবে সংজ্ঞা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, অন্যান্য কর্ম্মপ্রবণ দেশের কথা দূরে থাক্, অন্ততঃ ভারতের মত আলস্যপরায়ণ দেশেও কর্ম্মপ্রবণতা দেখা দিয়াছে। ভারত এখন নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত। ঋষি মুনিগণের ভারতবর্ষ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন সভ্যদেশ নিচয়, ভারতের ভবিষ্যৎ আর তমসাপূর্ণ বলিয়া বলেন না। পাশ্চাত্য জগতের বৃহস্পতি মোক্ষমূলার এ সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যাক্;—"A Country permeated by such thoughts as were uttered by Ramkrishna cannot possibly be looked upon as a country of ignorant idolaters to be converted by the same methods which are applicable to the races of Central Africa." অর্থাৎ যে দেশ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চারিত ভাবসমূহে অনুপ্রাণিত, সে দেশকে মধ্য-আফ্রিকার অজ্ঞ পৌত্তলিকপূর্ণ দেশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না এবং তাহাদিগকে যে প্রণালীতে পরিবর্ত্তন করা যায়, এ জাতিকে সে প্রণালীতে পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না। পণ্ডিতপ্রবরের এ বাক্য নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যে দিন কেশববাবু সর্ব্বপ্রথমে এ সংসারকে সেই অমৃতের—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের—অংশী হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই-দিনই দক্ষিণেশ্বর নিজ মহিমায় মহিমান্বিত। সাধু কেশবচন্দ্র চিনিলেন বটে, কিন্তু সে অমৃত বিতরণের ভার ভগবান রামচন্দ্র, নরেন্দ্রাদি ভক্তদের উপর ন্যস্ত করিলেন। কেননা কেশবচন্দ্রের পক্ষে তাঁহার সেই ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের বেড়া ভাঙ্গিতে কিছু ক্লেশসাধ্য হইত। আমরা কিন্তু অন্য আলোকে এ বিষয়টীর ভাব গ্রহণ করি। সকলেই জানেন কেশবচন্দ্রের জন্য রামকৃষ্ণের কি ব্যাকুলতা

রামকৃষ্ণ তাঁহার আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য, তাঁহার কিসে শরীর আরোগ্য হইবে তার জন্য, কেশব কি করিয়া তাঁহার সঙ্গে যখন তখন দেখা করিতে পারে, তজ্জন্যও মার কাছে বারম্বার প্রার্থনা করিতেন। কখনও কেশবের বেশী অসুখ শুনিলে অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ডস্থল দিয়া দর দর ধারে বহিয়া যাইত। কেশবও তাঁহাকে না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না। রামকৃষ্ণ তাঁহার গৃহে গেলে সমস্ত কামরায় বিশেষতঃ তাঁহার ভজনালয়ে তাঁহাকে লইয়া যাইতেন। বিশ্বাস, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পদরজে সমস্ত বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে। যখন এত মাথামাথি, পরস্পরে এতটা টান, তখন কেশবচন্দ্র একটা আলাদা দল করিয়া থাকিলেন কেমনে? রামকৃষ্ণদেবই বা সেই কেশব-লৌহখণ্ডকে আপনার চুম্বকত্বের জোরে টানিয়া না লইলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর স্বামী বিবেকানন্দ দিউন। তিনি জগৎ সমক্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘোষণা প্রচার করিতে যাইয়া বলিতেছেন :—

"মতামত, সম্প্রদায়, চার্চ্চ বা মন্দিরের অপেক্ষা করিও না। প্রত্যেক মানুষের ভিতর যে সারবস্তু রহিয়াছে অর্থাৎ ধর্ম্ম, তাহার সহিত তুলনায় উহারা তুচ্ছ; আর যতই এই ভাব মনুষ্যের মধ্যে বিকশিত হয়, তাহার ততই জগতের কল্যাণ করিবার শক্তি হইয়া থাকে। প্রথমে এই ধর্ম্মধন উপার্জ্জন কর, কাহারও উপর দোষারোপ করিও না, কারণ সকল মতে সকল পথে কিছু না কিছু ভাল আছে। তোমাদের জীবন দিয়া দেখাও যে, ধর্ম্ম অর্থে কেবল শব্দ বা নাম বা সম্প্রদায় বুঝায় না, কিন্তু উহার অর্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যাহারা অনুভব করিয়াছে, তাহারাই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে। কেবল যাহারা নিজেরা ধর্ম্মলাভ করিয়াছে, তাহারাই অপরের ভিতর ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত করিতে পারে, তাহারাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আচার্য্য হইতে পারে। তাহারাই কেবল জগতে জ্ঞান-জ্যোতিরূপে শক্তিসঞ্চার করিতে পারে।"(১) সুতরাং ভাল করিয়াই বুঝিলাম যে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না,—কেশব যাহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতেন; কোন রেজেষ্টার ছিলনা, কেশব যাহাতে নাম লেখাইতে পারিতেন; বা কোনও বেড়া ছিল না, যাহার মধ্যে কেশবকে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত। ভগবান্ এই স্থলে দেখাইলেন যে, ধর্ম্ম প্রাণের ভিতর। বাহ্য বস্তুতে তাহা আবদ্ধ নহে। সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি ধর্ম্মের—প্রকৃত ধর্ম্মের নিকট স্থান পাইতে পারে না।

(১) মদীয় আচার্য্যদেব, ৩২ পৃষ্ঠা।

প্রবল বন্যার সম্মুখে মহা মহা বটবৃক্ষ যেমন উৎপাটিত হইয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম্ম বন্যায় জোরে সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, বাক্ পটুতাদি ভাসিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আমাদের এই নবযুগের ইহা একটী নব সংবাদ।

এ'র পর আমরা আর একটু অগ্রসর হই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসংঘের প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে, তিনি কামিনীকাঞ্চনকে ভগবৎ পথের বিষম কণ্টক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবানকে পাইতে হইলে শিশু হইতে হইবে। তবে তিনি মার মত কোল পাতিয়া ব্যাকুলপ্রাণ ভক্তকে আলিঙ্গন করিবেন। কয়জনা তৎপ্রণোদিত শিশুত্বের অধিকারী হইয়া তাঁহার দর্শনকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে? যাহারা তেমন হয়, তাহারাই তাঁহার চরণতলে আশ্রয় পাইবার যোগ্য। তিনি নিজে সে ভাবটী কি সুন্দর ভাবে সাধন করিয়াছেন, তাহা নিম্নোক্ত পংক্তিমালা হইতে আমরা অবগত হইতে পারি।

"স্ত্রীকে মাতৃভাবে জ্ঞান করিয়া রামকৃষ্ণদেব আরও এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, যুবাকাল পর্য্যন্ত কামিনী হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে হইলে পাছে বিভীষিকায় পতিত হইতে হয়, বিশেষতঃ তাহার প্রচুর প্রলোভনও রহিয়াছে, সেই জন্য তিনি স্ত্রী মাত্রেই মাতৃভাব শিক্ষা করিবার ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যদ্যপি বাল্যকাল হইতে স্ত্রী জাতিকে মাতৃভাবে উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই সংস্কার বদ্ধমূল হইলে কখন কাহার পদস্খলন হইতে পারে না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কামিনী সম্বন্ধে তাৎপর্য্য এই যে;—সামর্থ্য লাভ করিয়া, মনুষ্যের ন্যায় অবস্থাপন্ন হইয়া মনুষ্যোচিত কার্য্য করিলে মনুষ্যজন্মের সাফল্য হয়। তিনি তজ্জন্য বলিতেন যে, যে প্রকার কাঁঠাল ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে হস্তে তৈল মাখিতে হয়, তাহা হইলে আর কাঁঠালের আঠা ধরিতে পারে না, সেই প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়া সংসার অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনের সম্বন্ধ স্থাপন করিলে কোন দোষ হয় না। অথবা ধূলাপড়া মন্ত্র না শিক্ষা করিয়া কেহ সাপ ধরিতে পারে না। ধূলাপড়া জানলে সর্প ধরা দূরে থাকুক, সাতটা সাপ গলায় জড়াইয়া রাখা যাইতে পারে। সেইরূপ আত্মজ্ঞানরূপ ধূলাপড়া শিক্ষা করিয়া কামিনীর সম্বন্ধ স্থাপন করিলে তাহার কখন অকল্যাণ হইবার সম্ভব থাকিবে না?"—সেবক রামচন্দ্র কৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

এ ভাব সেই ঋষিগণের ভাব। যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া মুনিগণ সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্যের বিধান করিয়া গিয়াছিলেন, এ ভাব তাহার পূর্ণ বিকাশ

বলিয়া জানিতে হইবে। ভগবান্ আপন জীবনে এই ভাবটী সাধন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। শিশুর মত ভগবানের নিকট আব্দার করিয়া মা মা বলিয়া তাঁহাকে আপনার চেয়ে আপনার মত জ্ঞান করিতে পারিলে, ভক্তাধীন ভগবান কখনও দূরে থাকিতে পারিবেন না। আমাদের নব-যুগের এ আর একটী শুভ সংবাদ।

সবই আছে, ছিল বা থাকিবে। তবে যিনি তাহা নিজে সাধন করিয়া লোকবুদ্ধির অন্তর্গত করিয়া যান, তিনিই লোকমণ্ডলে পূজ্য। গুরুকে কিরূপ ভাবে ধরিতে হইবে, তাহা বহুকালাবধি যেন কেহ জানিত না, এমত অবস্থা হইয়াছিল। ভগবান রামকৃষ্ণ সেই গুরুতত্ত্ব যেরূপ ভাবে উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বহু গুরু এবং বহু শিষ্যের নয়নোন্মিলন হইয়াছে এবং হইবে। গুরুর কার্য্য হইয়াছিল—বৎসরে বৎসরে পাওনাটা আদায় করা; আর শিষ্যের কার্য্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া যথাসাধ্য অর্থ দানে গুরুর সন্তোষ লাভ করা। বলিতে কি, এখনও পর্য্যন্ত এমন অনেক গুরু এই ভাবত-ভূমিতে বিচরণ করিতেছেন। সুতরাং ধর্ম্মরক্ষক, ধর্ম্মভক্ষক সাজিয়া ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে যে কি অনর্থ সংঘটন করিয়াছিলেন, ভাবিলে মহাতঙ্ক উপস্থিত হয়। সংসারের ধর্ম্ম এই যে, যদি তুমি আমার মন কিনিয়া লইতে পার, তবে 'আমায় মান্য কর, শ্রদ্ধা কর বা ভক্তি কর' ইত্যাদি তোমায় বলিতে হইবে না। আমি আপনিই তোমায় না দেখিলে অন্নজল গ্রহণ করিতে পারিব না, সুকোমল শয্যায় শুইতে পারিব না, বা নিত্য নৈমিত্তিক কোনই কার্য্য করিতে পারিব না; তোমার কথায় নয়, তোমার কাজে আমার প্রাণ গলিয়া যায়। কিন্তু আমাদের তথাকথিত গুরুগণ কাজে আকর্ষণ না করিয়া কথাই সার করিতে প্রয়াসী হইলেন। কাজেই আজকাল গুরুশিষ্যের পরস্পর ভাব একটু স্থির মনে দেখিতে গেলে, যুগপৎ হাস্য ও দুঃখের সঞ্চার হইয়া থাকে। যতদিন এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত গুরুতত্ত্ব ভারতে আধিপত্য স্থাপন না করে, ততদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রকৃত অভ্যুত্থান হইবে না। আর ধর্ম্মের উত্থানের সঙ্গে, যখন ভারতের জাতীয় জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তখন নিঃসন্দেহে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, গুরুতত্ত্বের প্রকৃতমর্ম্ম না বুঝা পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় জীবন বিকলাঙ্গ হইয়া থাকিবে। গুরুকে কিরূপ ভাবে দেখিতে হইবে, আমরা তাহা সাধুবাক্য উদ্ধার করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

"বিশ্বাসী শিষ্য হইলে গুরু তাহার নিমিত্ত বা হেতুমাত্র হইয়া থাকেন,

কিন্তু কার্য্য করেন স্বয়ং ভগবান্। কারণ গুরুকে মনুষ্য বলিলে, ভগবান্ ভাব বিচ্যুত হয়, সুতরাং তথায় ভগবানের কার্য্য হইতে পারে না। ভগবান্ না থাকিলে, ভগবান্ কি জন্য কার্য্য করিবেন? তাঁহাকে না ডাকিলে, তিনি কি জন্য প্রত্যুত্তর দিবেন? এই নিমিত্ত যাহাকে ভগবান্ লাভ করিতে হইবে, তাহাকে ভগবান্‌কেই চিন্তা করিতে হইবে। ভগবানের ভাব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হয়, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই সাধকের ভগবান দর্শন হইবার সম্ভাবনা। অতএব **গুরুকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস না করিলে কস্মিনকালেও কাহারও ভগবানলাভ হইতে পারে না।** গুরু যাহা বলিয়া দিবেন, তাহাতে যুক্তি তর্ক বা অবিশ্বাস করিলে কখন কেহ সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে না।" সেবক রামচন্দ্রের গুরুতত্ত্ব।

আমরা গুরুগতপ্রাণ রামচন্দ্রের গুরুতত্ত্ব পাঠ করিতে প্রত্যেক ধর্ম্ম-পিপাসুকে অনুরোধ করি। যদি কখন তাঁহার জীবনালোচন এ ক্ষীণ-লেখনীপ্রসূত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবেই দেখাইতে প্রয়াস পাইব যে, ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, রামচন্দ্রকে দিয়া কিরূপ গুরুভক্তির জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত সংসারকে দেখাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং গুরুতে ভগবান-বোধ,—এ নবযুগের একটী বিশেষ গুরুতর এবং নবীন সংবাদ।

সকলেই জানেন যে ভারত ধর্ম্মছাড়া বাঁচিতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান বা ধারণাটা কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়া ছিল। ভগবান্ 'ধর্ম্ম সংস্থাপনায়' আসিয়া সে জ্ঞানটী পুনরুদ্দীপিত করিয়া দিয়াছেন। ভারতবাসী আবার ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—তাঁহার জীবনে যাহা কিছু ভাল কথা বলিয়াছেন,—সে সব তাঁহার নিজস্ব নহে, তাহা তাঁহার প্রাণেশ্বর রামকৃষ্ণদেবের। রামকৃষ্ণদেব যাহা নির্জ্জনে বলিলেন, বিবেকানন্দ তাহা ঢাকঢোল বাজাইয়া পৃথিবীময় প্রচার করিলেন। পাগলা প্রভুর সেই ধর্ম্মোন্মত্তমূর্ত্তি অব-লোকন করিয়া, বিবেকানন্দও উন্মত্ত হইয়াছিলেন। প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া-ছিলেন যে ধর্ম্মছাড়া আমাদের অন্য গতি নাই। ধর্ম্ম ব্যতীত অপর কিছুতে ভারতের জাতীয় জীবন-প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, স্বামীজীর নিজের কথাতেই আপনারা সে কথা বুঝিয়া লউন :—

"দেশে দেশে আগে যাও, এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ করে দেখো,

নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তারপর যদি মাথা থাকে ত ঘামাও, তার উপর নিজের পুরাণ পুঁথিপাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশ দেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতের চক্ষে দেখ, খাজা আহাম্মকের চক্ষে নয়, সব দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধ্বক্ ধ্বক্ কচ্ছে, উপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এ দেশের, প্রাণ ধর্ম্ম, ভাষা ধর্ম্ম, ভাব ধর্ম্ম;—আর তোমার রাজনীতি, সমাজ-নীতি, রাস্তা-ঝেঁটান, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এ সব চিরকাল এ দেশে যা হয়েছে, তাই হবে, অর্থাৎ ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে হয় ত হবে, নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র।"—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

ধর্ম্মই যে ভারতে প্রতি ধমনীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য স্বামীজীর কতই কথা উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাহা সম্ভব নয়। পুস্তক হইলে তবে মনের আশা মিটাইতাম। এখন দেখিলাম, এই ধর্ম্মকে ভারতীয় জীবনের মূলভিত্তি বলিয়া সাব্যস্ত করা এ নবযুগের একটী নব সংবাদ।

আজকাল যাঁহারা দেশের উন্নতিকল্পে ইচ্ছুক, আমাদের তাঁহাদিগকেও একটা নূতন সংবাদ দিবার আছে। যাঁহারা দেশের বার্ষিক আয়ব্যয় গণনা, দেশের জন্মমৃত্যু সংখ্যাকরণ বিদেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত নিজ দেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তুলনাদির উপর ভর দিয়া দেশের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা একটা কথার কথা নহে, কাজের কথা বলিব। যাহাতে গরীব দুঃখী বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া আপনাপন ও পরস্পর-উন্নতি বিধান করিতে পারে, এ চেষ্টাই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাদের করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের আত্মোন্নতিতেই দেশের উন্নতি। "বড় মানুষ, পণ্ডিত, ধনী, এরা শুন্‌লে বা না শুন্‌লে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করিলে, কিছুই এসে যায় না। এরা হচ্ছেন শোভামাত্র, দেশের বাহার! কোটী কোটী গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে দেশের প্রাণ।"

গরীবদের উন্নতিতে যে দেশের উন্নতি, তাহাদের অবনতিতে যে দেশের অবনতি, এই কথাটী ভুলিয়া গিয়া আমরা অনেক সময়ে দেখি যে, এক একটী লোকের জীবনব্যাপী দেশের কল্যাণার্থ পরিশ্রম শুধু পণ্ড হইয়াছে যায়। মনে পড়ে একবার দক্ষিণেশ্বরে দুটী অন্নের জন্য প্রার্থী ভিক্ষুকগণ মন্দির-দরওয়ানগণের দ্বারা প্রহৃত হইলে বিবেকানন্দের পাগলা প্রভু কাঁদিয়া

কাঁদিয়া মায়ের নিকট কত আক্ষেপই না করিয়াছিলেন! তদবধি গুরুগত-প্রাণ বিবেকানন্দ এই গরীবদের জন্য কিরূপ দেশ বিদেশে উপায় খুঁজিয়া স্থির করিয়াছেন—যাহার কার্য্য এখন প্রবলবেগে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দীন দরিদ্রের উন্নতিতে জাতির উন্নতি, নবযুগের এও একটী নব সংবাদ।

আপনারা—যাঁহারা রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের একটু খোঁজ খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, ভগবান রামকৃষ্ণদেবের নিকট কোন ধর্ম্মপন্থা নিন্দনীয় ছিল না। তিনি কাহাকেও তাঁহার নিজধর্ম্ম ছাড়িতে বলেন নাই। তিনি কাহারও বিশ্বাস নষ্ট করেন নাই। গঠনই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, বিনাশ নহে। স্বামী বিবেকানন্দ এই মর্ম্মে বলিতেছেন :—

Ramkrishna came to teach the religion of to-day, constructive, not destructive. He had to go afresh to Nature to ask for facts and he got scientific religion, which never says "Believe", but "See"; "I see, and you too can see". Use the same means and you will reach the same vision. God will come to every one, harmony is within the reach of all. Sri Ramkrishna's teachings are "The gist of Hinduism"; they were not peculiar to him. Nor did he claim that they were; he cared not for name or fame."——Inspired Talks.

আমরা আর একটী গুরুতর সংবাদ দিয়া আজকার মত প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জানিতে চাহেন, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধ কিরূপ? বিবেকানন্দই তাহাদিগকে তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় ইহার উত্তর দান করুন। আমরা নীরব থাকিলাম।

"কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের সার্ব্বলৌকিক ও সার্ব্বদৈশিক স্বরূপ, স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোক-সমক্ষে সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ লোকের হিতের জন্য আপনাকে প্রদর্শন করিতে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"

"এই নব যুগধর্ম্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান; এবং এই নব যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ পূর্ব্বগ যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণা কর।"

"মৃত ব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গত রাত্রি পুনর্ব্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সেরূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও।"

"যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাস-জাতি-সুলভ ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর।"

"আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলায় সহায়ক; এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।"

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, চন্দ্র তারকাদির কথা ছাড়িয়া দিলে, সামান্য খদ্যোতমালাও তমসাচ্ছন্নমার্গপ্রান্তে পতিত পথিকের পথপ্রদর্শনে সহায়তা করে জানিয়া, যদি ক্ষীণালেখনীসম্ভূত এই সব প্রবন্ধমালায় অহরহ সংসার তাপে সন্তপ্ত মানবমণ্ডলীর যৎকিঞ্চিৎ শান্তিবিধান করে, এই আশায় বারম্বার বাচাল হইয়া থাকি। সহৃদয় পাঠকপাঠিকামণ্ডলি! আপনারা নিজগুণে এই বাচালতা ক্ষমা করিবেন, কিন্তু বাচাল আবার সময়ে সময়ে বড়ই খাঁটি কথা বলিয়া থাকে, সে গুলির প্রতিও লক্ষ্য রাখিবেন, ইতি।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত।

উপাসনা।

আমাদের দেশে সকলেই উপাসনা করেন। হিন্দু সাকার মূর্ত্তির, ব্রাহ্ম ব্রহ্মের, খৃষ্টান খৃষ্টের এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িকগণ তত্তৎ উপাস্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাই যে, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকগণ হিন্দুর সাকার মূর্ত্তির উপাসনার মর্ম্ম না বুঝিয়া তাহাদের বহু ঈশ্বরোপাসক বলিয়া অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন। উপাসকের সমক্ষে উপাস্যের নিন্দা করা মহাপাপ। সংসারে যে যাহার উপাসনা করে, সে যদি তাহার উপাস্যের কখনও নিন্দা শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধেরও অধিক বেদনা অনুভব হয়, এ কথা বোধ উন্মাদ ব্যতীত সকলেই উপলব্ধি করিতে

পাবেন। আমরা আর কাহারও নিন্দায় ততটা দুঃখ বোধ করি না, যতটা ব্রাহ্মদের নিন্দায় করি, কারণ অন্যান্য সাম্প্রদায়িকদের সহিত আমাদের রক্তগত কি জাতিগত কোন সম্বন্ধই নাই, কিন্তু ব্রাহ্মদের সহিত আমাদের তাহা নয়, তাহারা আমাদের ঘরের ছেলে, তাই তাহাদের মুখে নিন্দা শ্রবণ করিয়া আমরা অধিকতর দুঃখ অনুভব করি। পরে গালাগাল দিলে ততদূর অপমান বোধ হয় না, যতদূর নিজের লোকে দিলে বোধ হয়।

আজ যাঁহারা যে কোন কারণ বশতঃই হউক ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া হিন্দুর দেবদেবী উপাসনার নিন্দা করিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে দেবদেবী উপাসনা করিতেন, তাহা বোধ হয় ইঁহারা অবগত নহেন, দেবদেবীর নিন্দা করিলে যে পিতৃপুরুষের নিন্দা করা হয়, তাহা বোধ করি ইহাদের উদার হৃদয়ে স্থান পায় না। আমাদের বোধ হয় প্রকারান্তরে পিতা পিতামহের নিন্দা করা বর্ত্তমান সভ্যতার একটী লক্ষণ। যাহা হউক, ইঁহারা পৈতৃক কার্য্য কুৎসিৎ ভাবিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরা আজও করি নাই, করিবও না। ধরিতে গেলে মূর্ত্তি-উপাসনা আমাদের নিজের সম্পত্তি। এ সম্পত্তি যে, কোন দোষে দুষ্ট নহে, তাই আমরা সাধ্যমত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব।

হিন্দু বহু ঈশ্বরের উপাসনা করে না। তবে বহু মূর্ত্তির উপাসনা করে বটে, কিন্তু সকল মূর্ত্তির মধ্যেই এক ঈশ্বর বিদ্যমান, "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" এই জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া বহু মূর্ত্তির মধ্যে এক ঈশ্বরের উপাসনা করে। যে বাস্তবিক জ্ঞানী, যে প্রকৃত দিব্য-দৃষ্টি সম্পন্ন, সে দেখে যে, হিন্দু একই ঈশ্বরকে কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া মাতা, পিতা, সখা, প্রভু প্রভৃতি ভাবে উপাসনা করিয়া থাকে। আর যে মূর্খ, যে ভাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ, সে, হিন্দু বহু ঈশ্বরের উপাসনা করে বলিয়া গালবাদ্য করিয়া হাসিয়া থাকে। • আমরা হিন্দু আমরা স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতেছি যে, হিন্দু সম্প্রদায় কখনই একাধিক ঈশ্বরের উপাসনা করে না।

হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর উপাসনা যে কুৎসিৎ, ইহার দ্বারা যে ঈশ্বর প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই মর্ম্মে হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষীরা সভা সমিতিতে, ঘাটে, মাঠে, উন্মুক্ত রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া অযাচিত উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বাক্য-বাগীশদের উপদেশ শ্রবণ করতঃ মুগ্ধ হইয়া স্বীয়ধর্ম্ম পরিত্যাগে

পূর্ব্বক যে সকল হিন্দু সন্তান ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, আমরা তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। যে স্ত্রী, পরপতির গুণ গরিমা শ্রবণ করিয়া নিজ-পতি পরিহারপূর্ব্বক পর-স্বামীর ভজনা করে, সে কি কখনও লোকসমাজে প্রশংসা যোগ্য হইতে পারে? এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে যদি কেহ প্রশংসা করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রতিষ্ঠাকারীও এই শ্রেণীর লোক। যেমন সাধু—সাধুর প্রশংসা করে, চোর চোরের প্রশংসা করে, সতী সতীর প্রশংসা করে, বেশ্যা বেশ্যার প্রশংসা করে।

হিন্দু ব্যতীত সকল ধর্ম্মাবলম্বীরাই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রেও অবশ্য নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব সুন্দরভাবে বিধিবদ্ধ আছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, যেমন নদীজল সমুদ্রে মিলিত হইবার জন্য অবিরাম প্রবাহিত হয়, মিশিলে আর হয় না, সেইরূপ সাধকও ব্রহ্ম সমুদ্র লাভ করিবার জন্য সতত উপাসনা করিবে, লাভ করিলে আর করিবে না। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন উপাসনা নাই, কারণ ব্রহ্মও যাহা তিনিও তাহাই। "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি।" প্রবাহবিহীন সমুদ্রে যেমন স্রোতস্বতীর জল গিয়া মিশিলে হীন-স্রোত হইয়া যায়, সেইরূপ নির্গুণ ব্রহ্মসমুদ্র লাভ করিলে সগুণ সাধকও নির্গুণ হইয়া যায়। উপাসনা, সগুণ ঈশ্বরের ব্যতীত নির্গুণ ব্রহ্মের হইতে পারে না, তাই সগুণ আমরা, সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করি। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম উপাসনার বস্তু নহে, উপভোগ করিবার বিষয়। যেমন মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি জলচর প্রাণী কোন কারণ বশতঃ স্থলে উত্থিত হইলে পুনরায় জলে যাইবার জন্য চেষ্টা করে সেইরূপ ব্রহ্মসমুদ্রের জীব আমরা, আমরা বাসনা-নিবন্ধন ব্রহ্মজল পরিশূন্য এই সংসার ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এখন আমাদের পুনরায় ব্রহ্মানন্দ মহাসাগরে গমন করিবার জন্য চেষ্টা বা উপাসনা করা উচিত। মীনাদি যেমন জল প্রাপ্ত হইলে আর কোথায়ও যাইবার চেষ্টা না করিয়া কেবল জলে বাস জনিত সুখই অনুভব করে, সেইরূপ আমরাও যদি কেহ কোনদিন ভাগ্যবশতঃ ব্রহ্মসমুদ্র লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে অনন্যচিত্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া তাহাই উপভোগ করিব। জল যেমন প্রথমতঃ হিমালয় হইতে নিপতিত হইয়া নদীনালা দিয়া ধীরে ধীরে গিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ আমরাও ব্রহ্মের মূর্ত্তি উপাসনারূপ নদীনালা দিয়া নির্গুণ ব্রহ্মসমুদ্রে গিয়া মিশিব।

মানুষ যতদিন গুণযুক্ত থাকিবে ততদিন সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা

করিবে। সাধক গুণময় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে করিতে যখন নির্গুণ হইয়া পড়িবে, যখন তন্ময়, তদ্গত হইয়া পড়িবে, তখনই সে নির্গুণ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার যোগ্য হইবে। সাধক নিজে নির্গুণ না হইলে নির্গুণ ব্রহ্মানন্দ কিরূপে উপভোগ করিবে? আমার নিজের ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, আহার আছে, নিদ্রা আছে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, বিরক্ত, সুখ, দুঃখ, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্তই বিদ্যমান আছে, অথচ আমি যাঁহার উপাসনা করি তিনি নিজে নির্গুণ, নির্ব্বিকার, ও অন্তহীন। এ রহস্য মন্দ নয়। আমার সমস্ত বিকারই বিদ্যমান থাক, আমি সমস্ত কার্য্যই করি তুমি সকল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিকার পরিশূন্য হইয়া, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার নাম ধারণ করিয়া বসিয়া থাক। উপাস্যকে এরূপ ভাবে অবসর প্রদান করা বোধ হয় আজকালকার সভ্যতার একটী অঙ্গ। এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্বক ভাব দেখিয়া আমাদের মনে নিম্নলিখিত গল্পটী সর্ব্বদাই উদিত হয়। গল্পটী এই—

কোন নব্য সভ্যতাভিমানী পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধিভূষণে ভূষিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পিতাকে বলিয়াছিল যে, আপনি, আমার বাড়ী থাকা কাল পর্য্যন্ত মায়ের সঙ্গে একপভাবে আমার সমক্ষে কথোপকথন করিবেন না। এটা সভ্যতার বিরুদ্ধ কার্য্য। ইহার উত্তরে পিতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন যে, বাপু! তোমার শিক্ষার ও সভ্যতার বলিহারী। এরূপ শিক্ষা তোমাকে কে দিল? কোথায় তুমি একপ সভ্যতা শিক্ষা করিলে? যাক যা হবার তা হইয়াছে, এক্ষণে তোমাকে একটী কথা বলি, কথাটী সর্ব্বদার জন্য স্মরণ করিয়া রাখিও। সংসারের সকল প্রাণীকেই আপনার মত দেখিবে। নিজের প্রাণ যেমন আদরনীয়, জগতের সমগ্র জীবের প্রাণই সেইরূপ জানিবে। তোমার যাহাতে সুখ বা দুঃখ হয়, এ বিশ্বসংসারের সকলেরই তাহাতে সুখ, দুঃখ হয় জানিবে। তোমার নিজের আত্মার সহিত তুলনা করিয়া জীবের প্রতি নিগ্রহ কি অনুগ্রহ যাহা করিবার হয় করিও—

"প্রাণা যথাত্মনাভীষ্ট ভূতানামপিতে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥"

আমাতে যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে, আমি যে সমস্ত গুণের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি, ভগবানকে সেই সমস্ত গুণের দ্বারা বিমণ্ডিত করিয়া উপাসনা করাই প্রাজ্ঞের কার্য্য। মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধা লাগিলে মানুষ নিজে,

যেমন অস্থির হইয়া পড়ে, সেইরূপ ভগবানেরও ক্ষুধা লাগিয়াছে ভাবিয়া আকুল হওয়া কর্ত্তব্য। আত্মাই ভগবান—"অহং সর্ব্বেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ।" অতএব আত্মার সহিত উপমা করিয়া, আত্মার রুচিমত ভগবানের সাধনা করাই জ্ঞানীজনোচিত কার্য্য। আত্মা যে কার্য্য করিতে ভালবাসে, আত্মা যে বস্তু প্রিয় বলিয়া অনুভব করে, উপাসকের সেই বস্তুর দ্বারা আত্মা বা ভগবানের পরিতৃপ্ত করা উচিত। আমার প্রাণ ভগবানকে মাতৃরূপে আসনে উপবেশন করাইয়া বনজাত পত্রপুষ্পের দ্বারা অর্চ্চনা করিতে চাহিতেছে; আমি যদি মায়ের প্রকৃত উপাসক হই, তাহা হইলে আমার তদণ্ডেই তাহার দ্বারা মায়ের অর্চ্চনা করা উচিত। যদি না করি তাহা হইলে যে, আমি নিশ্চয়ই আত্মবঞ্চক, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। যে আত্মবঞ্চক, তাহার ইহ-পরকালে সুগতি প্রাপ্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, যে বস্তু উপাসকের নিকটে অতিশয় প্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, উপাসক তাহাই উপাস্যকে অর্পণ করিবে। "যদন্ন পুরুষো রাজন্ তদন্ন স্তস্য দেবতা।" হে ভিন্ন সাম্প্রদায়িক। এরূপ কার্য্যে পাপ হয়, কি পুণ্য হয়, সে বিচার তোমার করিবার অধিকার নাই। ভগবান তোমারও নয় আমারও নয়, পক্ষান্তরে আবার তোমারও যেমন আমারও তেমন। তোমার উপাসনাই যে ঈশ্বরের প্রিয়, আমার উপাসনা যে তাঁহার প্রিয় নয়, এ কথা তোমাকে কে বলিল? তুমি বলিবে যে, আমার শাস্ত্রে আছে, আমি বলিব যে, আমিও আমার শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে উপাসনা করি। এখন তোমার শাস্ত্রের মূল্যই অধিক, কি আমার শাস্ত্রের মূল্যই অধিক, তাহা আমরা এ প্রবন্ধে আলোচনা করিব না।

বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অন্যান্য সাম্প্রদায়িকদের উপাসনা হইতে হিন্দুদের উপাসনাই অধিক পরিমাণে শান্তিদান করিতে সমর্থ; কারণ, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকেরা কেবল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঊর্দ্ধতুণ্ড হইয়া কোথা তুমি, কোথা তুমি, বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন। আর হিন্দুগণ ইচ্ছামত ভগবানের মূর্ত্তি সংগঠনপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে উপবেশন করতঃ উপাসনা করিয়া থাকেন। উপাসনার অর্থও ইহাই। উপ—অর্থে নিকটে, আসনা—অর্থে উপবেশন, অর্থাৎ নিকটে বসিয়া সেবা করার নামই উপাসনা।

বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকেরা বহু ঈশ্বরোপাসক বলিয়া হিন্দুদের নিন্দা এবং নিজেরা একেশ্বরবাদী বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন। ইহার কোনটি

উত্তম আর কোনটী যে অধম, তাহা বোধ হয় ইঁহারা চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। হিন্দু ধর্ম্মোপদেষ্টারা ইহা উত্তমরূপে বুঝিতেন যে, সংসারের সকল লোকই এক রুচি সম্পন্ন হয় না—"ভিন্নরুচির্হিলোকানাং" তাই তাঁহারা পৃথক পৃথক রুচি অনুসারে একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত করিয়া আমাদিগের উপাসনার পথ সহজ ও সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমরাও যে, যে মূর্ত্তি ভালবাসি, সে সেই মূর্ত্তি উপাসনা করিয়া আত্মার উন্নতির পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার করি। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকেরা ইহা যেন মনে না করেন যে, আমরা কেবল মাটীর পুতুল পূজা বা তাহার উপাসনা করিয়া আলোক হইতে অন্ধকারে গমন করিতেছি। আমরা মাটীর পুতুলের পূজা বা উপাসনা করি না। আমরা মৃণ্ময়ের মধ্যে সেই চিণ্ময়ের উপাসনা করিয়া থাকি। তবে এ কথা ঠিক যে, আমরা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করি না, কারণ আমরা যখন নিজে নির্গুণ নয়, নির্গুণ কি বস্তু তাহা বুঝি না, তখন নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কি করিব? যে কখনও ইক্ষুরসের আস্বাদ জানে না, সে কি কখনও ইক্ষুর মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে?

বর্ত্তমানকালে যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা বা উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাদের অবস্থা ঠিক এইরূপ; যেমন লোকে কস্মিনকালেও ঘোড়ার ডিম না দেখিয়া কেবল মুখে ঘোড়ার ডিম, ঘোড়ার ডিম, শব্দ করে, আর তাহার গুণ ব্যাখ্যা করে, সেইরূপ ইঁহারাও কস্মিনকালে নির্গুণ ব্রহ্ম না দেখিয়া না শুনিয়াই তাহার রূপ গুণের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়াই কোন সাধক গাহিয়াছিলেন—

"যাঁরে না হেরিনু জীবনে।
তাঁরে জানিব কেমনে॥"

আমাদেরও এই কথা। আমরা যখন নির্গুণ ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে বা বুঝিতে পারিলাম না, তখন আর কিরূপে নির্গুণ ব্রহ্মকে ভজনা করিব? আর করিলেই বা কি হইবে? মর্ম্ম না, বুঝিয়া উপাসনা করিলে যে, তাঁহার কখনই সন্তোষ উৎপাদন বা অনুগ্রহ লাভ করা যায় না, এ কথা ঠিক। যেমন জন্মক্লীব রমণীর মর্ম্ম বুঝে না, বা তাহার উপাসনা করিয়া প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানক্লীব আমরা, আমরাও কখন নির্গুণ ব্রহ্মের মর্ম্ম বুঝি না, অতএব নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কখনই

তাঁহার তুষ্টি সাধন বা অনুকম্পা লাভ করিতে পারিব না। দন্তহীন শিশু তদুপোযোগী দুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কলাইভাজা চর্ব্বণ করিবার চেষ্টা করিলে যেমন অশক্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানদন্ত বিহীন আমরা, আমরা যদি সাকার উপাসনারূপ দুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনারূপ আটভাজা চর্ব্বণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে যে তাহাতে নিশ্চয়ই অশক্ত হইব, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

আমাদের ন্যায় অজ্ঞ লোকের পক্ষে অর্থাৎ যাঁহারা স্ত্রী পুত্র পরিবৃত সংসার কারাগারে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে সাকার মূর্ত্তির উপাসনা করাই শ্রেয়স্কর। নির্ব্বিকারচিত্ত না হইলে কখনই নির্গুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে ধারণা করা যায় না। স্থির এবং পরিস্কৃত সলিল রাশিতেই সম্পূর্ণাবয়ব প্রতিবিম্বিত হয়। কর্দ্দমাক্ত তরঙ্গায়িত নদীজলে কখনই হয় না। আমাদের হৃদয় নদীতে অবস্থিত চিত্তজলও এইরূপ সংসারের নানাবিধ পাপ কর্দ্দমে কলুষিত, এবং নানারূপ অনিত্য চিন্তা বাত্যায় সদা সর্ব্বদা তরঙ্গায়িত, এ হেন বিকারযুক্ত চিত্তে কি কখনও নির্ব্বিকার ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন? সাধুগণের মুখে শুনিতে পাই যে, যেমন তরঙ্গায়িত জল-নিপতিত প্রতিবিম্ব অস্থির, সেইরূপ মানুষের বিকারগ্রস্ত চিত্তানুভব ঈশ্বরও বিকার সম্পন্ন।

ব্রহ্ম সমুদ্র-জলের ন্যায় স্বচ্ছ, আর আমরা কর্দ্দমাক্ত ঘোলাজল। বিমল জলে, পরিস্কৃত জলই মিশ্রিত করা উচিৎ, তাই আর্য্য ঋষিগণ গভীর গবেষণা করিয়া আমাদের চিত্তজল পরিস্কার করিবার জন্য সাকার উপাসনারূপ ফিল্‌টার সৃষ্টি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমাদের এই সাকার উপাসনা করিতে করিতেই চিত্ত নির্ম্মল ও নির্ব্বিকার হইয়া যাইবে। হে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক! তোমরা দেখিতে পারিবে যে, তোমাদের বহুপূর্ব্বেই আমাদের অনাবিল চিত্তে সেই পরমপুরুষ পরমাত্মা প্রতিভাত হইবেন। তখন আমরা সেই পরব্রহ্ম মহাসমুদ্রে মিশিয়া গিয়া জীবন সার্থক বলিয়া বোধ করিব, আর মহাভাবে বিহ্বল হইয়া ব্রহ্ম সমুদ্রের অস্ফুট ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিশাইয়া বলিব—

"ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।"

শ্রীকান্তিবর ভট্টাচার্য্য।

মোহ-জীবের প্রতি।

কে তুমি, হে মোহজীব! কেবা তুমি হও।
কোন্ তুমি, কার তুমি, তুমি কোথা যাও॥
কে তোমায় চালায় বল, তুমি কোথা যাবে।
কি জন্য এসেছ তুমি, কি করিবে ভবে॥
কিরূপে আসিলে তুমি এই ধরা'পরে।
কিরূপেতে ভ্রম তুমি এ বিশ্ব সংসারে॥
কিরূপে পাইলে তুমি কান্তি মনোহর।
কি গুণে তোমায় জীব বলে থাকে নর॥
করিতেছ বড় গর্ব্ব পেয়ে দেহভার।
চিরকাল স্থায়ী নহে তব কলেবর॥
পদ্মপত্র জলপ্রায় এ দেহ তোমার।
টলমল করিতেছে জেনো অনিবার॥
দেহেতে সর্ব্বস্ব জ্ঞান একি অপরূপ।
বারেক না ভাবিতেছ আপন স্বরূপ॥
দেহকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান, দেহ তুমি নয়,
অচিন্ত্য অব্যক্ত তুমি, তুমি বিশ্বময়॥
অচ্ছেদ্য অদাহ্য তুমি রহিত বিকার।
কেবল মোহেতে কর আমার আমার॥
মায়ার গণ্ডীর মাঝে অতি ক্ষুদ্র স্থানে।
পঙ্কিল পড়িয়া আছ অতি ক্ষুদ্র জ্ঞানে॥
মোহের কুহকে ভাবি অক্ষম দুর্ব্বল।
হারায়েছ যাহা ছিল আপন সম্বল॥
সকল শকতি আছে তোমার ভিতর।
তুমি ভিন্ন নহে কিছু এ বিশ্ব সংসার॥
তুমিই বিশ্বের রাজা লোকে বলে নর।
রাজা হ'য়ে পশুবৃত্তি সাজে কি তোমার?
কাম ক্রোধ মোহ লোভে সদা মগ্ন হয়ে।
পশুর পশুত্বময় তোমার এ হিয়ে॥

করিতেছ সহবাস সদা রিপু সাথে।
করিছ কেবল গতি প্রবৃত্তির পথে॥
প্রবৃত্তির সাথে মজি হারাইয়া পথ।
কাম ক্রোধ সাথে সদা যেতে মনোরথ॥
ত্যজহ চিত্তের এই শিথিল স্বভাব।
করহ হৃদয়ে সদা প্রেমের সদ্ভাব॥
মায়ার কুহক জালে ভুলিয়াছ সব।
কেবল দেখিছ বসি সম্পদ বিভব॥
সুখ দুঃখ ভেদাভেদ জ্ঞান নাহি তব।
তুমি যে বিশ্বের আলো অনন্ত উদ্ভব॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নও, নও বৈশ্য শূদ্র আদি।
নর নও, নারী নও, নও বর্ণ ভেদি॥
যদি কোন বর্ণ নও, নও কোন জাতি।
তবে কেন এ দেহের এত পক্ষপাতী॥
দেহেতে অভেদ জ্ঞান কর পরিহার।
আমার আমার রব ছাড় অহঙ্কার॥
তোমার এ দেহভার, কভু তব নয়।
পঞ্চভূতজাত ঘর, ভূতে পাবে লয়॥
তুমিই বিশ্বের পাতা, তুমি বিশ্বময়।
তবে কেন মোহজালে দেখ মায়াময়॥
সংসার সমুদ্রে পড়ি গণিতেছ ঢেউ।
তুমি ভিন্ন এ জগতে অন্য নাই কেউ॥
মায়ার গণ্ডীর মাঝে হারাইয়া পথ।
সদা বাস করিতেছ কুপ্রবৃত্তি সাথ॥
ভুলে যাও ক্ষণভঙ্গু এ দেহের মায়া।
নিত্যমুক্ত আত্মা তুমি, অনিত্য যে কায়া॥
তোমার তুমিত্ব জ্ঞান আছে বল কোথা?
রক্তমাংস মেদ মজ্জা অস্থি নাই যেথা॥
আমি জ্ঞান নাহি পারে, পশিতে যথায়।
আমির আমিত্ব যেথা সব চলে যায়॥

তথায় আমার আমি হই বিশ্বময়।
সর্ব্বত্র আমার মূর্ত্তি আমি সর্ব্বময়॥

ব্রহ্মচারী দেবব্রত।

ঈশ্বরের স্বরূপ।

বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর।
সাধুর চরিত্রে ইহা প্রমাণ প্রচুর॥

একদা এক পণ্ডিতের মনে উদয় হইল, ঈশ্বর আছেন কি না? এবং তাঁহার স্বরূপ কি, ইহা আমাকে জানিতে হইবেই হইবে। সাধু উক্তি এবং শাস্ত্রবাক্যের উপরে বিশ্বাস করিয়া, অন্ধের মতন ঈশ্বর ঈশ্বর করা, মহা অজ্ঞানের কার্য্য। ইহা আমি কখনই করিব না। যদি ঈশ্বরকে কখন প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তবেই তাঁহাকে বিশ্বাস করিব, নচেৎ এ জীবনে উপাসনা, আরাধনা কখনই করিব না।

এইরূপ দৃঢ় পণ করিয়া, পণ্ডিত ঈশ্বর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, অকাতরে কাটিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ হইল না। নানা তর্কে, নানা বিচারে, নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, পণ্ডিত দিন দিন পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার আহার নিদ্রায় কিছুতেই সুখ নাই। তিনি দিবারাত্র, কেবল চিন্তায় নিমগ্ন আছেন।

তাঁহার এইরূপ দশা দেখিয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারে যে পাচক ব্রাহ্মণ ছিল, সে একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আপনি কেন এত চিন্তা করিতেছেন? আমি যখন আপনার নিকট আসি, তখনি আপনাকে মৌণ দেখিতে পাই; আর কি জন্যেই বা, আপনি এত দুর্ব্বল ও মলিন হইয়া পড়িতেছেন।

পণ্ডিত এমনি ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছেন যে, তিনি কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন, পাচকের কথায় তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন, তুমি কি বলিতে পার, সেই অজ্ঞানিত ঈশ্বরের স্বরূপ কি, এবং তিনি আছেন কি না।

পাচক ব্রাহ্মণ তখন কহিল, এ চক্ষু দিয়া তাঁহাকে দেখা যায় না, বিশ্বাস চক্ষে তাঁহাকে দেখা যায়, এবং তিনি না থাকিলে, জগৎ কোথা হইতে আসিল?

পণ্ডিত তখন হাসিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে কহিলেন, তোমার মত্তন মূর্খমী কথায় জগৎ নষ্ট হইয়াছে, আমি ওরূপ কথায় বিশ্বাস করি না, যদি কখন এই চক্ষে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তবেই বিশ্বাস করিব। নচেৎ কল্পনায় ঈশ্বরকে কথনই বিশ্বাস করিব না।

পণ্ডিত ও পাচকে যখন কথোপকথন হইতেছিল, সেই সময়ে রাজপথ দিয়া একজন কফি-বিক্রেতা "চাই বাঁধা কফি, চাই বাঁধা কফি", ইত্যাদি শব্দে ফিরি করিতেছিল। পণ্ডিত সেই ফিরিওয়ালাকে ডাকিয়া একটী কফি ক্রয় করিলেন, এবং তাহা পাচক ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া, শীঘ্র শীঘ্র রন্ধন করিতে বলিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ কফিটি হস্তে লইয়া রন্ধনশালায় গিয়া, তাহার পাতা ছাড়াইতে বসিল। ইতিপূর্ব্বে পাচক ব্রাহ্মণ বাঁধাকফি কখন দেখে নাই। সে যত পাতা ছাড়ায়, ততই পাতা দেখিতে পায়, ক্রমে কফি সব ছাড়াইয়া ফেলিল, পাতা ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পাইল না ; তখন সে পাতাগুলি ঝুড়িতে করিয়া ফেলিয়া দিল। এবং মনে মনে কহিল, আজ পণ্ডিতকে ভাবি ঠকান ঠকাইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে কিছুই সার নাই, কেবল পাতা। ব্রাহ্মণ তখন অন্য অন্য ব্যঞ্জন বাঁধিয়া পণ্ডিতকে থাইতে ডাকিল। পণ্ডিত খাইতে বসিয়া যখন কফির ব্যঞ্জন দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি পাচক ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "ওহে, কই কফির ব্যঞ্জন আমাকে দিলে না।"

পাচক ব্রাহ্মণ তখন হাসিয়া কহিল, কফিওয়ালা আজ আপনাকে বড় ঠকাইয়া গিয়াছে : গালে চড়টি মারিয়া পয়সা গুলি লইয়াছে।

পণ্ডিত অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, কেন কি হইয়াছে ?

পাচক ব্রাহ্মণ কহিল, আর কি হইবে মশাই, যত ছাড়াই, ততই পাতা, সারাংশ কিছুই দেখিতে পাইলাম না, সুতরাং ফেলিয়া দিলাম।

পণ্ডিত তখন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, তুমি ত বড আহাম্মক হে, আমার পয়সাগুলি নষ্ট করিলে, বাঁধা কফি তুমি কি কখন দেখ নাই ? যাহা দেখ নাই, তাহা কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে না, তাহা হইলে তো নষ্ট হইত না। এইরূপ নানা কথায় পণ্ডিত, পাচক ব্রাহ্মণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

পাচক ব্রাহ্মণ কহিল, মহাশয়! আপনা হইতে আমি বোধ হয় অধিক আহাম্মক নহি। কারণ আমি না হয় সামান্য কফির পাতাকে অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আপনি জগতের সার বস্তু যে শাস্ত্র এবং সাধু উক্তি, তাহাকে অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর আমি কখন বাঁধাকফি কেমন

দেখি নাই ও জানি না। অদ্য আপনার কথায় তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম, এ জীবনে আর কখন ভুলিব না। কিন্তু আপনি ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেকের নিকট একই কথা শুনিয়াছেন, তথাপি এ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন নাই। এক্ষণে বিবেচনা করুন, আপনা হইতে আমি কি অধিক আহাম্মক হইলাম।

পাচকের কথায় পণ্ডিতের চৈতন্য হইল, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, সত্যই বলিয়াছ; তোমা হইতে আমি অধিক মূর্খ। কারণ জগতের সার বস্তু, সকল ধর্ম্ম পুস্তক, এবং সাধু উক্তিকে, অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। সকলেই আমাকে বলিয়াছেন—বিশ্বাস কর, এবং বিশ্বাস চক্ষে দর্শন কর। কিন্তু আমি কাহার কোন কথাই শুনি নাই, এক্ষণে আমি বুঝিয়াছি, আমি তোমা হইতে অধিক অজ্ঞান। কারণ তুমি এক কথায় বাঁধাকফির বিষয় বিশ্বাস করিলে; কিন্তু আমি লক্ষ কথা শুনিয়াও ঈশ্বরের স্বরূপ বিশ্বাস করি নাই। আমা হইতে অজ্ঞান আর কে আছে, এক্ষণে আমি বুঝিলাম, অনন্ত ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে, বাঁধাকফির পাতার ন্যায়, বড়র পর ছোট, ক্রমান্বয়ে কেবল পাতাই মাত্র সার হইবে। যদি ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে জগতের সকল বস্তুকেই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। আর তিনি নিরাকার, তিনি সাকার, তিনি স্বগুণ, তিনি নির্গুণ, এটা নয়, ওটা নয়, বলিলে হইবে না।

বিশ্বাস।

বিশ্বাস পরম ধন, পায় অতি অল্প জন।
যার ভাগ্যে ইহা মিলে, সেই সুখী মহীতলে॥

জনৈক পতিব্রতা রমণীর হঠাৎ পতি বিয়োগ হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার পতি কিছুই অর্থ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি সৎকার্য্যে এবং ধর্ম্মকার্য্যে সমস্ত ধনসম্পত্তি ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পরেই রমণীর কষ্ট আরম্ভ হইয়াছিল। তৈজস পত্র, যাহা কিছু ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া, রমণী কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার একটী শিশু সন্তান ছিল। দুগ্ধ অভাবে তাহার অনেক সময়ে কষ্ট হইত। রমণী তাহার কষ্ট দেখিয়া অনেক সময়ে কাঁদিতেন। কিন্তু কাঁদিয়া দারিদ্র্যতার প্রতীকার কিছুই করিতে পারিতেন না, বরঞ্চ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তৈজস পত্র যাহা কিছু ছিল, তাহা ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, রমণী নিজে

না খাইয়া অতি কষ্টে শিশুটীকে পালন করিতে লাগিলেন। রমণীর স্বামী এক সময়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বন্ধু বান্ধব কেহই গরীব ছিলেন না, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার বন্ধু কেহ তাঁহার অনাথ স্ত্রী পুত্রকে সাহায্য করেন না। রমণীর দুঃখ ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, তৈজস পত্র যাহা কিছু ছিল, সমস্তই নিঃশেষিত হইল। আর খাইবার উপায় নাই। রমণী তখন দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত হইলেন। দিন কতক কর্ম্ম করিয়া, তাহাতে কিছু সুবিধা বুঝিলেন না, সুতরাং কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। রমণী দাসীবৃত্তি করিয়া যাহা অর্থ পাইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা পশম কিনিয়া, জুতা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন। তাহাতেই একরূপ দিন কাটিতে লাগিল। শিশুসন্তানটীর বয়সের পর বয়স যাইয়া এক্ষণে সাত আট বৎসরের হইয়াছে। রমণী তাহাকে পাঠশালায় পড়িতে দিয়াছেন, পাঠশালাটী কোন একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সুতরাং তথায় ধর্ম্মনীতি সর্ব্বদাই শিক্ষা হইত। রমণীর শিশুটী প্রতিদিন পাঠশালায় গিয়া শিক্ষকের কাছে এই উপদেশ পাইত, ঈশ্বর তোমাদের পরম বন্ধু, যে যাহা কিছু তাঁহার কাছে, প্রার্থনা করে, তিনি তাঁহার সেই প্রার্থনাটি পূর্ণ করেন।

মনুষ্যের শরীর কখন বিকল হয়, কে বলিতে পারে। কয়েক দিন হইল রমণীর জ্বর হইয়াছে, তিনি আর কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না, যাহা কিছু অর্থ ছিল তাহা ঔষধিতে এবং পথ্যে ব্যয় হইতে লাগিল। ক্রমে সঞ্চিত ধন, সকল নিঃশেষিত হইয়া গেল, আজ আর একটিও পয়সা নাই, যে, দিন চলিবে। কেমনে পথ্য হইবে, কেমনে ঔষধি হইবে, এবং কি খাইয়া বালক পাঠশালায় যাইবে, তাহাতে অদ্য বালকের পাঠশালার মাহিয়ানা দিবার দিন, মাহিয়ানার নিমিত্ত বালক ব্যস্ত করিতেছে। এই সব কারণে রমণী ভাবিয়া আকুল হইলেন, কে পয়সা দিবে, কোথা যাইলে পয়সা ধার মিলিবে, ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর ধীরে ধীরে উঠিয়া, পল্লির দুই এক জনের কাছে গিয়া ধার চাহিলেন, কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া এক পয়সাও দিল না। নিরুপায় রমণী বাটিতে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তাঁহার পুত্র তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা! তুমি কাঁদিতেছ কেন?

রমণী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, আজ আমাদের একটীও পয়সা নাই,—তুমি কি খাইয়া পাঠশালে যাইবে, তাই কাঁদিতেছি।

বালক তখন কহিল, কেন তুমি কাহারো নিকট ধার করনা।

রমণী কহিল, আমি ধার করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ আমাকে ধার দিল না।

বালক কহিল, তুমি কাঁদিও না, আমার একজন বন্ধু আছেন, আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া টাকা ধার আনিয়া দিতেছি। এই কথা বলিয়া বালক তখন একখানি কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে বসিল। পত্র লেখা সাঙ্গ হইলে, বালক তাড়াতাড়ি ডাকঘরে উপস্থিত হইল, পত্র ফেলিবার বাক্সে পত্র ফেলিতে গেল, কিন্তু বাক্সটি উচ্চ বলিয়া ফেলিতে পারিল না।

সেই পথ দিয়া কোন এক ধর্ম্ম মন্দিরের আচার্য্য যাইতেছিলেন, তিনি দেখিলেন, বালক ডাক বাক্সে পত্র ফেলিতে যাইতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। তখন তিনি কহিলেন, পত্রখানি আমাকে দাও, আমি ফেলিয়া দিতেছি। বালক পত্রখানি তাঁহার হাতে দিল, আচার্য্য দেখিলেন, পত্রের শিরোনামায় লেখা আছে, পরম পূজনীয় ভক্তিভাজন, পরম পিতা পরমেশ্বর শ্রীচরণ কমলেষু। ঠিকানা—স্বর্গধাম। পত্রের শিরোনামা দেখিয়া আচার্য্য কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহাকে পত্র লিখিতেছ?

বালক কহিল, আমি ঈশ্বরকে পত্র লিখিতেছি। তিনি আমাদের পরম বন্ধু;

আচার্য্য তখন পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন, পত্রে এইরূপ লেখা আছে, "পরম বন্ধু ঈশ্বর! আমি পাঠশালে শিক্ষকের মুখে শুনিয়াছি, তুমি আমাদের পরম বন্ধু। তোমার নিকট যে যা চায়, তুমি তাহাকে তাই দাও। আমরা বড় গরীব, আজ আমাদের খাইবার পয়সা নাই, তাহাতে অন্ধ মায়ের জ্বর হইয়াছে, উঠিতে পারেন না, তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কিছু পয়সা ধার দাও, তবেই আমাদের আজ খাওয়া হইবে, নচেৎ হইবে না।"

আচার্য্য শিশুর বিশ্বাসজনক পত্র দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন তিনি জামার পকেট হইতে কয়েকটি মুদ্রা বালকের হস্তে দিয়া কহিলেন, আমি ঈশ্বরের দূত। এক্ষণে এই কয়েকটী টাকা লইয়া যাও; পরে তোমার এই পত্রখানি তাঁহাকে দিব, যাহা তিনি বলেন, তুমি জানিতে পারিবে।

সেই দিন আচার্য্য ধর্ম্মমন্দিরে আসিয়া শিশুর পত্রখানি পড়িয়া তাহার বিশ্বাসের কথা প্রচার করিলেন। উপাসকমণ্ডলী কাঁদিতে কাঁদিতে যাঁহার যাহা কিছু ছিল, বালকের সাহায্যার্থে দান করিলেন এবং সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে ঈশ্বর! আমরাও যেন ঐ বালকের মত বিশ্বাসী হই।

নব বর্ষ।

(১)

যত দিন, যত বর্ষ,
গত হয় একে একে,
জীবনের গোণা দিন,
ততই ফুরাতে থাকে।

(২)

জীবনের দিনগুলি,
মিছে যেন নাহি যায়,
যে দিন যাইবে, আর—
পাবে না সে দিন হায়।

(৩)

একটী সুকর্ম্ম কোনো,
নাহি করি সম্পাদন,
দিনেরে বিদায় কভু,
দিওনা—দিওনা মন!

(৪)

পুণ্যকর্ম্ম-পথে সদা,
কর মন। বিচরণ,
কর্ম্ম-ক্ষেত্র এ সংসার,
কর্ম্ম-পর জীবগণ।

(৫)

সেই কর্ম্ম,—যেই কর্ম্ম,
ভুবন মঙ্গলময়,
মঙ্গলবিহীন কর্ম্ম,—
সে কর্ম্ম অকর্ম্ম হয়।

(৬)

সে কর্ম্ম ক'র না কভু,
সে করমে কিবা ফল?
যে কর্ম্ম সাধিতে নারে,
অন্যের কি স্ব মঙ্গল।

(৭)

জেনে রেখো,—সেই পূজা,
ভগবানের পূজা নয়,
জীবরূপ ব্রহ্ম সেবা,
যে পূজায় নাহি হয়।

(৮)

জীবহিতকারী কর্ম্ম,
ধর্ম্ম নামে অভিহিত,
কর্ম্মহীন ধর্ম্ম জেন,—
ধর্ম্ম নহে কদাচিত।

(৯)

মন!

তাই বলি নব বর্ষে,
বরণ করিয়া লও,
নব বর্ষে, নব হর্ষে,
পুণ্য কর্ম্মে রত হও।

শ্রীভোলানাথ মজুমদার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩১৭ সাল।
চতুর্দ্দশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

পতিতপাবন পতিতে তরাও।
প'ড়েছি অকূলে, কূলে লও তুলে,
হে কৃষ্ণ-কাণ্ডারি, কৃপাচক্ষে চাও॥
রামকৃষ্ণরূপে তুমি কল্পতরু,
সর্ব্বত্যাগী শিব, ওহে জগদ্‌গুরু,
মা নামে কাঁদিলে, কি খেলা খেলিলে,
কি ভাব সাধিলে, মোরে বোলে দাও॥
কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত এ সংসার,
ধর্ম্মে ধর্ম্মে দ্বেষ—কি মোহ-বিকার,
সে ঘোর কাটালে, অমৃত বিলালে,
শক্তি সঞ্চারিলে, শক্তি কি শিখাও॥
ভক্তিহীন আমি, ওহে ভগবান্,
কিসে ভক্তি পাব, না জানি সন্ধান,
প্রাণে পাই ব্যথা, দোহাই দেবতা,
ভক্তি দিয়ে তব—শ্রীমূর্ত্তি দেখাও।

সেবক শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

শৈশবে শিক্ষা।

"The Child is father of the man."

Wordsworth.

নয়ন মনোহারী শিশুবৃন্দকে দর্শন করিলে, তাহার ক্রিয়াকলাপ ধীরমনে কিয়ৎকাল পর্য্যবেক্ষণ করিলে, এবং তাহাদের অর্দ্ধস্ফুট কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিলে ভাবুকের কথা দূরে থাক্, পাষাণের প্রাণ পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইয়া যায়। যে সূক্ষ্মধী পিতামাতা শৈশবকাল হইতে নিজ সন্তানের যথার্থ পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হয়েন, কেবল তাঁহারাই প্রস্ফুটিত শৈশবমঞ্জরীর দিগন্ত-বিস্তারিত সৌরভে নিজে আমোদিত হইয়া অপরকেও কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাহার অংশীদার করিয়া থাকেন। প্রকৃতির নিয়ম "As you shall sow, so you shall reap' তুমি যেমন ভাবে রোপণ করিবে, সেইরূপ ভাবে ফলভাগী হইবে। যদি ইহার ব্যতিরেক উদাহরণ কোথায়ও দেখিয়া থাক, তবে জানিতে হইবে তাহা নিপাতন সিদ্ধ। বাইবেলে একটা উপদেশ আছে "Make the hay while the Sun shines" অর্থাৎ সূর্য্যালোক থাকিতে থাকিতে ঘাস কাটিয়া লও। আমরাও বলি, যদি মানবজীবনকে শৈশবাবস্থা এবং শৈশবেতর অবস্থা, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, তবে শৈশবাবস্থাকে সূর্য্যালোকে আলোকিত অবস্থার সহিত এবং শৈশবেতর অবস্থাকে সূর্য্যাস্তান্ত তমসাবৃত অবস্থার সহিত তুলনা করিলে বিশেষ অসঙ্গত হইবে না। যাঁহারা এই অবস্থাকে অবহেলা করিয়া পুত্রের যৌবনাদি অবস্থায় সতর্ক হইতে যা'ন, তাঁহাদিগকে একবার সাধুগণের মুখনিঃসৃত সেই পূতবাক্য স্মরণ করাইয়া দিলে ভাল হয়। সাধুগণ বলিয়াছেন, মৃত্তিকা কোমল থাকিতে তাহাকে যে ছাঁচে ফেল, সে তদনুরূপ গঠন প্রাপ্ত হইবে, একবার পুড়াইয়া ফেলিলে যে দাগ থাকিবে তাহা আর শত চেষ্টাতেও মুছিতে পারা যাইবে না। কোমল শিশুর উপর যে দাগ পড়িয়া যায়, তাহার যৌবনাবস্থায় সেই দাগ একটু পরিস্ফুটরূপে মানবসমাজে প্রতীয়মান হয়। যদি ভাল হয়, তবে যুবকের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল এবং তাহার সম্পর্কীয় সকলেরই মঙ্গল। কিন্তু যদি মন্দ হয়, তবে অমঙ্গলের 'কারবোনিক এসিড্ গ্যাসে' সকলের অনিষ্ট হয় এবং বহু লাঞ্ছনা অপমান সত্ত্বেও যুবক তাহার শৈশবার্জ্জিত অভ্যাসকে পরিত্যাগ করিতে পারে না।

পিতামাতার সহিত শিশুর যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা তাঁহারা জানিয়াও জানেন না, বুঝিয়াও বুঝেন না, এবং শুনিয়াও শুনেন না। আমরা প্রথমে পিতার সহিত এবং তদনন্তর মাতার সহিত শিশুর সম্বন্ধ ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইব। বাটীর বহির্দ্দেশে পিতার কর্ম্মক্ষেত্র যেরূপ সুবিস্তৃত, বাটীর অন্তর্দ্দেশে মাতার কর্ম্মক্ষেত্রও সেইরূপ বহুল পরিসরযুক্ত। বহিস্থ লোকের সহিত কি প্রকারে কথাবার্ত্তা করিতে হয়, আচার ব্যবহার রক্ষা করিতে হয়, শিশু তাহা পিতার নিকট হইতে প্রভূত শিক্ষা করিয়া থাকে। শুনিয়াছি, সময়ে পিতা কাহারও উপর রাগান্বিত হইয়া 'শালা, বেরিয়ে যা,' বলিয়াছেন, শিশু তাহাই আবার পিতার নিকট পুনরাবৃত্তি করিতেছে। পিতা যখন বহিস্থ বা অন্তরস্থ কাহারও উপর ঝাল ঝাড়িতে থাকেন, শিশু তখন সঙ্গীত শ্রবণোন্মত্ত টীয়াপাখীর মত স্থির নেত্রে পিতার অঙ্গভঙ্গী দর্শন করে এবং ধীরশ্রবণে পিতার কথাগুলি যেন নিজের কর্ণবিবরে ঢালিতে থাকে। সেইগুলি আবার পাড়াপ্রতিবাসীর নিকট পুনরুচ্চারণ করিয়া তাহাদের প্রীতি সম্বর্দ্ধন করে; কিন্তু কেহ ইহার পরিণাম ভাবিয়া দেখে না। আপাতঃমধুরে মুগ্ধ মানব ভবিষ্যতের তিক্ত বা মধুর পরিণামের কোন বিচার করিতে ভাল বাসে না। সে ক্ষত চুলকাইতে ভালবাসে, কিন্তু তাহার ভীষণ পরিণাম তাহাকে সচেতন করে না। অনেক স্থলে দেখিতে পাই, পাওনাদার আসিয়া ফটকের নিকট বাবুকে ডাক্ দিলে, ভৃত্যের অবর্ত্তমানে বাবু সেই দোষসম্পর্কশূন্য সরল শিশুকে পাঠাইয়া বলিয়া দেন 'বলিও, বাবা বাড়ী নাই।' অকপট শিশু অমনি উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট বলিয়া ফেলে 'বাবা বলিল, বাবা বাড়ী নেই!' এ'র চেয়ে আর বেশী পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? যেখানে হিংসুক ভক্ষক, সেখানে কথা থাকে, কিন্তু যেখানে রক্ষকই ভক্ষক হয়েন, সেখানে উপায় কি?

নেপোলিয়ন, শেরিডেন, বিদ্যাসাগরপ্রমুখ মহাত্মাগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের উন্নতির মূলে, তাঁহাদের জননীগণ বর্ত্তমান। সুমাতাই যে সুপুত্র প্রসব করিয়া থাকেন, অধিকাংশ স্থলে ইহাই দেখা যায়। মাতার কথাবার্ত্তা চলা ফেরা ইত্যাদি শিশু সমস্তই অনুকরণ করে। একটা বিশেষ গুরুতর কথা বলিব, জননীগণ তাহা যেন কদাপি বিস্মৃত না হয়েন। ভগবান্ শিশুকে কেমন করিয়া গড়িয়াছেন, তাহা কি করিয়া বলিব, কিন্তু তাহার ভিতর এই একটা অত্যাশ্চর্য্যজনক মনোবৃত্তি দেখিতে

পাওয়া যায় যে, সে মাতাকে যেমন বিশ্বাস করে, মাতার কথা যেমন প্রাণ মন দিয়া গ্রহণ করে, সম্পর্কীয় অন্য কাহারও কথা তত সহজে গ্রহণ করিতে চায় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন 'বালকের ন্যায় বিশ্বাস চাই'। মা বলিয়া দিয়াছেন—'এই তোর কাকা,' তবে বিনা বাক্যব্যয়ে বালক অবিলম্বে বিশ্বাস করিল "এই আমার কাকা"। মা বলিয়াছেন "ওর কাছে যাস্‌নি," শিশু সমস্ত সংসারের প্রলোভন পাইলেও তাহার নিকট যাইবে না। আপনারা জানেন যে, বিচারপতির সামান্য কথায় বিচারাধীনের রক্ষণ মরণ হয় বলিয়াই তাঁহাকে বহু সাবধানে কথাবার্ত্তা করিতে হয়, সেইরূপ হে দয়াময়ী জননিগণ, আপনাদের সামান্য কথায় যখন শিশুর সমস্ত জীবনটা নির্ভর করে, তখন একবার সাবধান হইয়া শিশুর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

হে নবযৌবনোন্মত্ত দম্পতি! আপনাদিগের নিকট আমাদের একটা নিবেদন আছে। আপনারা যখন বহুবিধ রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া শিশুর সমীপে পরস্পর বাক্যরসামৃতপানে প্রবৃত্ত থাকেন, ভুলিয়া যাইবেন না যে, অনুকরণ-প্রিয় সুকোমল শিশুটী আপনাদের পার্শ্বে পড়িয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। আপনাদের ভাবভঙ্গী সমস্তই সে আপনার সূক্ষ্ম তুলিকায় হৃদয়পটে চিত্রিত করিয়া লইতেছে। আপনারা ভগবানের নাম জপ করিলে, সেও হাতখানি তদনুরূপ করিয়া জপ করিতে আরম্ভ করে, আপনারা ধ্যানের আসনে বসিলে সেও একটা ধ্যানের আসন রচনা করিয়া লয়, সুতরাং আপনারা যদি একটা পাপপঙ্কিল আচরণ প্রদর্শন করেন, সেও সেই আচরণ অনুষ্ঠান করিবার জন্য যত্নবান হয়। এ কথা জানিয়া শুনিয়াও যাঁহারা বিপরীত আচরণ করেন, তাঁহাদিগকে জনক জননীর আসনে দেখিয়া যুগপৎ দুঃখের এবং হাস্যের সঞ্চার হয়।

শিশুর শিক্ষার কথা উত্থাপন করিলে, তাহার জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তির কথা এবং চিত্র মনে পড়ে। ভাই ভগিনী, পিতামাতা এবং বন্ধুবান্ধব সকলেরই এই প্রবৃত্তিকে যথার্থ মান্য দেওয়া উচিত। সে যখন প্রশ্ন করে, এটা কি? ওটা কি? ইত্যাদি, তখন খুব সাবধান হইয়া তাহার প্রশ্নোত্তর করিতে হয়। আমার মনে হয়, পরীক্ষায় প্রশ্নোত্তর অপেক্ষা বালকের প্রশ্নোত্তরের গুরুত্ব অধিক। অনেককে দেখিয়াছি, বালক বেশী প্রশ্ন করিলে উত্তরকর্ত্তা বিরক্ত হইয়া তাহাকে গালি দিয়া থাকেন। তিনি পিতাই হউন, মাতাই

হউন, আর যিনিই হউন, তাঁহাকে বলি, যদি শিশুর গুরুভারবহনে অক্ষম, তবে তাহার নিকটে যাইবার তোমার কি প্রয়োজন? তুমি যদি বিরক্তমনা হও, তাহার নিকট গিয়া তাহার মস্তক চর্ব্বণ করিও না। জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তি লইয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। তুমি যদি সে প্রবৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে সঙ্কোচ বোধ না কর, তবে ধিক্ তোমার বৃথা আদরে, ধিক্ তোমার কাল্পনিক স্নেহে, ধিক্ তোমার শিশুমুখচুম্বনে। শিশু যাহা জিজ্ঞাসা করিবে, সাবধানে সস্নেহ বচনে তাহার উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য, এমন কি যাহাতে সেই স্নেহলিপ্ত ব্যবহারে উৎসাহিত হইয়া সে তোমাকে বারম্বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। যদি এ কষ্টটুকু সহ্য করিতে পার, তবেই শিশু মুখচুম্বনজনিত সুখে তোমার অধিকার, নতুবা দূরে থাকিও।

শিশু কতই প্রকার জিদ করে। সেইজন্য অনেক জননী তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না জানিয়া, বহু কটুকাটব্যে তাহার নবীন প্রাণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন। তাহার যে কি বিষময় পরিণাম, তাহা ভাবিতে গেলে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়া থাকে। তুমি শুধুই যে বর্ত্তমানের জন্য তাহার প্রাণে আঘাত কর তাহা নহে, ভবিষ্যতে তোমার প্রাণে আঘাত পাইবার জন্য একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া রাখ। এ যন্ত্রের হস্ত হইতে তোমার নিষ্কৃতি নাই। মূর্খই বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাকে, বিজ্ঞ যাহা করে, তাহাতে ভবিষ্যতের একটা ছায়া দেখিতে চায়। শিশু যদি কোন জেদ করে, তবে সমর্থপক্ষে তাহাকে তাহা যোগাইয়া দেওয়া ভাল; কিন্তু যদি যুক্তিসঙ্গত না হয়, বা অপ্রাপ্য হয়, তবে অন্য বিষয়ে তাহার মনোনিয়োগ করিয়া তাহাকে শান্ত করিতে হয়।

স্বার্থান্ধ মানব সামান্য কষ্টের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার মানস করিয়া অনেক সময়ে শিশু সন্তানগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। "দুধ খেয়ে নে, না হ'লে বাঘ এসে টপ্ করে গিলে ফেলবে, ওইরে—কাঁদিস্ নে—দেখছিস ওঃ বাবা, মস্ত বড় ভূত! চুপ্, চুপ্ কর। ও কে রে? এতো মস্ত বড় সয়তান রে খোকা! ঘুমিয়ে পড়, ঘুমিয়ে পড়, ঘুমিয়ে পড়।" ইত্যাদি ভয় প্রদর্শনের যে কি বিষময় ফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে, বঙ্গীয় যুবককে দেখিলে তাহার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কাপুরুষ ভয়াকুল জীব বোধ হয় পৃথিবীর অন্য স্থানে নাই! আপনার দোষ সর্ব্বাগ্রে বাছিয়া লওয়া উন্নতির প্রথম সোপান। আমাদের জনক জননীগণ যদি তাঁহাদের এই সব দোষাবলী স্বীকার করিয়া প্রতীকারোদ্যত হয়েন, তবেই ভারতমাতার কোলে

ভারসর্ব্বস্ব একটা একটা মাংসপিণ্ডের পরিবর্ত্তে যথার্থ পুত্র প্রদান করিতে পারিবেন।

কখন কখন শিশুকে বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট বহু তত্ত্বাবধারকের অধীনে থাকিতে দেওয়া হয়। একজন একটা কথা বারণ করিলে, অপর লোক হয়ত সেই কথাতেই উৎসাহ দান করিয়া সরল শিশুর প্রাণকে অবিশ্বাসজালে বদ্ধ করিয়া ফেলে। আমি জানি, একটী শিশুকে তাহার পিতা চা খাইতে বলিতেন, কিন্তু কাকা উহা বারণ করিয়া দিতেন। ভালর জয় চিরকাল। শিশু চা পান করিতে আহূত হইলে বলিত "কাকা মারবে'। চা পান না করিলে "বাবা মারবে" একথা কখনও বলিত না। তার মাও তেমনি মুখ থেকে চর্ব্বিত তাম্বুল বাহির করিয়া ছেলের লাল টুক্‌টুকে মুখদর্শনাকাঙ্ক্ষায় শিশুর মুখে পুরিয়া দিতেন। এবারও কাকা দেখিয়া তীব্র শাসন করিলেন। এইবার ছেলে কি করিত একবার দেখুন। অতঃপর যখনই তাহাকে পরীক্ষা স্বরূপ পিতামাতা চা পান বা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে আহ্বান করিতেন, সুকুমার-মতি শিশু কাকার বর্ত্তমানে শত সহস্র প্রার্থনাকেও বিফল করিয়া দিত। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রথমে সে বলিত "কাকা মারবে"। তারপর বলিত "কাকা নাই, দাও।" এইরূপে ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। শেষে দেখা গেল শিশুটী মন্দের দিকেই বেশী ঝোঁক দিতেছে। তারপর পিতা সাবধান হইলেন বটে, কিন্তু ফলাফল এখনও ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত। পিতা মাতা দুষ্টস্বভাবাপন্ন হইলে পুত্রের দুষ্টচরিত্র স্বতঃসিদ্ধ। তবে ভাগনের কৃপায় প্রহ্লদের মত কোন কোন মানব ভাগ্যবলে রক্ষা পাইয়া যায়। পিতা মাতা যদি নিজের দুর্ব্বলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা নিজের কোন দৃঢ়মনা আত্মীয়ের হস্তে পুত্রের শিক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া দিবেন। একথা-সত্য যে "মার চেয়ে যে ভালবাসে তা'রে বলে ডাইনী," তবে পিতা মাতার অশিক্ষিত এবং দুর্ব্বল অবস্থায় শিশুর শিক্ষার ভার তাঁহারা তাঁহাদের কোন মিত্রের হস্তে সমর্পণ করিবেন। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "মাতা মিত্রং পিতা চেতি স্বভাবাৎ ত্রিতয়ং হিতং।" যাহাই হউক একটু সতর্কে সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে। কিন্তু এ কথাটী বারম্বার মনে রাখিতেই হইবে যে, একজনের শাসনাধীনে না রাখিয়া, বহু হস্তে শিশুর শিক্ষার ভার সমর্পণ করিলে, তাহার পুঞ্জীভূত মনোবৃত্তিগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া উন্নতির সোপান হইতে তাহাকে বহুদূরে ফেলিয়া দেয়।

সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, দায়িত্ববোধ পরাঙ্মুখ পিতামাতা সন্তানকে নীচস্বভাবাপন্না, নীচকুলজা, আবর্জ্জনালিপ্তা ধাত্রীর হস্তে দিয়া বেশ নিশ্চিন্তে কালহরণ করেন। কিন্তু তাহার নীচস্বভাবে, মলিন পরিচ্ছদে শিশুর মন এবং শরীরকে যে কত দূর সংক্রামিত করে, তাহার বিষময় ফল ভোগ করিয়াও পিতামাতাগণের সংজ্ঞা উৎপন্ন হয় না। সৎস্বভাববিশিষ্ট লোক দেখিয়া তাহার উপর শিশুর ভার দিতে হয়। যদি কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, এত সঙ্গতি কোথায় যে একজন ভাল ধাত্রী রাখিতে পারি? আমরা তাঁহাকে বলি যে, শুধু সন্তান উৎপাদন করা মানব জীবনের ধর্ম্ম নহে। সন্তানকে যথার্থরূপে শিক্ষা প্রদান করিবার সঙ্গতি যদি তোমার নাই, তবে তোমার সন্তান উৎপাদন তোমার পক্ষে একটা বিড়ম্বনা এবং সমাজের পক্ষে একটা অনিষ্ট নহে কি? হাড়হাবাতে অর্দ্ধমৃত ছেলেতে ভারতভূমি বিশেষতঃ বঙ্গভূমি ছাইয়া ফেলিয়াছে। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যার" দোহাই দিয়া যাঁহারা 'কামার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যার' যাথার্থ্য সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি, হে ভাই, আপনাপন ও সমাজের হিতাহিত বিবেচনা করিয়া সংযত হও। পাশববৃত্তি চরিতার্থ উদ্দেশ্য হইতে বিরত হও। শোকদুঃখে জরাজীর্ণা ভারতমাতার কোলে কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট বীর্য্যহীন মনুষ্যত্বহীন পুত্র দিয়া তাঁহাকে আরও শোককাতরা করিবার প্রয়োজন কি? যদি সামর্থ থাকে, যদি ধনবল, মনোবল, লোকবল থাকে, তবে বিবাহিত হইয়া ধর্ম্মের মার্গ অনুসরণ করিয়া পুত্রসন্তান উৎপাদন কর ক্ষতি নাই। কিন্তু আর অমানুষ ভারতবক্ষে চাপাইও না—অন্ততঃ আগত কিছুদিনের জন্য ধৈর্য্য ধর। ভারতমাতাকে একটু চিরবিলাপ কর্ম্ম হইতে কিছুদিনের জন্য বিরাম দাও। পুত্রগণের অবিচারপ্রসূত কর্ম্মে মাতা চিররোরুদ্যমানা!

শিশুর অনুকরণ প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মা যখন খাইতে থাকেন, তখন সে মায়ের মুখের দিকে অনিমেষনয়নে তাকাইয়া থাকে। তাহাকে উঠিতে বসিতে উঃ ওঃ ইত্যাদি শব্দ করিতে শুনিয়া সেও উঃ ওঃ শব্দ করে। দাদা হয় তো কাহারও উপর রাগ করিয়া তাহাকে "বদমাস" বলিয়া গালি দিলেন। শিশুও বাটীর যাহাকে তাহাকে সেই "বদ-মাস" বলিতে শিখিল। আবার দেখিতে পাই, কোন কোন পরিবারে ছেলে-গুলো যেমনি দুষ্ট এবং বাচাল, অন্যান্য পরিবারের ছেলেরা তেমনি গম্ভীর এবং মৃদুভাষী। এই শিশুগণকে পরিবারের বিজ্ঞাপন বলিতে পারা যায়। তাহারা পিতামাতা ভাই ভগিনী সকলের যেরূপ কথাবার্ত্তা শোনে বা যেরূপ আচরণ

পরিদর্শন করে, নিজেও তদনুরূপ কথাবার্ত্তা করে এবং সেইরূপ আচরণ দেখায়। মনে পড়ে, কোন ব্যক্তি যথাক্রমে দুইটী আশ্রমে বিশ্রামার্থ উপস্থিত হয়েন। প্রথম আশ্রমটীতে যে পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষীটি ছিল, সে নবাগত অতিথিকে "শালা, চোর ইত্যাদি" ভাষায় গালি দিতে লাগিল। লোকটী সে আশ্রমে বিরক্ত হইয়া পুরোভাগে অবস্থিত অন্য একটী আশ্রমদ্বারে উপনীত হইলেন। অতিথিকে দেখিলে পর অত্রস্থ পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গটি "আসুন, বসুন" ইত্যাদি সাদর সম্ভাষণে অতিথির মনাকর্ষণ দ্বারা তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। অতিথি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া অবেশষে জানিতে পারিলেন যে, প্রথম গৃহটী একটী দুষ্টস্বভাববিশিষ্ট গৃহস্থের এবং দ্বিতীয় আবাসটি একটী ঋষি-আশ্রম। শিশুও এই শুকপক্ষীর মত। সে যাহা শোনে বা দেখে, তাহারই পুনরাবৃত্তি করে। যদিও এ বয়সে ইহাতে তাহার কোনও বেশী ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা নাই, তবুও ইহা ভাবী ইষ্টানিষ্টের সূত্রপাতমাত্র। সুতরাং শিশুর এই অনুচিকীর্ষা বৃত্তির প্রতি যথেষ্ট সাবধান থাকিতে হইবে।

পিতা মাতা বা আত্মীয় পরিজন আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া শিশুকে পয়সার প্রলোভন দেখান। হয়ত মা বলিতেছেন "বাবার কাছে যা, জোর ক'রে পয়সা চেয়ে নিয়ে আয়।" উহাতে কাঞ্চনের দিকে উহার মন প্রধাবিত হয় এবং পরে পঠনাদি কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে। আবার কেহ কেহ শিশুকে বলিয়া দেন 'যদি দাদা জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছ, বলবে শ্বশুর বাড়ী। আর খোকা! তুমি এই মেয়েটি বিয়ে করবে?' শিশু তাহার অর্দ্ধস্ফুটিত স্বরে যেমনি 'শ্বশুরবাড়ী যাব,' 'আমি খেয়ে সারি, ওকে বিয়ে করব' ইত্যাদি কথা মৃদু মৃদু বলিতে থাকে, পিতা মাতা ভাই ভগ্নীর আনন্দের আর সীমা থাকে না। আমরা বলি—আচ্ছা এমন কুরুচিপূর্ণ আমোদে ফল কি? শিশু যাহাই করিবে, তাহাই যখন উল্লাসপূর্ণ, তখন সুরুচিপূর্ণ কথা-বার্ত্তায় কি সে আমোদ বা উল্লাস লাভ করা যাইতে পারে না? এইরূপ কুরুচিপূর্ণ কথাবার্ত্তা করিয়া অভিভাবকগণ অকালে পুত্রসন্তানের মনকে কামিনীকাঞ্চনে লিপ্ত করিয়া দেন। সুতরাং তাহার মহৎ ভাবনা ভাবিবার সময় বা সুযোগ থাকে না। যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই সে অর্থ লিপ্সায় অভিভূত হয় এবং বিবাহের নাম শ্রবণমাত্রেই মৃদুমন্দহাস্তে দিগ্‌বিদিক্ শূন্য হইয়া পড়ে। সুতরাং শিশুকে অর্থের বা কামিনীর নাম গন্ধ শোনাইতে নাই।

অনেক স্থলে মাতা যখন সন্তানের দোষ দেখিয়া শাসন করিতে যান, তখন

তাহার শ্বাশুড়ী এবং ননদ ইত্যাদি ছেলের পক্ষ ধরিয়া বধূকে গালি দিয়া বলেন, "যাও, যাও, তোমার বাপের বাড়ী তুমি চলে যাও, আমাদের ছেলেকে মারতে হবে না; বকৃতে হবে না; তুমি কে গা আমাদের খোকাকে মারতে?" এই আপাতঃমধুর এবং পরিণামতিক্ত কথাগুলি শুনিয়া স্বতঃই মনে হয়, 'মার চেয়ে যে ভালবাসে, তারে বলে ডাইনী' প্রবাদের এইটাই প্রযুজ্য স্থান। মরি মরি, কি ভালবাসা! দুরন্ত শিশু হয়ত জননীকে প্রহার করিতে উদ্যত—জননী ভাবী চরিত্র-দোষ আশঙ্কায় আশঙ্কিতা হইয়া তাহাকে শাসাইতে গেলে ননদ শ্বাশুড়ী ভীম গর্জ্জনে বিকটমুখে প্রধাবিত হইয়া বধূর চৌদ্দপুরুষের খবর লইতে যখন উদ্যত হয়েন, তখন ভাবুকের মুখ নাই বলুক, মন বলিয়া উঠে "বলি, ও ডাইনী, তোমার মোহজাল গুটাইয়া লও। তোমার সেই লক্ লক্ জিহ্বা লুকাইয়া ফেল। শিশুটাকে সদ্য খাইবার আয়োজন করো না! তার মার অন্তরে নারিকেলের মত স্নেহবারি ভরা। সে একক্ষণে শাসনের জন্য যেমন তীব্র ভৎর্সনা করে, অপরক্ষণে তেমনি শিশুর সদাসন্তপ্ত প্রাণকে স্নেহবারিতে সিক্ত এবং আপ্লুত করিয়া ফেলে। সে বারি তোমারই মধ্যে নাই। তোমার শত চেষ্টাও সে বারি-প্রাপণে বিফল হইবে জানিও।" এর বিষময় পরিণাম আমরা নিজজীবনে প্রত্যক্ষ এবং অনুভব করিয়াছি। যে ছেলে পিতা মাতার বশীভূত নহে, সংসারে সে আর কাহারও বাধ্য হইতে পাবে না। পিসিমা, দিদিমাগণ কপট ভালবাসা বাসিয়া শিশুকে চিরদিনের মত ঔদ্ধত্যের কবলে ফেলাইয়া দেন, এবং জয়চন্দ্র, পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীকে আনাইয়া নিজেও যেমন মুসলমানের হস্তে নিহত হইলেন, শিশু তেমনি মাতার মত আপনার জনকে প্রগাঢ় মূর্খতাবশতঃ পর ভাবিয়া যখন তাঁহাকে গালাগালি করে, ক্রমে ক্রমে দিদিমা পিসিমাও সেই বকুনির যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া দরধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে থাকেন। তাই বলিতেছিলাম, সকলের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে, ছেলের সামনে মাতাকে গালাগালি দেওয়া কোনও মতে উচিত নহে এবং যদি মাতার আচরণে কিছু রুচিবিরুদ্ধভাব পরিদৃষ্ট হয়, তবে শিশুর অসাক্ষাতে মাতাকেই সে বিষয়ে সৎপরামর্শ দিলে ভাল হইবে। এ কথা যেন কেহ ভুলেও মনে করিবেন না যে, ছেলে পিতামাতার শাসন এড়াইয়া অন্যের শাসন প্রণত মস্তকে গ্রহণ করিবে।

মাতা সৎসঙ্গ বাছিয়া লইয়া শিশুকে তাহার সহিত খেলিতে দিবেন। অসৎসঙ্গ বৃক্ষমূলে লুক্কায়িত অনিষ্টকারী কীটের মত। সে কখন শিশুর মনের

মধ্যে কি ভাবে অধিকার লাভ করিয়া প্রতিপত্তি স্থাপন করিবে তাহা দুরনুমেয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে যারপরনাই সাবধান থাকিতে হইবে। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে 'A man is known by the company he keeps' অর্থাৎ যা'র যেমন সঙ্গী, তা'র তেমনি ভঙ্গী। আমরা অনেক স্থানে দেখিয়াছি, শিশু বাহির হইতে—পাড়া হইতে খেলিয়া আসিয়া নূতন নূতন অঙ্গভঙ্গী এবং কথাবার্ত্তা করে। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে শৈশবাবস্থা অনুকরণ প্রধান। সুতরাং শিশু যাহাতে সৎ দেখে, এবং সৎ শোনে, সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

বাসন্তীয় মাতৃ আবাহন।

আমরা ছয়মাস পূর্ব্বে শারদীয় শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে তিন দিনের তরে আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে আনন্দময়ী মায়ের স্নেহ ভালবাসাপূর্ণ মাতৃমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছিলাম। মা যে কি জিনিষ তাহা মাতৃভক্ত সন্তানেই বুঝিতে পারে। মাতৃভক্ত সন্তান সম্বৎসরের মধ্যে মাত্র তিনদিন মাকে দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। তিনদিনের মধ্যে সে মায়ের অশান্তিবারণ পদপ্রান্তে বিরলে উপবেশন করিয়া অশান্তিপাবক-দগ্ধ হৃদয়ের বেদনার কথা বলিয়া শেষ করিতে পারে না; এবং মাও সামান্য তিনদিন মাত্র পুত্রমুখ দেখিয়া এক বৎসর কাল চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, তাই মা একবৎসরের মধ্যে দুইবার, এই হাহাকারপূর্ণ সুখশান্তি-বিরহিত পুত্রগৃহে আগমন করেন।

আজ বসন্তকাল। আজ মায়ের স্বরূপ সুন্দর প্রিয়পুত্র ঋতুরাজ বসন্ত, সর্ব্বনিয়ন্ত্রী মায়ের নিয়োগ অনুসারে তাঁহার ভারতমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া মণ্ডপ গৃহ ও প্রাঙ্গন নানা সজ্জায় সজ্জিত করিতেছে। তাই আজ বসন্তের শাসনে শাসিত হইয়া কোকিলকুল সমাকুলকণ্ঠে কুহু কুহু রবে দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে, ভ্রমরগণ একপ্রাণে একতানে নাতিগম্ভীর সুমধুর গুন গুন স্বরে কানন ও মন আমোদিত করিতেছে। গভীর নিশীথকালে কি জানি কি মনে করিয়া পাপিয়া চোক গেল, চোক গেল রবে গগনতল বিকম্পিত করিতেছে। আরও অপরাপর নানা জাতীয় পক্ষিসমূহ নানাবিধ মধুর বোলে

জগৎ মুখরিত করিতেছে, বেলা, টগর, গন্ধরাজ, কুটরাজ, কাঞ্চন ও পলাশ প্রভৃতি কুসুমনিচয় বিশ্ববিনিন্দিত সৌন্দর্য্য ও প্রাণারাম সৌরভ প্রকাশ করিয়া প্রাণ মন বিমোহিত করিতেছে। বাসন্তীয় প্রাতঃকালীন শৈত্য, সৌগন্ধ, মান্দ্য, এই ত্রিগুণাত্মক সুমধুর মলয় মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া স্বর্গীয় শান্তি-লাভবঞ্চিত মানবগণের প্রাণে কি এক অনমুভূত শান্তিময় ভাব আনয়ন করিয়া দিতেছে।

আজ মাঃ বসুমতীকে, নূতন সাজে সজ্জিত, নূতন ভূষণে ভূষিত, আনন্দ কোলাহলে মুখরিত দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে, আমাদের স্নেহময়ী মা আবার আসিতেছেন। আমরা ছয়মাসের মধ্যে আবার মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি কিনা, আমাদের স্মৃতিপথে ভববন্ধনমোচনকারিণী মুক্তকেশী মায়ের কথা জাগরুক আছে কিনা, তাহাই দেখিবার জন্য মা, পুনরায় আগমন করিতেছেন। অথবা নিদ্রিত, বিস্মৃত সন্মার্গ হইতে অপসৃত পুত্র আমরা, আমাদিগকে মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত করাইতে, তাঁহার কথা স্মরণ করাইতে, সৎপথে আনয়ন করিতে, মা পুনর্ব্বার আগমন করিতেছেন। ছেলেকে শাসন করিতে হইলে মাকে যষ্টী গ্রহণ করিতে হয়। আমরা মায়ের অশান্ত দুর্দ্দান্ত পুত্র তাই মা আমাদিগকে শাসন করিবার জন্য দশ হস্তে দশ অস্ত্রধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। মা সর্ব্বমঙ্গলে! তুমিত আমাদের মঙ্গলের জন্য বারে বারে আমাদের নিকটে আগমন কর, কিন্তু মা! আমরা কি তোমায় চাই? আমরা কি তোমার ও শাসনে শাসিত হই? আমরা যে, তোমার মহিষাসুরের চেয়েও দুরন্ত পুত্র। আমরা যদি তাহাই না হইব, তবে আমাদের এত দুঃখ দুর্দ্দশা আসিয়া উপস্থিত হইবে কেন? মা! আমরা তোমাকে চাহিনা, তোমার শাসনে শাসিত হই না, তুমি যে সর্ব্বাপদবিহন্ত্রী তাহা আমরা জানি না, বা জানিবার চেষ্টাও করিনা, তাই মা! আমরা অনন্ত দুঃখসাগরে নিয়ত সন্তরণ করিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া অকালে কালের কবলে কবলিত হইতেছি। এজন্য মা! অনেক অদূরদর্শী মূঢ় লোক তোমাকে দোষারোপ করে বটে, কিন্তু মা! তোমার দোষ নাই, দোষ আমাদের অদৃষ্টের।

ভাই! যে মাকে নিমেষার্দ্ধের তরে দর্শন করিবার জন্য কত যোগী, যোগীন্দ্র, কত মুনি, ঋষি, কত যুগযুগান্তর ধরিয়া কত কঠোর তপস্যা করিতেছেন; সে মাকে জ্ঞানভক্তিবিহীন, ঘোর আত্মম্ভরি আমরা, বৎসরের মধ্যে একদিন

না, দুই দিন না, ছয় ছয় দিন দেখিতে পাই, ইহার মূল তত্ত্ব কি? আমাদের মনে হয়, ইহার কারণ আর কিছুই না, কেবল এক মাতৃভাবে উপাসনা করিবার ফলই এই ছয় দিন মাতৃচরণ দর্শন। আমরা কি শুধু ছয় দিন মাত্রই মাকে দর্শন করিয়া থাকি? না, আমরা শরৎকালের কৌমুদীস্নাত কোজাগর পূর্ণিমার রজনীতে, কার্ত্তিক মাসের দীপান্বিতামাবস্যার গাঢ়ান্ধকারময়ী রাত্রিতে, মাঘ মাসের রটন্ত্যাখ্যাচতুর্দ্দশীর নিবিড়তম তামসী নিশিতে, শ্রীপঞ্চমীর দিনে, ইহা বাদে আরও কত কত দিনে কত কত রূপে মায়ের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া থাকি। বৎসরের মধ্যে মা আমাদের এইরূপে ঘন ঘন দর্শন দিয়া মুক্তির কারণ হইয়া থাকেন। অহো! মা না হইলে এইরূপে মাসে মাসে সন্তানের জন্য আর কাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে? আমরা মায়ের জন্য কাঁদি বা না কাঁদি, আমরা মাকে ডাকি বা না ডাকি, কিন্তু মা নিজেই প্রতি মাসে মাসে, দুষ্ট সন্তান আমরা, মাতৃতত্ত্ব বিস্মৃত মায়াক্রীড়ায় নিপুণ আমরা, আমাদিগের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে "পশুমে, পশুমে" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু সংসারের অনিত্য পুতুল খেলায় নিরত অবোধ সন্তান আমরা, আমরা নিত্য-সত্য সনাতনী, ত্রিজগজ্জননী মায়ের দিকে ফিরিয়াও তাকাই না। মা, আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে সমুদ্ধার করিবার জন্যই অবশ্য আগমন করেন, কিন্তু আমাদিগকে তাঁহার প্রতি অনাসক্ত দেখিয়া, তাঁহার বিষয়ে বিকৃতমনা দেখিয়া, যে বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে আগমন করেন, সেই বিষাদপূর্ণ হৃদয়েই প্রত্যাগমন করেন। মা বলিয়াই তিনি আমাদের এরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হন না।

আমাদের যেমন মা আছেন, তেমন একজন পিতাও অবশ্য বিদ্যমান আছেন। আমাদের মা যেমন মুক্তিদাত্রী, পিতাও তেমন মুক্তিদাতা। কিন্তু আমাদের মা যেমন মাসে মাসে মুক্তির কারণ হইয়া আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন, কৈ পিতাঠাকুর ত তাহা হন না? তাঁহাকে ত আমরা কেবল এক ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর ঘন-ঘোর অন্ধকারময়ী রাত্রি, যে রাত্রিকে শিবরাত্রি নামে অভিহিত করা যায়, সেই রাত্রি ভিন্ন আর আমাদের মুক্তির কারণরূপে উপস্থিত হইতে দেখি না? ভাই পাঠক! পিতা মাতায় প্রভেদই এইটুকু। দেখ, মা! আমাদের দুঃখে সদা দুঃখিতা। তিনি আমাদের দুঃখে সদ সর্ব্বক্ষণ সমবেদনা প্রকাশমানা। আর ভোলানাথ পিতা আমাদের, তিনি বৎসরের মধ্যে কেবল একদিন মাত্র আমাদের কথা মনে করিয়া, আমাদের

দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য সিদ্ধাশ্রম কৈলাসধাম পরিত্যাগ করিয়া এই ধরাধামে আগমন করেন। বলিহারি যাই বাবা! তোমার পুত্রবাৎসল্যের! পিতা মাতার এইরূপ বিরুদ্ধভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই মাতৃতত্ত্বাভিজ্ঞ সাধক বলিয়া গিয়াছেন—"সহস্রন্তু পিতৃর্মাতা গৌরবেনাতিরিচ্যতে" পিতা অপেক্ষা মাতা গৌরবে সহস্র গুণ অতিরিক্ত।

সংসারে মা যেমন সন্তানের তরে ক্লেশ সহ্য করেন, সেরূপ পিতাই হউন, বা আর যিনিই হউন, কেহই করিতে বাধ্য নহেন। করিলেও এক আধবার; দুইবারের বারই বিরক্ত হইয়া উঠেন। মাতে বিরক্তিভাব নাই, তবে দুঃখভাব আছে, বিষাদভাব আছে, সেও সন্তানের অবস্থা বিশেষে। মা, সন্তানকে ভাল করিতে ইচ্ছা করিলেন, সৎপথে আনিতে চাহিলেন, সন্তান আসিল না, ভাল হইল না, তাই তিনি দুঃখিতা হইলেন, বিষাদিতা হইলেন, কিন্তু ক্রুদ্ধা হইলেন না, বা সন্তানকে পরিত্যাগ করিলেন না। এই জন্যই শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

"কুপুত্রো যদ্যপি কচিদপি কুমাতা ন প্রভবতি।"

সংসারে যত রকম ভাব আছে, যত প্রকার সম্বন্ধ আছে, তন্মধ্যে মাতৃভাবই সর্ব্বোত্তম ভাব বলিয়া প্রখ্যাত। তাই হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা ভগবানে মাতৃভাব আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য ভগবানের পিতৃ-ভাবে বা অন্য কোন ভাবেও উপাসনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ভাই! একবার প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া দেখ দেখি যে, পিতৃ মাতৃ বা অন্য যে কোন ভাবের মধ্যে কোন ভাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তুমিও মায়ের ছেলে, মায়ের ভাব বুঝিতে অবশ্য তুমি অসমর্থ হইবে না, তাই প্রবন্ধের আকারবর্দ্ধন ভয়ে, মাতৃতত্ত্বের বিচারভার তোমার উপরেই অর্পণ করিলাম।

মাতৃভক্ত সাধক! তোমাকে আর বেশী কি বলিব। তুমি ত আর বিলাসিতা রাক্ষসীর প্রিয়পুত্র নয় যে, এ বসন্তকালে মলয়ানিল বিচরিত, আতর, গোলাপ, লেবেণ্ডার প্রভৃতি মনমধ উপাদানে সুগন্ধিত, বাসন্তীয় নাত্যুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত অমরাবতীলাঞ্ছিত, অট্টালিকাভ্যন্তরে অবিদ্যার আবাহন ও সেবন করিয়া আয়ুক্ষয় করিবে? আমি ত এ দুর্ভাগ্য দেশে একমাত্র তোমাকে ছাড়া মায়ের আবাহনের যোগ্য ব্যক্তি আর দেখিতেছি না। তুমি মাকে জান, মা তোমাকে জানেন, তাই ভাই! তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি অযোগ্য ভাই আমরা, আমাদিগকে অনুসঙ্গী করিয়া, যে তিথিতে লঙ্কাধিপতি দশানন মহাশক্তি মায়ের চরণ অর্চ্চনা করিয়া ত্রৈলোক্য-

বিজয়িনী শক্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই তিথিতে বাসন্তীনামধারিণী ত্রিজগন্ময়ী, চিন্ময়ী মাকে আবাহন করিয়া নিজে কৃতার্থ হও, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরাও কৃতার্থ হই, আর বলি—"ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।"

হিন্দুসমাজ! আজ এ শুভ দিনে তুমি কেন জড়বৎ পড়িয়া আছ? তুমি কি বিশ্বশক্তিবিধায়িনী মায়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছ? ছি! ছি! অদ্যকার দিনে কি এ ভাবে থাকিতে আছে? তোমাকে এরূপ ভাবে দেখিলে, মা—প্রাণে বড় ব্যথা পাইলেন, তাই বলি তুমি উঠ, আনন্দময়ী মায়ের আগমনজনিত হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে গায়ের ধূলা, মাটি ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াও। রাবণ যখন এই দিনে মায়ের পূজা করিয়া শক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখন তুমিই বা না হইবে কেন? রাবণও মায়ের ছেলে, তুমিও মায়ের ছেলে। মায়ের নিকটে সকল ছেলেই সমান। মায়ের কোলে সকল সন্তানেরই সমান অধিকার, এ কথা সত্য; কিন্তু মাকে ডাকার মত ডাকা চাই। যিনি ভক্তিভরে, কাতরকণ্ঠে, কেবলমাত্র মায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া সদা সর্ব্বদা মা মা বলিয়া ডাকিতে পারিবেন, তিনিই ত্রিজগতের আদরিণী মায়ের আদরের ছেলে হইবেন। আদুরে ছেলের আব্দার মা চিরকালই রক্ষা করিয়া থাকেন, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। তবে কেন মানব! তোমরা আগে মায়ের প্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেছ না? তোমরা ত জান যে, যে ছেলেকে মা ভালবাসেন, সে ছেলের বিপদকে মা নিজের বিপদ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সে ছেলেকে নিরাপদ রাখিবার জন্য মা সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। জানিয়া শুনিয়া আর কেন ভাই, মায়ের অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত থাক? কেন ভাই! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যে মাকে দর্শন করিবার জন্য সদা সর্ব্বদা লালায়িত, সে মার দর্শন বিষয়ে উদাসীন থাক? ঐ শুন স্নেহময়ী মা, তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মোহনিদ্রা হইতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য স্নেহস্বরে ডাকিতেছেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"। আর কেন, এইবার ভাই! ঘোর সুষুপ্তি হইতে সমুত্থিত হও। এই ত সময় উপস্থিত, এ সময়ে তুমি সর্ব্বাশুভনিবারিণী সর্ব্বমঙ্গলা বাসন্তী মাকে সাদরে আহ্বান কর, প্রাণের ব্যাকুলতায় তারঃস্বরে বল—

"এহ্যেহি ভগবত্যম্ব।
সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥"

শ্রীকাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য।

প্রার্থনা।

(১)
পাষাণের মেয়ে বলে
অন্তরে তোমার,
নাই বুঝি লেশমাত্র
স্নেহ-করুণার।

(২)
ত্যজিয়া সকল সুখ
স্বেচ্ছায় জননী,
দগ্ধ অস্থি-ভস্ম মাঝে
শশ্মানবাসিনী।

(৩)
যেন কোন্ অভাগিনী
করিতে সন্ধান,
জীবনের ধ্রুবতারা
খুঁজিছে শশ্মান।

(৪)
এই চিরযুগব্যাপী—
সাধনার ফলে,
পেলে কি মা সে ধনে যা'
জীবনে হারালে ?

(৫)
তবে কেন মিছে আর
শিখর-নন্দিনি !
বারেক না চাহ ফিরে
শশ্মান-বন্দিনী।

(৬)
প্রফুল্ল পঙ্কজ জিনি
তরুণ মাধুরী,
এবে সে কালিমাময়
রূপ ভয়ঙ্করী।

(৭)
আলু থালু কেশপাশ
শূন্য আভরণ,
বিমুক্ত কুন্তল দাম
চুমিছে চরণ।

(৮)
পদতলে মহাকাল
বিষাদে হতাশ,
বিষাদ বিশুষ্ক দেহে
বহে তপ্তশ্বাস।

(৯)
সুধাপানে সুধামুখী
এতই মগনা,
অবিরাম সুধারসে
হলি বিবসনা।

(১০)
প্রভাত রবির রশ্মি
ব্যাপ্ত চারিধার,
দিকে দিকে জনে জনে
করিল প্রচার !

(১১)
সুর-নর-শ্রেষ্ঠ পতি
বিলুণ্ঠিত পায়,
অনিমেষে চেয়ে আছে
আঁখি ব্যগ্রতায়।

(১২)

আহা! সে শিবের দেহ
স্বচ্ছ নীলাম্বর—
ক্রোড়ে যেন বিভাসিত
পূর্ণ শশধর।

(১৩)

শক্তিরূপা তাই বুঝি
কর নির্য্যাতন,
অনাদিপুরুষ জায়া
চিনেছি এখন।

(১৪)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাগো
বুঝেছি এবার,
নীরবে নমিয়া মাথা
গুণ গায় কার।

(১৫)

ব্রহ্মাণ্ড মূরতি তব
সকলি তোমার,
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
জননী সবার।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অমূল্য ধন।

জনৈক ব্যক্তির মনে ধনী হইবার সাধ হইল। সংসারের সকল ধনী হইতে সে শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহার সমতুল্য একজনও থাকিবে না, ইহাই তাহার একান্ত বাসনা হইল। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সে, যে কিছু ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহাতে তাহার ধনীশ্রেষ্ঠ হওয়া অসম্ভব, সুতরাং সেই ধনলোভী ব্যক্তি, তখন দৈবপ্রসাদ লাভ করিবার নিমিত্ত হোম যাগাদি করিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাতেও তাহার ধনী হওয়া হইল না।

ধনলোভী ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিল, তখন সে মনে মনে করিল, ভিক্ষা করিয়া ধন উপার্জ্জন করিব, এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষা বৃত্তিতে নিযুক্ত হইল।

প্রত্যহ সূর্য্য উদয় হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিত, ইতিমধ্যে একবারও বিশ্রাম করিত না; পথহারা পথিকের ন্যায় সে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত। সারাদিন ভিক্ষা করিয়া রাত্রি দশ ঘটিকার সময় বাটীতে আসিয়া রন্ধন করিয়া খাইত, পাছে পয়সা অধিক ব্যয় হয়, ব্রাহ্মণ সেই নিমিত্ত কেবল শাক অন্ন খাইত, এমন কি অনেক সময় উদর পূরিয়া খাইত না।

দিনের পর দিন অবাধে চলিয়া যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের জীবনের দিনটুকু ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। তাহার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধাবস্থার চিহ্ন সকল লক্ষিত

হইতে লাগিল। কৃষ্ণ কেশ শুভ্র, দন্ত গলিত, চক্ষু দৃষ্টিহীন এবং উন্নত বলিষ্ঠ দেহ এখন জরাগ্রস্ত হইল। তথাপি ব্রাহ্মণের ধনী হওয়া হইল না।

উদ্যম ও অধ্যবসায় জীবিত মনুষ্যের লক্ষণ। ব্রাহ্মণ যত বৃদ্ধ হইতে লাগিলেন, তাহার উদ্যম এবং অধ্যবসায় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রাহ্মণ, কোন এক রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সাদরে বসিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা, আপনি আমাকে এমন অর্থ দান করুন, যাহাতে আমি ধনী হইতে পারি। রাজা অতিশয় দাতা ছিলেন, তিনি তাঁহাকে লক্ষ টাকা দান করিলেন।

ব্রাহ্মণ লক্ষ টাকা পাইয়া, রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমাকে যে অর্থ দিলেন, তাহাতে কি আমি ধনীর শ্রেষ্ঠ হইতে পারিব?

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা হাসিয়া কহিলেন, এ পৃথিবীতে আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধনী আছে। অতএব আমার প্রদত্ত লক্ষ টাকা পাইয়া আপনি কেমন করিয়া ধনীর শ্রেষ্ঠ হইবেন? ব্রাহ্মণ নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, যখন এই ধন প্রাপ্ত হইয়াও আমার ধনীর শ্রেষ্ঠ হওয়া হইল না, তখন ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তিনি উহা ফিরাইয়া দিলেন।

রাজমন্ত্রী ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া বলিলেন, আপনি যদি এক দিবসেই ধনীর শ্রেষ্ঠ হইতে চান, তাহা হইলে অদূরে নদীতীরে এক সাধু বসিয়া আছেন, তাঁহার নিকট পরশমণি আছে, তাহা চাহিয়া লইতে পারিলে আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর কথানুসারে সাধুর নিকট যাইয়া পরশমণি ভিক্ষা চাহিলেন।

সাধু ব্রাহ্মণকে কহিলেন, আজ আপনি বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিলেন; ঐ জঞ্জালটী আমার সম্মুখ হইতে যত শীঘ্র পারেন লইয়া যান। এই কথা বলিয়া সাধু তখন ব্রাহ্মণকে নদীতীর হইতে কিছু দূরে লইয়া গিয়া বামপদের অঙ্গুলি দ্বারা, একখানি ইষ্টক দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, ইহার মধ্যে আছে, শীঘ্র লইয়া যান। ব্রাহ্মণ পরশমণি লইয়া আনন্দ মনে আসিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, তিনি ভাবিলেন, এমন অমূল্য পরশমণি যে ব্যক্তি তুচ্ছ করিয়া মৃত্তিকায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাকে জঞ্জাল বলিয়া মনে করেন, বোধ হয় তাঁহার নিকট ইহা হইতেও মূল্যবান্ রত্ন আছে। অতএব ইহা পাইলেও, আমার ধনীর শ্রেষ্ঠ হওয়া হইল না। ব্রাহ্মণ ফিরিয়া গিয়া সাধুকে কহিলেন,

আপনি যখন এমন অমূল্য পরশমণিকেও তুচ্ছ করিয়াছেন, তখন আমার বোধ হয় আপনার নিকট ইহা অপেক্ষাও কোন অমূল্য রত্ন আছে, ইহা যদি সত্য হয়, আমাকে দান করুন, ধনী-শ্রেষ্ঠ হইতে আমার অনেক দিনের বাসনা।

সাধু কহিলেন, হাঁ—আমার নিকট এমন অমূল্য ধন আছে যে, সে ধন সংসারের সকল ধন তুচ্ছ বোধ হয়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমাকে তাহাই দান করুন। সাধু তখন তাঁহার কাণে কাণে হরিনাম মন্ত্র দান করিলেন, এবং কহিলেন, সাত দিবস তুমি এই নাম অবিশ্রান্ত জপ কর। তাহা হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে পৃথিবীর মধ্যে কে ধনীর শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন, পরে সাত দিবসের পর সাধুর নিকট আসিয়া কহিলেন, অসার ধনের নিমিত্ত আমার সমস্ত জীবন নষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আপনার কৃপায় আমার সকল আশা মিটিল, আপনি যে ধন আমাকে দান করিলেন, উহার নিকট আর ধন নাই। আপনার প্রসাদেই আমি পৃথিবীতে ধনী শ্রেষ্ঠ হইয়াছি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিলেন।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড।

বিগত ৬ই মে, শুক্রবার, রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটে আমাদিগের ভারতেশ্বর, প্রজাপ্রাণ, মহামতি সম্রাট এডওয়ার্ড ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। হিন্দুজাতি রাজাকে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তিজ্ঞানে মান্য এবং পূজা করে, সুতরাং তাঁহার বিরহে যে আজ ভারতবাসী নরনারী কি গভীর শোকাভিভূত, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা কোথায়! সম্রাটের বয়ঃক্রম ৬৯ বৎসর ৫ মাস হইয়াছিল। ইঁহার জীবনকালে এই ভারতবক্ষে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে লীলা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সময়ে কেশবাদি ব্রাহ্মভক্তগণকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ধর্ম্মভাব বিলাইতেছিলেন, সেই মহাপুণ্য সময়ে (১৮৭৫ খৃঃ) সম্রাট এডওয়ার্ড 'প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্' নামে ভারতবক্ষে, এমন কি কলিকাতায়ও বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রাজত্বকালে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহারই স্বরূপে, দেশে দেশে ধর্ম্মসুধা, অসাম্প্রদায়িক শান্তিবারি বিলাইয়াছেন, এখনও বিলাইতেছেন। আমাদিগের এই সম্রাটের ন্যায় পরম সৌভাগ্যবান জগতে কে? ভারতবাসী ইঁহার ধীমান পুত্র জর্জ্জ মহোদয়কে সিংহাসনে অধিরূঢ় দেখিয়া, সম্রাটের শোকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়াছে, এবং তাঁহার ঘোষণাবাণীতে স্নেহ ও

ভালবাসার পরিচয় পাইয়া ভবিষ্যৎ সুখ শান্তির আশায় তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। সকলেই আশা করিতেছে, সম্রাট জর্জ্জ পিতার সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া ধর্ম্মার্থে এবং প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলার্থে তাহাদিগকে পালন করিবেন।

শোক-সঙ্গীত।

(১)

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত তড়িৎ ছুটিল।
শোকবার্ত্তা সসাগরা ধরায় রটিল॥
নিবিড় আঁধার ধরা, আঁধার হৃদয় ভরা,
স্থলে জলে হাহারব গগনে উঠিল॥
নাই নাই প্রাণে রব, নাই নাই শূন্য সব,
সপ্তম এডোয়ার্ড নাই, তমসা যামিনী তাই,
সপ্তম এডোয়ার্ড নাই, হৃদয়ে ফুটিল।
নাই নাই কঠিন কামান প্রকটিল॥

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

(২)

শোকাগ্নি দহনে, আকুল পরাণে, কাঁদি মোরা আজ সম্রাট বিহনে।
ভিক্টোরিয়ার শোক ভুলেছিনু সবে, নরনাথ। তব সস্নেহ পালনে॥
তব গুণ-গাথা হৃদে আছে গাঁথা,
যত স্মরি নাথ! তত পাই ব্যথা,
ওহে গুণধাম! কেন হ'লে বাম, নিবারি এ জ্বালা বলহে কেমনে॥
এডওয়ার্ড তুমি নহত' নির্দ্দয়,
বহু কার্য্যে তার আছে পরিচয়,
কাল অতি ক্রূর, বড়ই নিঠুর, হরে নিল হায় তোমা হেন ধনে॥
ত্রিদিব আলয়ে গেছ তুমি নাথ,
তথা হ'তে প্রভু কর দৃষ্টিপাত,
তোমার সন্তান করে শোকগান তাপিত হৃদয় জুড়াও শান্তি দানে॥
তব পুত্র জর্জ্জে হেরি সিংহাসনে,
ভাবী-আশা কত জাগিতেছে প্রাণে,

কর আশীর্ব্বাদ তব পুত্র 'পরে, তব সম যেন পালেন সন্তানে॥
রাজা বিনা প্রজার আছে কেবা আর,
তাই প্রাণ চায় দিতে উপহার,
নয়ন-জলে গাঁথা প্রেম-উপহার, লহ নাথ! মোরা দি'তেছি যতনে॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

(৩)

কে জানিত আসিবে গো এ আঁধার।
এত ত্বরা অশ্রুধারা ঝরিবে আবার॥
নয় বর্ষ নয় গত, ভিক্টোরিয়া স্বর্গগত,
মর্ম্মাহত এ ভারত শুনি পুনঃ সমাচার॥
এ কি হ'ল অকস্মাৎ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
ইংলণ্ডে ইন্দ্রপাত রাজেন্দ্র নাহিক আর॥
সিংহাসন ক'রে আলো, ভারতে বাসিত ভাল,
সে এডোয়ার্ড কোথা গেল, ছিন্ন প্রজা-হৃদি তার।
দাও গো ভারতমাতা শোক-অশ্রু উপহার॥

(কোরাস্)

সর্ব্বগুণে গুণাধার, এডোয়ার্ড নাহি আর,
মনোভঙ্গ আজি বঙ্গ প্রতি হৃদে হাহাকার।
কাঁদবে ভারতবাসী, আজি দিন কাঁদিবার॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু

কুষ্টিয়া বিবেকানন্দ সেবাশ্রম।

সন ১৩১৩ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে কুষ্টিয়ায় "কুষ্টিয়া বিবেকানন্দ সেবাশ্রম" নামে একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ জীবন সম্মুখে রাখিয়া প্রকৃত অভাবগ্রস্ত, অন্ধ, আতুর, খঞ্জ ইত্যাদি উপার্জ্জনাক্ষম "দরিদ্র নারায়ণগণের" যথাসাধ্য সেবা করা এবং ঠাকুর ও স্বামীজীর আদর্শ জীবন ও উপদেশাবলী সর্ব্বসাধারণে প্রচার করাই ইহার উদ্দেশ্য। কতিপয় স্থানীয় ভদ্রলোকের গৃহ হইতে মুষ্টি ভিক্ষা

এবং কদাচিৎ কোন মহাত্মা প্রদত্ত এককালীন দান দ্বারা এই আশ্রমের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। প্রথম দুই বৎসর অর্থাৎ ১৩১৩ ও ১৩১৪ সালে অতি সামান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে। অভাবগ্রস্ত দরিদ্র নারায়ণগণকে চাউল ও বস্ত্রাদি দ্বারা সাহায্য ব্যতীত আশ্রম উক্ত দুই বৎসর অন্য কোন কার্য্য করে নাই। তৃতীয় বৎসর অর্থাৎ ১৩১৫ সালে দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা ব্যতীত সঞ্চিত তহবিলের টাকা দ্বারা ঠাকুর ও স্বামীজীর উপদেশাবলী সর্ব্বসাধারণে প্রচারার্থে রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী ক্রয় করিয়া এই আশ্রম সংসৃষ্ট একটী ক্ষুদ্র পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে।

চতুর্থ বৎসর অর্থাৎ ১৩১৬ সালে পুস্তকালয়ের কলেবর বৃদ্ধি, পূর্ব্ববৎ অন্ধ, আতুর, খঞ্জ ইত্যাদি উপার্জ্জনাক্ষম দরিদ্র নারায়ণের সেবা, তৎসঙ্গে আশ্রয়হীন ব্যাধিগ্রস্ত নারায়ণের ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করান ও ঔষধ পথ্যাদির সাহায্য এবং কাহাকেও বা আশ্রমে রাখিয়া, কাহারও বা বাটীতে যাইয়া সেবকগণ সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন।

সহৃদয় মহাত্মাগণের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা এই দরিদ্র আশ্রমের সাহায্য করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা অতি সামান্য হইলেও সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেরিতব্য।

সম্পাদক—শ্রীবলদেব রায়।
কুষ্টিয়া বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, নদীয়া।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

কলিকাতা মহানগরীর দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত ইটালী "রামকৃষ্ণ-মিশনের দশমবার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে গত ৪ঠা বৈশাখ (ইং ১৭ই এপ্রেল ১৯১০) রবিবার, ডিহি ইটালী রোডস্থিত ৫নং ভবনে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আনন্দোৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবে অর্চ্চনা, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তনাদি এবং ভক্ত, অভ্যাগত, আগন্তুক ও দীন দরিদ্র নারায়ণগণের অভ্যর্থনা, যত্ন ও সেবাদি কার্য্য অতি সুচারুরূপেই হইতে দেখা গিয়াছে।

এই উৎসবে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাদের পাশবন্ধন শিথিল হইয়া তরঙ্গায়িত আনন্দ-স্রোতে গন্তব্য শান্তি রাজ্যাভিমুখে

তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন ও তাহার মধুরতা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

উৎসবের পূর্ব্ব রাত্রি হইতে স্থানীয় ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দেরা ঠাকুরকে যে কি ভক্তি ও অনুরাগের সহিত সাজাইয়াছিলেন, তাহা যথাযথ ভাষায় বর্ণনা করিতে এ ক্ষীণ লেখনী অসমর্থ। প্রশস্ত সোপানাবলী সংযুক্ত বৃহৎ পূজার দালানের ভিতর স্তবকে প্রভুর অধিষ্ঠান। আহামরি, কি অপরূপ দৃশ্য। যেন পূর্ণব্রহ্ম ত্রিতাপহারী শ্রীহরি মহান্ প্রেমময় কালী সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তি যুগাবতার রামকৃষ্ণরূপে কলিকল্মষ ভয়ভীত সন্তানগণকে অভয় ও শান্তি প্রদান করিতে পুনরাবতীর্ণ। শত শত রক্তোৎপলাননে চিত্তাকর্ষণকারী স্নিগ্ধ সুবিমল কিরণরাশি বিকীর্ণ করিয়া, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্ত সন্তানগণের মনোরথ পূর্ণ করিতে যেন আজ আবির্ভূত হইয়াছেন। গলদেশে মুক্তাসম পুষ্পমালা দোদুল্যমান। সে রূপ যিনি দেখিয়াছেন, ক্ষণকালের জন্য তিনি নিশ্চয়ই আত্মহারা হইয়াছেন।

এই উৎসবে ঠাকুরের কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, কি অন্তরঙ্গ, কি বহিরঙ্গ, কি তৎসাময়িক, কি আধুনিক, বহু জ্ঞানী ভক্ত সাধকগণের সম্মিলনে উৎসব-ক্ষেত্র আনন্দময় হইয়াছিল। তৎসঙ্গে তৎপল্লীস্থ কালীকীর্ত্তন, কালীঘাটের সাধু শ্রীঅন্নদাচরণ মিত্রের সংকীর্ত্তন এবং আর আর বহুসংকীর্ত্তন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক হরিনাম গুণানুকীর্ত্তনে আনন্দ স্রোত রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয়কারী রামকৃষ্ণদেবের উৎসবে খৃষ্টান সাহেব দর্শক উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং একদল ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমান সম্প্রদায় আসিয়া সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহারাও অন্যান্য সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের ন্যায় সরবৎ, পান, মিষ্টান্ন প্রসাদাদির দ্বারা আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। অপরাহ্নে কাঙ্গালী ভোজন আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইহা সমাধা করিতে রাত্রি ৯টা বাজিয়া ছিল। প্রায় ১৫০০ কাঙ্গালীর সমাবেশ হইয়াছিল। এই উৎসবে যাহাতে কোন বিষয়ের ত্রুটি না হয়, সে বিষয়ে ইহার কর্ত্তৃপক্ষ ও তত্ত্বাবধায়কগণ বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আদর ও যত্নে সকলেই তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

২০শে চৈত্র, ১৩১৬, কুষ্টিয়া বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। ভক্তগণ মধ্যে এবং দরিদ্র নারায়ণগণকে প্রসাদ প্রদানে সেবা করা হইয়াছিল।

১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে ঠাকুরের ফুলদোল উৎসব হইয়াছিল। আহিরীটোলা নিবাসী সেবক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ দিনে তাঁহার বাটীতে ঠাকুরের বিশেষ উৎসব করিয়াছিলেন।

পদাবলীর অভিমত।

মায়লাপুর মান্দ্রাজ-মঠ হইতে শ্রীমদ্ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পত্র—

১২—৩—১০।

প্রিয় বিজয়!

তোমার প্রেরিত "অষ্টকালীন পদাবলী" পুস্তকখানি ভক্তের প্রেমপূর্ণ হৃদয় হইতে সমুদ্গত হইয়াছে বলিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্ত মাত্রেরই যে হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে সমুদয় লীলা-গীতি তুমি গাহিয়াছ, সে সকলগুলিই পরম মনোহর হইয়াছে। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে।

শুভানুধ্যায়ী
রামকৃষ্ণানন্দ।

ঠাকুরের পরমভক্ত প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অভিমত :—

"তোমার পদাবলী ভক্তিপূর্ণ। সুরলয়ে গীত হইলে জন-মনোহর হইবে। আকরগুলি অতি সুন্দর।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের অভিমত :—

"তোমার গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি। ইহা ভাষা ছন্দের বিষয় নহে। ইহা ঈশ্বরভক্তির ভাবের উচ্ছ্বাস। লেখকের অন্তরে যে ভগবদ্ভক্তি আছে, প্রবন্ধগুলিতে তাহারই তরঙ্গ-খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। যে ভাবের এই তরঙ্গ, ঐ ভাব যত ঘনীভূত হইবে, ততই তরঙ্গ অন্তর্হিত হইয়া, তরঙ্গাধার

হৃদয় শান্তিতে ধীর স্থির হইবে। যৌবনে এই সকল ভাবের স্ফূর্ত্তি ভগবানের বিশেষ কৃপা।"

'উৎস' 'অশ্রু' প্রভৃতি পুস্তক-প্রণেতা, ভাবুক ও ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার মহাশয়ের অভিমত :—

আপনার "শ্রীরামকৃষ্ণ অষ্টকালীন পদাবলী" পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। পদগুলি বেশ সরল, সরস ও ভাবাবহ। পড়িতে পড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের নানা ভাবের নানা চিত্র যেন মনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। ধন্য তিনি, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র লীলা-কাহিনী ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে শুনাইয়া বেড়ান।"

মহাজন-বন্ধুর সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের অভিমত—

"আপনার প্রেরিত ঠাকুরের বই পাইলাম। পাঠ করিয়া ঠাকুরকেও পাইলাম। লেখায় ঠাকুর, এবং ফটোয় ঠাকুর—ঠাকুরময় পুস্তিকা।"

ধর্ম্মপ্রাণ, পরোপকারনিরত, প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ সরকার মহাশয়ের একখানি পত্র—

প্রিয়তম বিজয় বাবু,

আমি আপনার সস্নেহ উপহার পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম। "অষ্টকালীন পদাবলী" আপনার মহা সাধনের ধন। আপনার প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয় যে পুষ্পমালিকা গ্রথিত করিয়াছে, আমার বিশ্বাস তাহা সময়ে অসংখ্য ভক্ত, কণ্ঠে ধারণ করিয়া, আপনাদিগকে ধন্য ও পবিত্র মনে করিবেন। আপনি অহরহ ঠাকুরের যে প্রেমঘন-মূর্ত্তি জ্ঞান ও ভক্তির চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, তাহাই আমাদের ন্যায় ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখাইবার ইচ্ছায়, আপনি গাহিয়াছেন :—

* * এ প্রেমছবি—

ভকতরঞ্জন রবি,

(এবে) হের সবে জগতের ভাই।"

আমি দিব্যনেত্রে দেখিতেছি—এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে, যখন "চৈতন্য-মঙ্গলাদির" ন্যায় গৃহে গৃহে আপনার "পদাবলী" পূজিত ও গীত হইবে। এ অধম উক্ত পুস্তিকা পাঠে আপনাকে নিতান্ত ধন্য মনে করিতেছে, জানিবেন।

ভবানীপুর, }
৮ই মার্চ্চ, ১৯১০। }

আপনার স্নেহের
নগেন্দ্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

আষাঢ়, সন ১৩১৭ সাল।
চতুর্দ্দশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

প্রণাম।

অখিলভুবন-ভর্ত্তা, দুর্গতি-ত্রাণকর্ত্তা,
কলিকলুষহন্তা, দীনদুঃখৈক চিন্তা।
নিরবধি হরিগুণগাঁথা, কীর্ত্তনানন্দদাতা,
স্ফুরতি হৃদিনটেন্দ্রং শ্রীরামকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥

রামকৃষ্ণ-স্তোত্র।*

জয় দয়াময়, করুণ হৃদয়,
জয় রামকৃষ্ণ প্রভু;
জয় প্রেমাধার, ঈশ অবতার,
জয় জগতের বিভু।
পাপ বিনাশিতে, ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে,
খেলিলে কতই খেলা।
নিজে হ'য়ে হরি, বল হরি হরি,
আহা কি মধুর লীলা।
নরে দিতে জ্ঞান, ওহে ভগবান,
অবনীতে অবতরি,
জগতে দেখা'লে, সাধনা করিলে,
নিজেই নিজের হরি।
সাধি নানা মত, দেখাইলে পথ,
যাহে মিলে ভবপতি;
ওহে সারাৎসার, কি বলিব আর,
দাসে দেহ ধর্ম্মে মতি।
মুক্তি নাহি চাই, ভক্তি যেন পাই,
এই কর জগপতি;
রামকৃষ্ণ নাম, জপি অবিরাম,
তব পদে থাকে রতি॥

মাতৃ-মূর্ত্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিশাল গঙ্গাবক্ষে ভীষণ তরঙ্গ উঠিয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে ফেণরাশি ছুটিতেছে। প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছে। গঙ্গাবক্ষ ভয়ানক আলোড়িত হইতেছে।

---

* কুষ্টিয়া বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের সম্পাদক প্রেরিত।

অন্ধকার রাত্রি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশির ভীষণছায়া সেই প্রবল বাত্যান্দোলিত গঙ্গাবক্ষ আরও ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে।

একখানি ক্ষুদ্র তরণী। সেই ভীষণ দুর্য্যোগে, ভীষণ গঙ্গাবক্ষে, একটীমাত্র আরোহী এই ক্ষুদ্র তরণী লইয়া ভাসিতেছিল। নৌকার পাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, দাঁড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দু'এক স্থানের কাঠও সরিয়া পড়িয়াছে। নৌকা তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিতেছে, পড়িতেছে, আবার ভাসিয়া যাইতেছে। ভাসিয়া ভাসিয়া কোন আবর্ত্তের মাঝে ঘুরিতেছে, আবার অনেক দূর সরিয়া পড়িতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছে, নৌকা ডুবিল, কিন্তু ডুবিতে ডুবিতেও আবার ভাসিয়া উঠিতেছে। আরোহী জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া, আকাশ পানে চাহিল।

আকাশ অন্ধকার। চারিদিকের তরঙ্গ আসিয়া নৌকা ঘিরিল। একটা অত্যুচ্চ তরঙ্গ আসিয়া নৌকার উপর পড়িল, তারপর আর একটা, তারপর আর একটা। নৌকা হেলিয়া পড়িল। আরোহী আকুলপ্রাণে একবার চারিদিকে চাহিল—সীমা নাই, কূল নাই, শেষ নাই, গঙ্গাবক্ষ আজ অনন্ত বিস্তৃত, এ ভীষণ দুর্য্যোগে যেন কুল-সীমা বিবর্জ্জিত! তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, প্রাণ ভরিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন; তাঁহার হস্ত বদ্ধাঞ্জলি হইল, হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে "জয় তারা" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু প্রবল বাত্যায় তাঁহার ক্ষীণদেহ নৌকার উপর আছাড়িয়া ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ডুবিল।

নৌকা ডুবিল। ধূ-ধূ-ধূ—হু-হু-হু করিয়া বাতাস বহিতেছে, ফেণরাশি মাথায় লইয়া তরঙ্গ ছুটিয়াছে। আরোহী কোথায়?

মুহূর্ত্তের জন্য একবার ভাসিয়া উঠিল। হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে একবার কাহাকে ডাকিল, হস্ত বদ্ধাঞ্জলি হইল, "জয় তারা" বলিতে বলিতে আবার ডুবিয়া গেল। আকাশ অন্ধকার, বাতাসে ও তরঙ্গে ভীষণ রব!

কোথাও কিছু নাই!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রায় রাত্রি শেষে আকাশ পরিষ্কার হইল, বাতাসের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। গঙ্গাবক্ষ ঈষৎ স্থির হইল। মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ উঠিল, চাঁদের কিরণে চারিদিক উজ্জ্বল হইল।

সেই ভীষণ দুর্যোগে, সেই ভীষণ অন্ধকারে, সেই ভয়ানক গঙ্গাকূলে, একজন নির্নিমেষ নয়নে আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়াছিল। চক্ষে অশ্রু নাই, মুখে কথা নাই, হৃদয়েও বুঝি ভাষা নাই! তাহার ক্রোড়দেশে একটী মায়া-পুত্তলি—শিশু কন্যা। সে বুঝি চেতনা-বিহীন হইয়া মায়ের ক্রোড়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে!

যখন বাতাসের বেগ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছিল, আকাশের গাঢ় অন্ধকার ক্রমশঃই ঘনীভূত হইতেছিল, যে রমণী গঙ্গাকূলে বসিয়াছিল, সে তখন গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিকটবর্ত্তী দেবমন্দিরে আশ্রয় লইল। প্রবল তরঙ্গোৎক্ষেপে যেমন গঙ্গাবক্ষ বিলোড়িত হইতেছিল, সেই রমণীর হৃদয়ও তেমনি দুশ্চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। তাঁহার স্বামী দুরারোগ্য রোগে জীবন্মৃত হইয়াছিলেন, তদবস্থায় তাঁহাকে গঙ্গার পরপারে যাইতে হইয়াছিল। ধনাঢ্য জমীদার তাঁহার পৈতৃক ভিটার একটু সুবিধা করিয়া দিবেন, সেই আশ্বাসে সেইদিনই তাঁহাকে ক্ষুদ্র একখানি নৌকা করিয়া গঙ্গাপার হইতে হইয়াছিল। তাঁহার আশা কতদূর পূর্ণ হইয়াছিল, কেহই জানিতে পারিল না, প্রত্যাগমন সময়ে, প্রবল বাত্যায় তাঁহার ক্ষুদ্র নৌকা ডুবিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চিরদিনের মত সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইলেন।

অধিক বিলম্ব হইলেও সন্ধ্যার মধ্যেই তাঁহার ফিরিবার কথা, কিন্তু যখন সে সময় অতিবাহিত হইল, তাঁহার পত্নী রাত্রির অন্ধকারে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। প্রবল ঝড় উঠিল, তিনি শিশু কন্যাকে বুকে রাখিয়া, নিকটবর্ত্তী দেবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। যতক্ষণ প্রবল ঝড় বহিতেছিল, তিনি যুক্তকরে দেবতার নিকট কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছিলেন। সতীর নয়ন হইতে জলধারা পতিত হইতেছিল, নয়ন-জলে দেবতার মন্দির সিক্ত হইল। ধূপ-ধুনার সৌরভের সহিত সতীর ব্যথিত হৃদয়ের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস মিশিতে লাগিল।

ঝড় থামিয়া গেল, দরিয়ার তুফান তখনও শান্ত হয় নাই। আকাশ পরিষ্কার হইল, অন্ধকার বিদূরিত হইল, আবার চাঁদের কিরণে চারিদিক উজ্জ্বল হইল, কিন্তু সেই রমণীর হৃদয়ের কাতরতা তখনও প্রশমিত হইল না। তিনি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, দেবতার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া, মন্দির হইতে বাহির হইলেন। শিশুকন্যা দেবতার পদপ্রান্তে নিদ্রায় অচেতন রহিল।

দুঃখিনী গঙ্গাপানে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে, কিন্তু কিছুই দেখিতে

পাইতেছে না। তাঁহার চক্ষের পলক বুঝি পড়িতেছে না, নিশ্বাস বহিতেছেনা, শোণিতও বুঝি চলিতেছেনা—সব স্থির, সব নিশ্চল।

দুঃখিনী সেই একই ভাবে বসিয়া রহিল। ক্রমে চাঁদের আলোকে উষার আলোক মিশিল, সে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে পৃথিবী শোভাময়ী হইল। সে অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া কে বলিবে, কিছু পূর্ব্বে এই গঙ্গাবক্ষে কি সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! প্রকৃতি হাস্যময়ী, শোভাময়ী, লীলাময়ী, দুঃখিনীর প্রাণের ব্যথায় তাহার হাসির কিছু ব্যতিক্রম হইল না।

সেই রাত্রি-শেষের জ্যোৎস্না ও উষার আলোক মিশ্রিত অপূর্ব্ব শোভা সকলই শোভাময় করিল। প্রবল ঝটিকার পর, বৃক্ষবল্লরী যেন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। গঙ্গাবক্ষে চঞ্চল লহরিগুলি জ্যোৎস্না-স্নাত হইয়া, নিদ্রালসে ঢলিয়া পড়িল। সবই সুন্দর, সেই বিষাদপ্রতিমাও সেই সৌন্দর্য্যের মাঝে শোভাময়ী। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছিল, বক্ষের শোণিত অশ্রুরূপে নয়নে প্রবাহিত হইতেছিল—তাহা সৌন্দর্য্যের তীব্রতা নষ্ট করিয়া, স্নিগ্ধ মধুরভাবে অধিকতর রমণীয় করিয়াছিল। জগতের বুকে এই প্রাণভেদী হাহাকার, এই মর্ম্মচ্ছেদী দীর্ঘশ্বাস না থাকিলে বুঝি প্রকৃতির এ আনন্দদায়িনী মূর্ত্তি, এত রমণীয় হইত না। সৃষ্টির এই বিশ্ববিমোহন সৌন্দর্য্যের মাঝে অশ্রুধারা না বহিলে বুঝি সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা অসম্ভব হইত! দীর্ণ হৃদয়ের করুণ ক্রন্দনই বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত!

পতি-বিয়োগ-বিধুরা ক্রমে ক্রমে সকলই অবগত হইলেন, সকলই বুঝিলেন। প্রাণের সকল আশা দূর হইল, চক্ষের জলও তখন থামিয়া গেল। তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন, শূন্যদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

নির্ম্মল আকাশতলে, নির্ম্মল উষার আলোকরঞ্জিত গঙ্গাবক্ষে তিনি নির্নিমেষ নয়নে চহিয়া রহিলেন। একটী ভগ্ন কাষ্ঠখণ্ড ও একটী দাঁড় গঙ্গায় ভাসিতেছে; আর একটী নশ্বর দেহ—নশ্বর, অতি তুচ্ছ, অতি হীন, অথচ যাহার বিনিময়ে তিনি স্বর্গরাজ্যও কামনা করেন না, সেই দেহ গঙ্গার গভীর জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া বিধবার প্রাণের সকল যন্ত্র ভাঙ্গিয়া, এক গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল। সে নিশ্বাস তখনই জগতের বায়ুতরঙ্গে চিরদিনের মত মিলাইয়া গেল।

কেহ, শিশু কন্যাটিকে জননীর নিকট আনিয়া দিল। আবার সে দেহে প্রাণের সঞ্চার হইল, জীবনে মমতা আসিল, আবার ধমনীতে ধমনীতে শোণিত

স্রোত বহিল, শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিল, বিলুপ্তপ্রায় স্মৃতি আবার জাগরিত হইল।

তখন শতগ্রন্থিময় মলিন বস্ত্রখণ্ডে কুসুম-সুকুমার দেহ ঢাকিয়া, আলু-লায়িত-কুন্তলা সে বিষাদপ্রতিমা, মায়ার পুত্তলি বুকে চাপিয়া, সেই গঙ্গা-সৈকতে ঘুরিতে লাগিল। যাহা খুঁজিতে লাগিল, তাহা পাইল না, তবু চলিল। তটস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছগুলি চরণের গতিরোধ করিতেছে, কণ্টকবৃক্ষের সংঘর্ষণে চরণ হইতে শোণিত নির্গত হইতেছে, কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। দুঃখিনী শূন্যমনে চলিয়াছে। সদ্য-শোক-সন্তপ্তা, মলিন-বসনা, রক্ত-প্লাবিত চরণা সেই দুঃখিনী শূন্যমনে ঘুরিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে এক একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া, গঙ্গার পানে দেখিতে লাগিল। নবোদিত সূর্য্যের রক্তিমচ্ছটায় অগাধ জলরাশি রঞ্জিত হইয়া, তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে,—আর কোথাও কিছু নাই!

হায়! সে নিমজ্জিত দেহ কি একবার ভাসে না? একবার, এক মুহূর্ত্তের জন্য কি আর দেখা যায় না? তাহা হইলে, সতী জন্মের মত একবার সে চরণ বক্ষে ধারণ করেন! মৃতদেহ ক্রোড়ে রাখিয়া, সতী অনিমেষ নয়নে মুখপানে চাহিয়া আছে,—আজ সতীপ্রতিমা সাবিত্রীর সে পুণ্যস্মৃতি দুঃখিনীর হৃদয়ে জাগিল। গলিত শব-দেহ ভেলায় তুলিয়া, সতী ভাসিয়া চলিয়াছে, বেহুলার সে পুণ্য-কাহিনীও স্মৃতিপটে উদিত হইল। হায়, দুঃখিনী কি একবার সে মৃতদেহ পাইতে পারে না? সর্ব্বসন্তাপহারিণী ভাগিরথী কি দয়া করিয়া, তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসাইয়া, সে দেহ তীরে উঠাইবেন না?

দুঃখিনীর জীবনসর্ব্বস্ব গঙ্গাগর্ভে চির-নিদ্রিত! সেই নিদ্রিতের পার্শ্বে আপনার বিদীর্ণ হৃদয় রাখিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন।

মাতাকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া, কন্যা আধস্বরে জিজ্ঞাসিল,—"মা, বাবা কৈ?"

মা কথা কহিলেন না। অবোধ শিশু আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, বাবা কৈ?"

জননী অঙ্গুলি সঙ্কেতে গঙ্গাপানে দেখাইয়া দিলেন। কন্যা সেইদিকে চাহিল, কিছু দেখিতে না পাইয়া, আপন মনে একটী ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া, গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই দুর্য্যোগের দিনে বেশী বৃষ্টি হয় নাই। বড় ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ছোট বড় অনেক বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। বৃক্ষসমূহ একরূপ পত্রশূন্য হইয়াছে। ধনীর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়াছে, ভিখারীর জীর্ণ কুটীরও পড়িয়াছে।

এই সকল দেখিতে দেখিতে সেই দুঃখিনী বিধবার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তখন তিনি অতি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। হায়! তাঁহার সেই ক্ষুদ্র কুটীর খানির মধ্যে যে তাঁহার অষ্টম বৎসরের পীড়িত পুত্রটী ঘুমাইয়া আছে।

এক স্থানে সারি সারি কতকগুলি নারিকেল ও আম্রবৃক্ষ। তাহারই মাঝখানে এই ক্ষুদ্র কুটীরখানি ছিল। কুটীরের পশ্চাতে সুন্দর মাঠ। মাঠ হইতে দুঃখিনী দেখিলেন, তাঁহার সে কুটীর নাই! দুই চারিটা গাছ তাহার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

কুটীর নাই, কুটীরের তৃণাচ্ছাদিত সেই চালাখানি ভূমিসাৎ হইয়াছে। মৃত্তিকা-প্রাচীরেরও সেই দশা হইয়াছে। তখন সেই দুঃখিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। বক্ষস্থিত শিশু কাঁদিয়া উঠিল, তবুও ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল, অধরোষ্ঠ কাঁপিল, হৃৎপিণ্ড চঞ্চল হইল, মুক্তকেশরাশি বায়ুভরে উড়িতে লাগিল। অঞ্চল ভূমে লুটাইল। হায়! তাঁহার সে কুটীর নাই!

কুটীর নাই, তাঁহার পুত্রও কি তবে নাই? আকাশের বজ্র কেন তাঁহার মাথায় পড়িল না?

অনাথিনী শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কন্যাকে উঠানে বসাইয়া, ভূপতিত গৃহ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার সে পীড়িত, নিদ্রিত শিশুটী কোথায় গেল?

বিধবা তখন স্বামীর শোক বুকে চাপিয়া, কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন,—"বাবা আমার, কোথায় তুই?"

কেহ ছিল না, কেহ উত্তর দিল না।

চাহিয়া চাহিয়া জননী দেখিলেন, সেই ভূপতিত তৃণাচ্ছাদিত চালাখানির ভিতর একখানি ক্ষুদ্র হাত ঈষৎ দেখা যাইতেছে। কম্পিত হস্তে, ধীরে ধীরে চালাখানি একটু উচু করিয়া তুলিয়া, জননী দেখিলেন, এক বংশখণ্ড তাঁহার প্রাণপুত্তলির পৃষ্ঠভেদ করিয়া বক্ষঃ দিয়া বহির্গত হইয়াছে, আর মৃৎ-প্রাচীরের একটা অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, বালকের ললাট চূর্ণীকৃত করিয়াছে।

তখন সূর্য্যের আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত, অথচ সেই পতিপুত্রহীনা রমণী চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন। অন্ধকার অতি গাঢ়, বুঝি সূচিভেদ্য সে অন্ধকার! সহসা তিনি দেখিতে পাইলেন, অতি পরিষ্কার, অতি উজ্জ্বল, অতি বিরাট এক জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ স্বর্গমর্ত্ত্য অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের রূপপ্রভায় কোটী সূর্য্য পরাস্ত হইয়াছে! রমণী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, তাঁহার চরণ প্রতি লক্ষ্য করিলেন। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেই রোগক্লিষ্ট দারিদ্র্যপীড়িত স্বামী অতি দ্রুতগতিতে আসিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় বিরাট পুরুষের চরণে লীন হইল, তাঁহার আদরের গোপালও পিতার পশ্চাতে আসিয়া, সেই চরণে মিশিয়া গেল! কেহ তাঁহার দিকে চাহিল না, কেহ একটা বিদায়ের কথাও বলিল না! রমণী এবার ভীতা হইলেন, কাঁপিতে কাঁপিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন— "তুমি কে মহাপুরুষ! আমার সর্ব্বস্ব লইলে ত আমায় রাখিলে কেন?"

এ কথার উত্তর কেহ কখন শুনে নাই, তিনিও শুনিলেন না, মূর্চ্ছিতা হইয়া, সেই প্রাঙ্গণে পড়িয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যায়, প্রসাদপুর জমীদার ভবনে নহবত গৃহ হইতে পুরবীরাগে সানাই মধুর আলাপ করিতেছিল। উচ্ছ্বসিত স্রোতস্বতীর মধুর জলকল্লোল সেই মধুর সঙ্গীতে মিশিয়া যাইতেছিল। মধুর বায়ুহিল্লোল নরনারীকে উৎফুল্ল করিতেছিল।

জমীদারের অন্তঃপুরে, গৃহ-বাতায়নে বসিয়া, এক প্রৌঢ়া রমণী একদৃষ্টে পথপানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন। শীতল বায়ু তাঁহার উত্তপ্ত ললাট শীতল করিতে পারিল না, স্নিগ্ধ সান্ধ্যশোভা তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিল না, তিনি একান্ত মনে চিন্তা করিতেছিলেন।

কতক্ষণ এই ভাবে অতীত হইলে, সহসা তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, পথ দিয়া কেহ যাইতে যাইতে বলিতেছে—"বিধাতা বিমুখ না হলে কি এমন সর্ব্বনাশ হয়? একই দিনে পতিপুত্র হীন হইল!"

কে—কাহার কথা বলিতেছে, জানিবার জন্ত রমণী মুখ বাড়াইলেন, ভাল বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার পুত্র

প্রবাস হইতে ফিরিতেছে, নৌকার পথ, গতরাত্রে ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে,—তবে কি তাহার কিছু অমঙ্গল হইয়াছে? তাঁহার স্বামী,—স্বামীর কথা স্মরণ হইবামাত্র, সতীর হৃদয় আরও ব্যাকুল হইল, তাঁহার স্বামী আজি প্রাতঃকাল হইতে কি দুরভিসন্ধিতে গৃহের বাহিরে গিয়াছেন, এখনও প্রত্যাগত হন নাই—তাঁহারই কিছু বিপদ ঘটিল? তিনি কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। ঠিক করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। প্রাণের ব্যথা বুঝিবার তাঁহার কেহই ছিল না। তিনি যুক্তকরে, মুদ্রিত নয়নে, তাঁহার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন।

ইতিমধ্যে বাড়ীর এক পরিচারিকা আসিয়া, গতরাত্রের নৌকাডুবির কথা পাড়িল। সেই দুঃখিনী পতিপুত্রহীনা হইয়া যে দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে, সে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। শুনিয়া জমীদারগৃহিণী চক্ষের জলে বুক ভাসাইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে এই দরিদ্র পরিবারবর্গের জন্য অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া স্বামীর অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে সকলই বৃথায় হইল। পরিচারিকা বলিল—"আহা সে ব্রাহ্মণীর কাতরাণি দেখিলে পাষাণও বুঝি গলিয়া যায়। ভগবানের কি বিচার মা! ঠাকুর আমাদের সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন, ব্রাহ্মণীও স্বয়ং লক্ষ্মী—কি পাপে মা, এত সাজা?"

গৃহিণী চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, আমরা ত কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না, লোকে বলে ইহা কর্ম্মফল! কিন্তু সে বিচারে প্রয়োজন নাই, এখন সেই দুঃখিনীকে দেখিতে হইবে।"

ইতিমধ্যে অন্দরে সংবাদ আসিল, জমীদার গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তাঁহার দেহ নিতান্ত অবসন্ন, মন নিরানন্দ! গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া পথপানে চাহিয়া রহিলেন, নানা দুশ্চিন্তায় তাঁহার মন অস্থির করিয়া তুলিল।

যখন তাঁহার স্বামী অন্দরে আসিলেন, গৃহিণী দেখিলেন, তাঁহার স্বামীর এক দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা তাঁহার সঙ্গে আছেন। ঐ ব্যক্তি মূর্ত্তিমান পাপ হইতেও ভয়ানক! গৃহিণী অগ্রসর হইতে পারিলেন না, দূর হইতে স্বামীর চিন্তাক্লিষ্টমুখ, উদ্বেগপূর্ণ নয়ন দেখিয়া, ব্যথিত হইলেন।

তাঁহার স্বামীর সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। তিনি শয়নগৃহে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার সেই পাপ ভ্রাতাও সঙ্গে সঙ্গে বসিল, তখন দুইজনে তাঁহাদের বাকি কথা শেষ করিলেন।

জমীদার বলিলেন, "একখানা চিত্র দেখিয়া, এমন হইবে, তা আমি মোটেই ভাবি নাই!"

তাঁহার আশ্রিত ভ্রাতা বলিলেন, "আমিও আশ্চর্য্য হইতেছি! সত্যই কি সেখানা চিত্র?"

জমিদার। চিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি তাহা স্পর্শ করি নাই। আমার সে ক্ষমতা ছিল না। জীবনে অনেক পাপের অভিনয় করিয়াছি, এখনও আশা মিটে নাই! উৎসাহশীল, যৌবনোদ্দীপ্ত যুবার ন্যায় আমি এখনও অগ্রসর হইবার আকাঙ্ক্ষা করি। জীবনের এতটা পথে আসিয়াও পশ্চাতের দিকে চাহিয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার প্রবৃত্তি আজিও আমার আসে নাই! তুমি জান, সেই যুবতী আমার লালসা বহ্নির ইন্ধনস্বরূপ, সে রূপ-মোহে আমায় মজাইয়া ছিল। সুবিধা বুঝিয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। মধ্যাহ্নে মেঘের ছায়ায় পৃথিবীর মুখে একটা আঁধার আবরণ পড়িয়াছিল। সেই আধ আলো, আধ অন্ধকারে, আর কোন দিকে আমার দৃষ্টি ছিল না, আমি তাহার আশাপথ চাহিয়া তাহার গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ছিলাম। সে যখন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার সে হাস্যসমুজ্জ্বল মুখমণ্ডলে কেমন এক শান্তভাব নিরীক্ষণ করিলাম। আমি তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিতে হাত বাড়াইলাম। সহসা দেয়ালে আমার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, ক্ষুদ্র একখানি চিত্র, কিন্তু সেই চিত্রে যে দেবতার প্রশান্ত মধুরমূর্ত্তি চিত্রিত, সহসা যেন তাহা সজীব হইল। সেই চিত্রিত নয়ন যেন আমার দিকে চাহিল! সে দৃষ্টিতে ঘৃণা নাই, ক্রোধ নাই, শাসন নাই; স্পষ্ট দেখিলাম,—সে নয়ন করুণা-রঞ্জিত, বিপন্ন সন্তানের প্রতি পিতামাতার যে কাতর দৃষ্টি, সে সহাস্যমুখমণ্ডলে, সেই ভাবের অভিব্যক্তি! আমি হাত গুটাইলাম, মরমে বুঝি মরিয়া গেলাম। আর দাঁড়াইলাম না, দ্রুতগতিতে সেখান হইতে বাহির হইলাম।"

ভ্রাতা। যা হোক দাদা, বড় তাজ্জব ব্যাপার, সন্দেহ নাই! অন্যের মুখে শুনিলে, রূপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। তোমার মুখে দেবতার কথা, ধর্ম্মের কথা, এ সকল ত কখন শুনি নাই! তা যা হোক, এখন মাথাটা ঠাণ্ডা কর'—আমি ত পূর্ব্বেই বলেছিলাম, ও বাড়ীর লোকের উপর দেবতা দানবের অনেক উৎপাত আছে—ওদিকে নজর দিওনা। আমি তোমাকে আর একটা শুভসংবাদ শুনাইব, তার আগে মাথাটা ঠাণ্ডা করি এস।"

দাদা হাঁ না, কিছু না বলিয়া, কিছু অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। গুণের ভাই তখন একটু রঙ্গিন জল আনিয়া দাদার মাথা শীতল করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলেন—গতরাত্রের ঝড়ে নৌকা

ডুবিয়া, সত্যপ্রিয় সব খেলা শেষ করিয়াছে, এখন সেই রূপসী তোমার পথ চাহিয়া আছে !"

তখন একটা বিকট আনন্দের চীৎকার সেই গৃহ মুখরিত করিল, জমিদার তাঁহার ভ্রাতার কাঁধের উপর ভর দিয়া, বাহির হইয়া গেলেন।

চিন্তাক্লিষ্টা সাধ্বী সে দৃশ্য দেখিয়া, চক্ষের জল মুছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জীবনের এ বিষম প্রহেলিকায় ফেলিয়া, একি খেলা খেলিতেছ, দয়াময় ! কর্ম্মফল কি তোমার করুণার অপেক্ষাও বেশী শক্তি ধরে? এ কর্ম্মবন্ধন কি তোমার অনন্ত করুণাতেও বিচ্ছিন্ন হইবার নহে? বিপন্ন বলিয়া যদি দেখা দাও, আশার অভয়বাণী শুনাইয়া, যদি সুপ্ত আত্মা উদ্বোধিত কর, আবার চক্ষের অন্তরাল হ'য়ে কেন লোভের পাশে বাঁধিয়া দাও ?

জমীদারের সে শুভমুহূর্ত্ত স্থায়ী হইল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে ভাব অন্তর্হিত হইল। বাহিরের বৈঠকে পাঁচ মোসাহেবে পরিবৃত হইয়া, দুনিয়ার সুখের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।

তখন গতরাত্রের ভীষণ ঝড়ের কথা উঠিল। ঝড়ে নৌকা ডুবির কথা উঠিল। নৌকারোহী ব্রাহ্মণের শোচনীয় মৃত্যুর কথার আলোচনা হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের বিধবা পত্নী নাকি অলোকসামান্যা সুন্দরী! সে এখন অসহায়া, মাথা রাখিবার কুটীরখানি পর্য্যন্ত নাই !

কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিলেন, "এতদিনের পর সুখের দিন আসিয়াছে। আর তোমাকে কষ্ট করিয়া এখানে সেখানে ঘুরিতে হইবে না, একটু সুযোগ সুবিধা করিয়া একেবারে বাগান বাটীতে আনিতে পারিলেই সকল সাধ পূর্ণ হইবে।"

জমীদার। সে ভার লইবার একজন যোগ্য ব্যক্তি আছে, আমি তাহাকে হাত করিব। এই রমণী সামান্যা নহে। কোন অত্যাচার করিলে হয়ত আত্মহত্যা করিবে, ব্যস্ত হইলে চলিবে না—অতি ধীরে, অতি সাবধানতার সহিত টোপ ফেলিতে হইবে! হতভাগ্য স্বামীটার আর কিছু না থাক, ধর্ম্মবিশ্বাসটা বড় প্রবল ছিল, সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পত্নীতেও তাহা সংক্রামিত হইয়াছে।

বন্ধু। রমণীর আবার ধর্ম্ম! যে রূপসী, তার জন্য শত শত পিপাসিত

লোক হৃদয়াঞ্জলি লইয়া মুখপানে চাহিয়া আছে! সে মহত্বের গর্ব্ব, সে রূপের অভিমান, সে মনুষ্য হৃদয়ের উপর প্রবল আধিপত্য—সে কি তুচ্ছ? তাহা পায়ে ঠেলিয়া, শুষ্ক—নীরস—মিথ্যা ধর্ম্মের ভার লইয়া কি রমণী একদণ্ডও থাকিতে পারে? যার ধর্ম্ম, তার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে!

জমীদার। তোমার এ মতে আমার মিলিল না। আমি মাতাল হই, পাপী হই, আমি অন্তরের অন্তরে বিশ্বাস করি, ধর্ম্মই রমণীর প্রধান অবলম্বন! রূপ বল, প্রেম বল,—ধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া না থাকিলে সে সব অতি হীন, অতি তুচ্ছ! আমার এমন দিন গিয়াছে, আমি আহার নিদ্রা ভুলিয়া, তাহার জন্য পথে বসিয়াছিলাম। আমার বিপুল বৈভব তাহার চরণতলে রাখিতে চাহিয়াছিলাম, সে তবু আমার প্রতি চাহিল না। পৈতৃক দেনার দায়ে তাহার স্বামীকে সর্ব্বস্বান্ত করিলাম, পথের ভিখারীরও অধম করিলাম, দেশ হইতে বসবাস উঠাইয়া দিলাম, তাহার সোণার সংসার ছারখার করিলাম,—তবু সে আমার হ'ল না।

ভ্রাতা। তুমি যে দাদা গোড়ায় ভুল করেছ। অত্যাচারের ভয়ে কি রমণী ধরা দেয়? এতটা না করিলে হয়ত কালে তাহাকে পাইতে।

জমীদার। প্রথম বয়সে অর্থের লালসাটাও আমার বড় প্রবল ছিল। আমার বাগান বাড়ীর পার্শ্বে উহাদের বাড়ী ছিল, বাগানের শ্রী বাড়াইবার জন্যই কৌশলে ঐ বাড়ী হস্তগত করি। দেনার দায়ে, সমস্ত জমী দখল করিয়া, উহাদিগকে প্রসাদপুর হইতে তাড়াইয়া দিই। দেশের লোক কিন্তু উহাদের জন্য কাতর। তখন যদি সুন্দরী একবার আমার নিকট মিনতি করিত, বুঝি সব ফিরাইয়া দিতাম।

বন্ধু। সে কি সত্যই এত সুন্দর? এই বয়সেও কি সে রূপে তেমন আকর্ষণ আছে?

জমীদার। সে রূপ যে কেমন, তা না দেখিলে বুঝা যায় না। সে রূপের উপর কালের প্রভাব নাই! আমার মনে হয় দেবতাও সে রূপের জন্য স্বর্গত্যাগী হইতে চাহে!

এইরূপ নানা প্রসঙ্গই চলিতে লাগিল। সুরামায়াবিনীর সে অপূর্ব্ব শক্তি সকলকেই উন্মত্ত করিয়া তুলিল, এবং সেই পতিপুত্র শোকসন্তপ্তা রমণীর সৌন্দর্য্যের আলোচনায় সে গৃহ মুখরিত হইল। সে নরকের ছবি চিত্রিত করিবার শক্তি আমার নাই।

সেই রূপসীকে পাইবার নানা মন্ত্রণাও চলিল। তাহার দুঃখের দশা, তাহার মর্ম্মচ্ছেদী শোকের যাতনা কেহ একবার ভাবিল না! যাহার দেবচক্ষুর্ল্লভ রূপের আলোচনায় সেই গৃহ মুখরিত হইতেছিল, সেই প্রফুল্ল শতদল আজি প্রাণঘাতী যন্ত্রণায় ভূমে লুটাইতেছিল, কেহ একবার সে কথা ভাবিল না! যাহার নবনী-সুকুমার-কোমল কপোল আজি অশ্রুধারায় নিষিক্ত হইতেছিল—সে অশ্রুধারা মুছাইবার জন্য কেহ আসিল না, কাহারও প্রাণ কাঁদিল না।

কাহারও প্রাণ কি কাঁদিল না? আমরা তাই মনে করি বটে। কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে কেহ না কেহ কাঁদে। সেই পূত অশ্রুবিন্দু জীবনের দুরারোগ্য ক্ষতমুখে শান্তির প্রলেপ লাগাইয়া দেয়, নহিলে এ দুঃসহ জীবন বড়ই বিড়ম্বনার হইত! জমীদার গৃহিণী সেই পতিপুত্রহীনা রমণীর উদ্দেশে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেন। আমি বিশ্বাস করি, জগতের বায়ুতরঙ্গ সে সমবেদনার তপ্তঅশ্রু বহন করিয়া দুঃখিনীর হৃদয়স্পর্শ করিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঝড় থামিয়াছে, দরিয়ার তুমুল তুফানও শান্ত হইয়াছে। প্রকৃতির হাসিমুখ আবার ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুঃখিনী বিধবার বুক ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তাহাতে কি! অসীম বারিধিকূলে অসংখ্য বালুকণার এক ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রকণা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, কে তাহার কথা ভাবে! সংসারের শত আনন্দ কোলাহলের মাঝে, কোথায় কোন নিভৃতে বসিয়া, কে নয়নের জলে বুক ভাসাইতেছে, কে তাহা জানিতে চাহে! বুকভরা আশা, প্রাণভরা ভালবাসা—তার মাঝে কোন্ দীর্ণ হৃদয়ের তপ্তশ্বাস, কে অনুভব করিতে চাহে!

দুঃখিনী কঠোর কর্ম্মফল ভোগ করিবে, তাই বলিয়া তাবৎ সংসার তাহার জন্য সকল সাধ আহ্লাদ বিসর্জ্জন করিতে পারে না। দুঃখিনীর কন্যা অনাহারে মরিবে বলিয়া, সুখের সংসার তাহার সুধার পাত্র ফেলিয়া দিতে পারে না। এরূপ অযথা আবদার কেহ সহিতে পারে না, কেহ সহিলও না।

সেই দুঃখিনী, সেই শিশু কন্যার মুখ চাহিয়া আবার ভাঙ্গাবুক জোড়া দিল। সর্ব্বস্ব হারাইয়াও আবার তাঁহাকে বাঁচিতে হইল।

আমি বলিয়াছি, প্রসাদপুরের পরপারে একটী সুন্দর মাঠের ধারে, যেখানে

কতকগুলি আম্র ও নারিকেল বৃক্ষ একত্র দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই নিকট এই দুঃখিনীর ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। প্রতিবেশী দয়ার্দ্র লোকের কৃপাগুণে সেই কুটীর আবার পূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। তাঁহাদের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, এই অসহায়া বিধবা, অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আবার সেই কুটীরে প্রবেশ করিলেন। হায়! সে সোণার শিশুত আর ফিরিল না।

লোকের দয়াই এখন তাঁহার প্রধান অবলম্বন, কিন্তু লোকের দয়াত চিরদিন সমান থাকে না, থাকিলও না। প্রথম শোকের তীব্র বেদনায় যখন সেই বিধবা জগতে আশ্রয় পাইতে ছিল না, তখন অনেকেই সান্ত্বনার অমৃত-শীতল স্নেহদানে তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক আবেগে তাঁহার চিরসহায় হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া ছিল। ক্রমে সে আবেগ মন্দী-ভূত হইয়া আসিল, সে সমবেদনা, সে স্নেহ, সে দয়া যেন ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। অতি অল্পদিনের মধ্যে যে যার কাজে ব্যস্ত হইল, দুঃখিনী আপনার কুটীরে আপনার ভগ্নহৃদয় লইয়া, দগ্ধ অদৃষ্টের কথা ভাবিতে বসিলেন।

সংসারে আপনার বলিবার তাঁহার কেহ ছিল না, সুতরাং তাঁহার অভি-মান করিবার কিছুই নাই। লোকের দয়ার দ্বার যখন রুদ্ধ হইল, গৃহের তৈজস পত্র অতি সামান্য যাহা ছিল, তাহাও এক এক করিয়া যখন বিক্রীত হইল, বিধবা অকূলপাথার দেখিলেন। কি উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়!

এই সময়ে এক প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা তাঁহার সহায় হইল। বৃদ্ধার কিছু সঙ্গতি ছিল, কখন কখন কিছু কিছু দিয়া দুঃখিনীর সাহায্য করিতে লাগিল এবং শিশু কন্যাটীকে নিজের কাছে সারাদিন রাখিয়া, খাওয়াইয়া, রাত্রে তাহার জননীর নিকট আনিয়া দিত এবং নিজেও কোন কোন দিন সেইখানে রাত্রিযাপন করিত।

কিন্তু বৃদ্ধার উপর একটা ভার চাপাইয়া, নিশ্চিন্ত থাকা দুঃখিনীর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল না। তিনি কাহারও গৃহের কার্য্য করিয়া দিয়া, জীবন ধারণের মত দুইমুটা অন্নের সংস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাহার এক প্রধান অন্তরায় হইল—তাঁহার সেই বিশ্ববিজয়ী রূপ।

দুঃখিনী যেখানে যান, অসহায়া জানিয়া লোকের লোলুপদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। মুখের উপর হয়ত কেহ মর্ম্মচ্ছেদী কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইল না! দুঃখিনী করজোড়ে, সজল নয়নে, প্রতিবেশিনী রমণীর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিল, কেহ সোণার সংসার দগ্ধ হইবার ভয়ে, কেহ তাঁহার

অপরূপ রূপলাবণ্যের হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া, কেহ বা পুণ্যের ঘরে পাপের আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইয়া, তাঁহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না! পাপিষ্ঠ লোকে হতাশ হইয়া নিজ নিজ গৃহে দুঃখিনীর প্রসঙ্গ লইয়া, নানা হাস্য পরিহাসে অযথা নিন্দা রটনা করিল।

ঘৃণায়, দুঃখে, অভিমানে—অভিমান তাঁহার গৃহদেবতা প্রত্যক্ষ নারায়ণ সদৃশ শালগ্রাম শিলার উপর—অভিমানে দুঃখিনী গৃহের বাহির হইলেন না। কোন দিন উপবাসে, কোন দিন অর্দ্ধাশনে, কোন দিন কেবলমাত্র গঙ্গাজল পান করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। যত অভিমান ঠাকুরের উপর! তিনি যে নারায়ণ, এত দুঃখ কষ্ট, এত দুর্গতি, এত সাজা দিয়া, তাঁহার কি মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হয়? তিনি যে চিরদিন এই বংশের মান ও সম্ভ্রম রাখিয়া আসিয়াছেন, অতি দুঃখে পড়িলেও এই বংশের কেহ পেটের দায়ে এমন লাঞ্ছনা সহে নাই!

এক একদিন ঠাকুর সেবার কোন উপায় হয় না। দিনান্তে হয়ত কোন দয়ার্দ্র ধর্ম্মভীত ব্রাহ্মণ একটী ফলমূল আনিয়া, নারায়ণকে নিবেদন করিয়া যাইতেন। এমন একদিন আসিল যে, তাহাও হইয়া উঠিল না। গ্রামের প্রধান ব্যক্তির হুকুম হইল, যে ব্রাহ্মণ ঐ বাড়ীতে পূজা করিবে, তিনি তাহাকে সমাজচ্যুত করিবেন। দুঃখিনী ব্রাহ্মণের চরণে পড়িয়া বলিলেন—"ঠাকুর তবে আমার উপায় কি হইবে? হিন্দুর গৃহে, ব্রাহ্মণের ঘরে, ঠাকুর উপবাসী রহিবেন, আপনি ধর্ম্মচ্যুত হইবার ভয় না করিয়া, সমাজচ্যুত হইবার ভয় করিয়া থাকিবেন।"

ব্রাহ্মণ। মা, আমি দুঃখী, যিনি আমার প্রতিপালক, তাঁহার হুকুমে আমাকে চলিতে হয়। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি ঠাকুরের পূজা করিও।

দুঃখিনী নীরব হইলেন। বুঝিলেন, এ সংসার তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে—তাঁহাকে একা বুঝিতে হইবেই, নহিলে ইহার প্রবল তরঙ্গ তাঁহাকে ভাসাইবে!

মধ্যাহ্ন কাটিয়া গেল, অপরাহ্ন আসিল, তখনও পর্য্যন্ত ঠাকুরের পূজার আয়োজন নাই! গৃহ অন্নহীন, জীবন আশাহীন, হৃদয় অবলম্বনহীন! অতীত অন্ধকারে বিলীন, বর্ত্তমান গাঢ় তমসাচ্ছন্ন, ভবিষ্যত—হে অন্তর্যামী দেবতা! ভবিষ্যত আলো কি অন্ধকার, তাহা তুমিই জান!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুঃখিনী সেই কথাই ভাবিতেছিলেন। কেন এ জীবন? এ জলবুদ্বুদ অনন্ত বারিধির জলে মিশিয়া যায় না কেন? এ জীবন ধারণের সফলতা কি? সংসারের ক্ষুদ্র কীটানুকীটেরও বুঝি একটা উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু তাঁহার কি?

তাঁহার গৃহ দেবতার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। শ্বশুরকুলের এই ঠাকুর কত সাধানার ধন,—আজ তাঁহার সেবা হয়না। নারায়ণ এ কি করিলে! পরীক্ষার কি সমাপ্ত নাই! তোমার অনন্তশক্তির নিকট এ ক্ষীণা অবলার সাধ্য কি যে বুঝিতে পারি। উপায় বলিয়া দাও, আমি চোখের জলে তোমার সেবা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে মনত প্রবোধ মানে না!

দুঃখিনীর চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল।

তখন প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, এক অতিথি সেই দৃশ্য দেখিতেছিল। দেখিতে-ছিল, দূরে গৃহস্থের আলয়ে কি সুখের অভিনয়, আর এই কুটীরে এ কি করুণ ছবি! চাহিয়া চাহিয়া বুঝি, তাহারও চোখে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিল, সে কাতর নয়নে, ঊর্দ্ধে চাহিয়া ডাকিল, ভগবন! তুমি লীলাময় সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমার এ অপরূপ রহস্য কি, তুমি না বুঝাইলে আর কে বুঝিতে পারে!"

অতিথি ডাকিল—"মা"।

দুঃখিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। সম্মুখে এক অতিথি দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অতিথি। মা, তুমি কাঁদ কেন? দুঃখের বোঝা যখন বড় ভারি হবে, তখন দীনবন্ধু সে ভার গ্রহণ করিবেন। এখন এই সামান্য দুঃখে কাতর হয়ে, তাঁকে কষ্ট দেবে কেন, মা! আমি ত তোমায় জানি, তোমার দুঃখ কষ্টও জানি। আমার দুঃখ কষ্ট এত মা যে, মানুষে তাহা বহিতে পারেনা বলিয়াই সবই সেই গিরিধারীর পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছি। যতদিন পেরে-ছিলাম নিজেই মাথায় বহন করিয়াছি, তারপর যখন আর শক্তিতে কুলাইল না, তখন সবেগে তাঁর পাদপদ্মে ফেলিয়া দিয়াছি! তুমিও তাই করিবে। ঠাকুর যখন যেমন চালাইবেন, তখন তেমনি করিবে। তোমার আমার সাধ্য কি যে তাঁর হুকুম ঠেলিতে পারি!"

দুঃখিনী। বাবা, আমার কোন শক্তি নাই, ঠাকুর এই চোখে অশ্রুর প্রস্রবণ বসাইয়াছেন, আমি রাত্রিদিন কেবল তাহাই লইয়া আছি। তাঁহার

ন্যায় বিচার, অনন্ত করুণা, তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া আছি। কিন্তু ঠাকুর এত সাজা দিতেছেন যে, আর আমার শক্তিতে কুলায়না।

অতিথি। না মা, ও কথা বলিওনা। মানুষের শক্তি বড় কম নহে, ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাস রাখ, অবশ্যই তাঁহার কৃপায় শান্তিলাভ করিবে।

দুঃখিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"আপনাকে ব্রাহ্মণ দেখিতেছি, আপনি বলুন, হিন্দু হয়ে, গৃহ-দেবতাকে কে উপবাসী রাখিয়াছে, আমার এমন শক্তি নাই যে একটী সামান্য ফলমূলও দেবতাকে নিবেদন করি! ভিক্ষা করিয়া যে কিছু আনিব, বিধাতা তাহাতেও বিমুখ।"

অতিথি মনে মনে হাসিলেন, বুঝিলেন, বিধাতার এ রহস্য ভেদ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ব নহে। তিনি যখন যাহাকে ধরেন, বুঝি এমনি করিয়াই তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ছাড়েন। এই সময়ে যে তাঁহাকে ধরিয়া রহিল, তাঁহারই জয় অনিবার্য্য, যে হাল ছাড়িয়া দিল, সে ভাসিয়া গেল! তিনি বুঝিলেন, এ দুঃখের অবশ্যই পুরস্কার আছে।

তখন তিনি তাঁহার থলিয়ার ভিতর হইতে আতপ তণ্ডুল ও কতকগুলি ফল বাহির করিলেন, এবং সেগুলি দুঃখিনীর নিকট রাখিয়া বলিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণ, এখনও অভুক্ত আছি, যদি তোমার অমত না হয়, আমি এই গুলি দিয়া ঠাকুর পূজা করি।"

দুঃখিনী আসিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি লইলেন।

সন্ধ্যার সময় এক বৃদ্ধা দুঃখিনীর কন্যাকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। শিশু প্রত্যহই জননীর অশ্রুসিক্ত নয়ন দেখে, আজ দেখিল—সে নয়নে আর অশ্রু নাই, কি এক আশার আলোকে সে নয়ন উদ্ভাসিত করিয়াছে! সে যেন অবাক হইয়া, জননীর মুখপানে চাহিয়া রহিল, চাহিয়া চাহিয়া ক্ষুদ্র একটী নিশ্বাস ফেলিল এবং মায়ের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া, মুখচুম্বন করিল।

মাতা, অতিথির ভগবানে নির্ভরতার ভাব দেখিয়া আশ্বাস্ত হইয়াছিলেন এবং মনে মনে বিধাতার চরণে সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা বিসর্জ্জন দিতেছিলেন। কন্যা, ক্ষুদ্র বাহুতে মাতার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া, মায়ার শৃঙ্খলে তাঁহাকে বাঁধিতেছিলেন। আসক্তি ও বিসর্জ্জনের সে পুণ্যচিত্র বুঝিবার জিনিস, বুঝাইবার নহে!

(ক্রমশঃ)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

ধর্ম্মপ্রাণ বিপিনবিহারী।

প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে একটী ১৭।১৮ বৎসরের বালক ধর্ম্মার্থী হইয়া আসাযাওয়া করিতেন। তাঁহার নাম বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়। বিপিন অতি শান্ত, শিষ্ট, মধুরভাষী, এবং সর্ব্বদা হাস্যমুখ। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার মধুর বাক্যালাপে সকলেই আনন্দ লাভ করিতেন। স্বর্গীয় মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ধর্ম্মজীবন দেখিয়া ও তাঁহার মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশকথা শুনিয়া বিপিন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তাই বিপিন প্রায় প্রতি রবিবারে যোগোদ্যানে আসিতেন। সেই সময়ে ৮।১০টী যুবক যোগোদ্যানে অবস্থিতি করিতেন। অবশ্যই সকলের সহিতই বিপিন মিষ্টালাপ করিতেন, কিন্তু এই প্রবন্ধ লেখকের সহিত বিপিনের কথাবার্ত্তার অতি ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিপিন এই সময়ে শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অব্যবহিত পরেই বিপিনের বিবাহ হয়। বিপিনের স্বইচ্ছায় এ বিবাহ হয় নাই। তাঁহার পিতার বিশেষ ইচ্ছাতেই এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। বিপিনের ধর্ম্মানুরাগ ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। যে সময়ে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, বিপিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই একখানি উড়ানী গায়ে দিয়া, নগ্নপদে বাগবাজার হইতে ৬টা ৬।০টার মধ্যে যোগোদ্যানে গিয়া পৌঁছিতেন।

রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিয়ম ছিল, তিনি প্রাতে ৮ ঘটিকায় বক্তৃতার সময় নির্দ্দেশ করিতেন। প্রাতে উঠিয়া ঠাকুরের পূজা করিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া, তবে তিনি বক্তৃতার জন্য বাহির হইতেন। সেবকগণসহ নগ্নপদে ঠাকুরের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে কলিকাতায় বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত হইতেন। বিপিন পূজায় যোগদান করিবার জন্য এবং রামচন্দ্রের সহভিব্যাহারী হইবার জন্য নিয়মমত অতি প্রত্যূষে তথায় পৌঁছিতেন। ইহা তাঁহার কম অনুরাগের ও উৎসাহের পরিচয় নহে। কি যোগোদ্যানের উৎসবে, কি বেলুড়মঠের উৎসবে, বিপিন যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া, উপস্থিত সাধারণের সেবা করিতেন। তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও সেবায় সকলেই মুগ্ধ হইতেন। বিপিন বিবাহিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনে যেরূপ ইন্দ্রিয় সংযম দেখিয়াছি, তাহা অদ্ভুত! একালে অতীব বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যাঁহারা

বিপিনের সঙ্গ করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার হৃদয়বলের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন।

যে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে প্রথম স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, বিপিন সে সময় স্বামীজীর সমীপে যাতায়াত করিতেন এবং অতি আদরের সহিত তাঁহার জীবনকথা ও ধর্ম্মোপদেশাদি শুনিতেন। স্বামিজীর সমস্ত পুস্তক বিপিন সংগ্রহ করিয়া তাহা বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অনেক পুস্তকের অনেকাংশই তিনি প্রাঞ্জলভাবে মুখস্থ বলিতে পারিতেন। স্বামীজীর পরলোকগমনে বিপিনের উৎসাহে বাগবাজারের অনেকগুলি ভদ্র-যুবক ও বালক পরদুঃখ মোচনার্থে একটী সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির যুবকগণ প্রতি রবিবারের প্রাতে গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া চাউল সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সেই চাউল অতি নিঃসহায় দীন দরিদ্র নারায়ণের সেবায় ব্যয়িত হয়। ধর্ম্ম, জ্ঞান ও পবিত্রতা বিস্তারের জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' স্থাপিত হয়। সোসাইটির যুবকগণ সকলেই শিক্ষিত। তাঁহাদের উদ্যোগে প্রতি শনিবারে শনিবারে একটী সভা আহূত হইত, এখনও প্রায় হয়। তাহাতে মানবাত্মার উন্নতি বিধায়ক বিবিধ সদালোচনা ও বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। বিপিন ইহাতে স্বামীজীর বিষয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেগুলির কয়েকটী 'উদ্বোধনে' মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেকটী তাঁহার অধ্যয়ন-শীলতার এবং অধ্যবসায়ের যথেষ্ট পরিচায়ক।

বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে একটী 'বোর্ডিং হাউস' স্থাপিত হইয়াছিল। বিপিন তাহার উন্নতিকল্পে দুই বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। গত বর্ষের Convention of religion অর্থাৎ ধর্ম্মসভায় বিপিনের বিশেষ অনুরাগ ও পরিশ্রম লক্ষিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের জন্য, পরদুঃখ মোচনের জন্য, জীবের মঙ্গলের জন্য, বিপিনের নয়নাশ্রু বহিত।

বিপিন অর্থোপার্জ্জনের জন্য সামান্য দিন শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে ঠাকুরের প্রিয়শিষ্য উদারচরিত মহাত্মা কালীপদ ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে জনডিকিনসন কোম্পানীর অফিসে আনিয়া নিযুক্ত করেন। প্রথমে অতি সামান্য বেতনে তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু নিজ অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতার গুণে, বিপিনের বেতন যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অতি ভাল-বাসার পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার বিয়োগ সংবাদে তাঁহারা অশ্রুবারি মোচন করিয়াছেন, এবং সেরূপ দক্ষ এবং নিরীহ লোক আর মিলিবে না, এ কথা

মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। বিপিন প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ এই অফিসে কার্য্য করিয়াছেন। অফিসের সকলেই তাঁহার বন্ধু। সকলের সঙ্গে সমভাব, সকলের সহিতই সহাস্য বদনে মিষ্টালাপ।

বিপিন আমোদ আহ্লাদের মধ্যে সেবক শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অভিনয় দর্শন অত্যন্ত ভালবাসিতেন। গিরিশবাবুর অভিনয় তিনি প্রত্যেকটী দেখিয়াছেন। তাঁহার নাটকগুলি তিনি অনেক স্থলে মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং তিনি অবৈতনিকভাবে গিরিশবাবুর অনেক পুস্তকের অভিনয় করিয়াছেন। গিরিশবাবুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি, অনুরাগ ও ভালবাসা ছিল। তাঁহার জীবনী লিখিতে বিপিনের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তজ্জন্য তিনি অনেক ঘটনার সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন 'লোকের পুত্রশোক হইলে, তাহার প্রাণের যেরূপ ব্যাকুলতা হয়, সেইরূপ ব্যাকুলতা যদ্যপি কাহারও ঈশ্বরের জন্য ঘটে, তাহা হইলেই তাহার ঈশ্বরলাভ হয়।' পরম নিষ্ঠাবান অনুরাগীভক্ত বিপিনের ঠাকুর সেই দশা ঘটাইয়াছিলেন। গত মাসের শেষ ভাগে বিপিনের একমাত্র একাদশ বর্ষের পুত্র টাইফয়িড জ্বরে মারা যায়। সেই শোকে বিপিনের জননী ও সহধর্ম্মিণী ব্যাকুলা, রোরুদ্যমানা। বিপিনের চক্ষে বিন্দুমাত্র জল নাই। তিনি সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। দিন কয়েক বাদে যেদিন অফিসে আসিলেন, তাঁহার জনৈক ধর্ম্মবন্ধুকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই ত সংসার! যাহার প্রতি ভবিষ্যতের আশা ভরসা রাখিয়া সংসার করিতেছিলাম, সে ত চলিয়া গেল! এই ত জগতের মোহ ও মায়ার খেলা! আর কতদিন এ পাপ ভোগ করিব! সর্ব্বদাই মনে হইতেছে, এ কোথায় আছি, কেন আমরা এ সংসারে! কবে একমাত্র ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইব, কবে তাঁহার জন্য চক্ষের জল পড়িবে! কবে তাঁহার দর্শন পাইব!"

ইহার পর বিপিন ৩।৪ দিবস অফিসে আসিয়াছিলেন। পরে জ্বর হইল। তাহা টাইফয়িডে পরিণত হইল। বিকার অবস্থায়ও ঠাকুরের কথা, মঠের কথা ও সৎপ্রসঙ্গের প্রলাপ! গত ২০শে আষাঢ়, মধ্যাহ্ন-রাত্রে প্রায় ৩৪ বৎসর বয়সে বিপিন সংসারের মোহমায়া কাটাইয়া পবিত্র পুণ্যময় স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। যাও ভাই বিপিন! যাও। যেখানে নিঃস্বার্থ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের আবাসস্থান, সেই পূতঃলোকে গমন কর। যেখানে তোমার আরাধ্য দেবতা, যেখানে তোমার আদর্শ মহাপুরুষগণ অবস্থিতি করিতেছেন

যাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্য তুমি আজীবন লালায়িত ছিলে, সেই দেবচরিত মহাজনগণের পদপ্রান্তে বসিয়া আজ তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। ভাই, প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ তোমার বন্ধুরূপে তুমি এ অকিঞ্চনকে পরিগণিত করিতে, ঠাকুর সম্বন্ধে তোমার হৃদয়ের কত মধুর ভাব শুনাইতে। ভাই, সেখানে—সেই পুণ্যময় প্রদেশে থাকিয়া আমাদিগকে এক একবার স্মরণ ও আশীর্ব্বাদ করিও, যেন আমরা তোমার পবিত্রতার ও নিষ্কলঙ্ক জীবনের অনুসরণ করিতে পারি।

দীনের নিবেদন।

ওগো, তুমিই এনেছ, তুমিই রেখেছ—
তোমারি দুয়ারে আজি,
আমি এসেছি হে নাথ, মনোসাধে, দীন
ভিখারীর সাজে সাজি।
ওগো, তুমি হে দীনের, তুমি হে হীনের,
তুমি ভিখারীর রাজা,
আজি তাই গো আমার দীন নিবেদন—
তাই গো ভিখারী সাজা।
ওই উচ্চ বিলাসে— তুচ্ছ ভাবিয়া,
ফেলিয়া দিয়াছি দূরে,
করি নগ্ন পা দু'টী, মণ্ডিত শির,
হৃদয়ে দীনতা পূরে'।
ওগো, তপ্ত প্রাণের তীব্র যাতনা,
বিনাশ'হে কৃপাদানে।
যেন সদা রত হই তোমারি সেবায়,
তোমারি কীর্ত্তন গানে।
ওগো, তব নন্দন ভব-বন্দন
ভব-বন্ধন-বিনাশী।
সেই প্রেম-সাধনে সদা আরাধনে,
হই মাধব, উদাসী।

আমি কুলীরক প্রায় যেন মহা ভ্রমে
ধরি না গো শিবা-পুচ্ছ।
সদা কাটি মায়াডোর ভাবি হে ও পদ,
মহোত্তম অতি উচ্চ।
ক্ষণ মুহূর্ত্ত লাগিয়া যেন গো না হই,
কামিনী-কাঞ্চনে রত।
ওই বড়শীর গাঁথা আহারের লোভে
অবোধ মীনের মত।
মোর আয়ুঃরবি যবে যাবে অস্তাচলে—
ফুরা'বে জীবন-বেলা.
সেই বিষম দুর্দ্দিনে দুস্তর সাগরে,
পাইতে নামের ভেলা।
তাই কহিনু তোমারে— কাঙ্গালের সখা!
প্রাণ খুলে' মনোকথা;
ওগো তুমি না বুঝিলে— তুমি না চাহিলে—
কে বুঝে প্রাণের ব্যথা।
তাই, দীর্ণ করিয়া এ দুটী নয়নে
অন্ধ করহ আমারে।
মোর অন্তরের আঁখি দাও গো ফুটা'য়ে;—
লক্ষি্য সতত তোমারে।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।

রথযাত্রা।

এই দেহ দিব্য রথে, হের জগন্নাথে, ভক্তিভরা চিতে চল চল মন।
হেরে প্রেম উথলিবে, জীবন জুড়াবে, যাতায়াত ভবে হবে নিবারণ॥
পথ হেরি কেন কাতর ভয়েতে, গুরু সাথী করে লওরে সঙ্গেতে,
তাঁহার কৃপায়, ঘুচে যাবে ভয়, অন্তরে হেরিবে সে ভবতারণ॥
মূলাধার মূলে গুরুপদ স্মরে, অকাতরে চল মায়া কালাপানি পারে,
সুষুম্নার পথে, প্রেমানন্দে মেতে, বাসনাদি টানি চল অনুক্ষণ।

যদি ক্লান্ত হও পথ পরিশ্রমে, আছে পান্থধাম দ্বাদশদল নামে,
মন, যে বাসেতে যেও, বিশ্রাম করিও, ক্লান্তি দূর হবে জনমের মতন॥
একাদশ ইন্দ্রিয়, ষড়রিপুগণ, অহংজ্ঞান এই অষ্টাদশ জন,
আঠার নালার, পরীক্ষার পার, নাহিক তথায় সন্দেহের কারণ॥
দেহ পঞ্চকোষে বিরাজেন শ্রীনাথ, প্রণব উপরি কর প্রাণপাত,
মন, খুলে জ্ঞান আঁখি, একবার দেখদেখি, শশীবিনিন্দিত রূপ বিমোহন॥
বিষয় বাসনা আটকে করি তায়, বিবেক বিধানে বাঁধ তাঁর পায়,
মন, চল কণ্ঠমূলে—অক্ষয় বটতলে, পাইবে তা হলে অক্ষয় রতন॥
আছে নীলগিরি দ্বিদল সরোজে, জ্যোতিরূপে যথায় জগদীশ রাজে,
মন, হেরিয়ে সে জ্যোতি, কর তাঁতে স্থিতি, অহংজ্ঞান তব হবে বিমোচন॥
সহস্রারে মন আনন্দবাজার, আনন্দিত মন তথা সবাকার,
নাহি জাতি ভেদ—সবে একাকার, পরমব্রহ্মে তথা কর দরশন॥
অধম পাতকী কালীদাসী বলে, প্রেম-ভক্তি দোঁহে যুক্তি কর মূলে,
মন, পাবে তার বলে, তুমি অবহেলে, দেহরথ মাঝে দেব জনার্দ্দন॥

উৎসব সংবাদ।

গত ৮ই আষাঢ়, স্নানযাত্রার দিবস, ঠাকুরের ভক্ত স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র দত্তের স্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার জনৈক আত্মীয় ঠাকুরের উৎসব করিয়াছিলেন। নিবারণ প্রতি বর্ষে ঐ দিনে উৎসব করিয়া, ঠাকুরের অনেক ভক্তকে আহ্বান করিয়া আনিয়া ঠাকুরের প্রসাদ দিতেন। ইনিও সাধ্যমত প্রতি বর্ষে এই উৎসব করিয়া আসিতেছেন। নিবারণের অনেকগুলি সংগীত আমরা পাঠকগণকে উপহার দিয়াছি। এ সংখ্যায়ও তাঁহার রচিত দুইটী সংগীত প্রদান করিলাম।

গীত।

রামকৃষ্ণ প্রভু কৃপা কর হে আমায়।
মোহে মুগ্ধ আছে মন, ভুলি তোমায়॥
দিনে দিনে মিছে দিন গত হয়,
জানি মন কেন হেলায় হারায়,

দয়াময় নাম শুনেছি তোমার,
অধীন প্রতি দয়া কর গো একবার,
তুমি জানাও যারে সেই তোমা জানে,
তাই প্রাণ শরণ চায় ও রাঙ্গা পায় ॥
দীন হীন আমি অতি মূঢ়মতি,
নাহি জানি তোমার ভকতি স্তুতি,
নিজগুণে তারো প্রভু এই নির্গুণে,
নিবেদন এই প্রভু করি তোমায় ॥

ওহে রামকৃষ্ণ দয়াময়।
দীনে হও হে সদয় ॥
মোহ-আগারে পড়ে, হারায়ে জ্ঞান,
মায়ার কুহকে আছি হইয়ে অজ্ঞান,
এখন হ'য়ে কৃপাবান্, দীনে কর হে ত্রাণ,
নাথ তোমা বিনা কেবা মোর আছে এ সময় ॥
তুমি জীবের শক্তি, জীবের মুক্তি, জীবের গতি,
তুমি হে অনাথনাথ, অগতির গতি,
শুন শুন শ্রীপতি, মম এই মিনতি,
যেন তোমা হ'তে মন মম দূরে না রয় ॥
শুনেছি নাথ তুমি অধমতারণ,
তাই তোমায় ডাকিতেছে এ অধমজন,
কর বাঞ্ছাপূরণ, ওহে দুঃখনিবারণ,
দিয়ে শ্রীপদপল্লব মম দূর কর ভয় ॥
দীনের দীন আমি অতি দীন,
হীনের হীন আমি অতি হীন,
তব শ্রীচরণ, কেবল ভরসা মম,
এবে অভয় চরণে তব লইনু আশ্রয় ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।
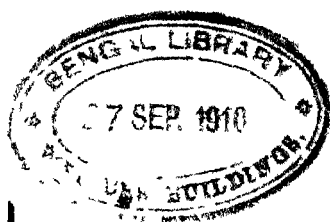
তত্ত্ব-মঞ্জরী।

শ্রাবণ, সন ১৩১৭ সাল।

চতুর্দ্দশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবলীলা।

আপন আলয় মাঝে বসি প্রভু গুণমণি।
মুকুরে নেহারি মুখ কত ভাব নাহি জানি।
রাধা ভাবে হয়ে ভোরা, প্রেমরসে মাতোয়ারা,
শ্যাম-সোহাগভরা, বৃন্দাবন-বিলাসিনী॥
খল খল খল হাসি, নিরখি বদনশশী,
যার সুধা অভিলাষী, শ্রীমতী-হৃদয়মণি॥
দুটি হাত প্রসারিয়ে, আনন্দ মগন হিয়ে,
হৃদিনিধি হৃদে পেয়ে, ফুল্লপ্রাণ রাধারাণী॥
পুন শ্যামরূপ ভাবি, আপনি সে শ্যাম ছবি,
রাধা তরে আঁখি ঝরে, না হেরে সে আদরিণী॥
মানের মোচন তরে, নিজে নিজ পারে ধরে,
সকাতরে নত শিরে, যাচে রাঙ্গা পা দু'খানি॥
হেরি এ লীলাবিলাস, মিটিল দাসের আশ,
একাধারে স্বপ্রকাশ, প্রেমরাজ প্রেমরাণী॥

[illegible]

মাতৃ-মূর্ত্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬৫ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সে দিন অতিথি প্রদত্ত সে ফলমূলে দেবসেবা হইল এবং সেই প্রসাদ সেদিন-কার মত বিধবার ক্ষুধা নিবারণ করিল।

যে বৃদ্ধা দুঃখিনীর কন্যাকে লইয়া কুটীরে আসিল, সে ভূমিতে শয্যা পাতিয়া শয়ন করিল। আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই বৃদ্ধা দুঃখিনীর একমাত্র সহায় হইয়াছিল। সে শিশু কন্যাটীকে বড় ভালবাসিত, একদণ্ড কাছ ছাড়া করিত না। বৃদ্ধার নিজের সংসার ছিল, কিন্তু এই দুঃখিনীর কেহ নাই—তার উপর রূপের আলোকে সে বড় শোভাময়ী, তাই বৃদ্ধা তাহাকে আগুলিয়া থাকিত, রাত্রে এই কুটীরে আসিয়া কখন কখন শয়ন করিত।

কিন্তু তাহার এতটা পরদুঃখকাতরতা যে পবিত্র হৃদয়ের পবিত্র কামনা প্রসূত, সে কথা বলিতে পারি না। বৃদ্ধার অন্তরের অন্তরে একটা গূঢ় উদ্দেশ্য বড় সাবধানতার সহিত লুক্কায়িত ছিল। সে কেবল অবসর খুঁজিত, সময়ের প্রতীক্ষা করিত এবং এই দুঃখিনীর দুঃখের মাত্রা কত দিনে আরও শতগুণে বাড়িবে, বোধ হয় মনে মনে সে তাহার প্রার্থনা করিত। এমন স্নেহের আবরণ, এমন সোহাগের যাদুমন্ত্র, এমন ধর্ম্মের ভাণ,—বুঝি স্বয়ং পাপ এই বৃদ্ধার নিকট হারি মানিয়া যায়!

দুঃখিনী এক এক সময় এইটুকু বুঝিত যে, এই ভালবাসার মূলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এই স্বার্থান্ধ সংসারে এমন করিয়া পরের জন্য প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া বড় সহজে দেখা যায় না। ক্রমে ক্রমে সে উদ্দেশ্য অধিকতর পরিস্ফুট হইল। রমণী বুঝিলেন, এই বৃদ্ধার আপাতমধুর ভালবাসার মূলে, তাঁহারই সর্ব্বনাশের চেষ্টা! তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

তারপর দুঃখিনীর দুঃখের চরম অবস্থা দেখিয়া, বৃদ্ধা একদিন অবসর বুঝিয়া, মনের কথা ব্যক্ত করিল। প্রসাদপুরের জমিদার ঐ রূপসীকে পাইবার জন্য বৃদ্ধার শরণাপন্ন। দুঃখিনীর জীবনযাত্রার কোন কষ্ট না হয়, এজন্য তিনি যথেষ্ট অর্থ বৃদ্ধার দ্বারা পাঠাইতেন, সে কথা সে চাপিয়া গেল। জমিদার সর্ব্বদাই তাঁহার সংবাদ লইতেছেন, কষ্টে পড়িলে তিনি সাহায্য করিবেন, এইরূপ নানা কথা বলিয়া, বৃদ্ধা একদিন সমস্তই ব্যক্ত করিল।

দুঃখিনী—তখন অন্ধকার রাত্রি, গৃহে দীপ জ্বলিতেছিল না, আকাশও মেঘাচ্ছন্ন, কোন রকমে তাঁহার মুখ দেখা যাইতেছিল না, দুঃখিনী নীরবে চোখের জলে বুক ভাসাইতে ছিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুকের ভার লাঘব হইল, বর্ষান্তে মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় চিত্ত নির্ম্মল হইল। এক এক করিয়া অনেক কথাই তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল, বর্ত্তমান ভুলিয়া তিনি অতীতে গিয়া পড়িলেন।

সে অতীত কত মধুর। তাঁহার লজ্জা-বিনম্র মুখমণ্ডল দেখিয়া আত্মীয় স্বজন ভাবিত স্বয়ং লক্ষ্মী সে গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছে। তাঁহার প্রদীপ্ত যৌবনের সে স্বর্গীয় মাধুরী দেখিয়া লোকে বলিত—ইনি শাপভ্রষ্টা কোন দেববালা! তাঁহার অসাধারণ গুণের পরিচয় পাইয়া সকলে বলিত, বিধাতা রূপ ও গুণের সমন্বয় করিয়া সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। তিনি ধনীর পুত্রবধূ হইয়াছিলেন, কিন্তু দেনায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, দারিদ্র্যের মুকুট শিরে ধারণ করিয়াও সদা প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনের সহচর—যিনি বিদ্যায় মণ্ডিত হইয়াও বাল্যাবধি দরিদ্র, যিনি প্রতিভা কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়াও অর্থাভাবে চির-মলিন, যিনি ধর্ম্মবিশ্বাসে বলীয়ান হইয়াও প্রবলের অত্যাচারে নিষ্পেষিত, যিনি সহস্র অভাবের মধ্যেও চির-প্রফুল্ল, চির-হাস্যময়, সেই দেবদুর্ল্লভ স্বামী, যিনি একদিনের জন্যও প্রবাসে যাইতে প্রিয়তমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিতেন—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশির মসৃণো মৌক্তিক সরঃ
কিমস্যাঃ ন প্রেয়ো যদি পরম সহ্যস্তু বিরহঃ॥"

প্রিয়তমা আমার গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপ, আমার নয়নের অমৃত শলাকার স্বরূপ, চন্দন লেপন তুল্য ইঁহার অঙ্গস্পর্শ আমার সুখপ্রদ, ইঁহার বাহু আমার কণ্ঠস্থ শীতল ও কোমল মুক্তাহার সদৃশ। প্রিয়ার আমার কোন্ বস্তুটী না সুন্দর? কেবল ইঁহার বিরহই আমার অসহ্য।

তাঁহার সে আদর, সে সোহাগ, সে স্নেহ, সে প্রেম, জগতে তাহার তুলনা নাই!

জীবনে অনেক দুঃখ তিনি ভোগ করিয়াছেন। স্বামী বর্ত্তমানেও অনেক কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত, কিন্তু তাহাতে একটা পবিত্র শান্তভাব বর্ত্তমান থাকিত। পৈতৃক বাসভবন হইতে বিতাড়িত হইয়া, গঙ্গার পরপারে

ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, এই দুঃখী-দম্পতি বাস করিত। সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর, সায়াহ্নে হয় ত দুই মুঠা অন্ন জুটিত, আবার কখন বা তাহা জুটে নাই; সংস্কার অভাবে কুটীরের চালাখানি ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল; নিদাঘের উত্তাপ, বর্ষার বারিধারা, হিমানীর তুষার,—নানা প্রকারের কষ্ট তাহার উপর দিয়া গিয়াছে, সে সকলে তাহারা কখন ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু শিশু পুত্র কন্যা যখন অন্নের অভাবে ধূলায় লুটাইয়াছে, ভাঙ্গা চালা হইতে বর্ষার বারিধারায় যখন তাহাদের কোমল দেহ সিক্ত হইয়াছে, স্বামীর চক্ষে জলধারা বহিয়াছে, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছেন,—"আমার উচ্চ প্রাসাদ আজ প্রসাদপুরের জমিদারের অত্যাচারে লুপ্তচিহ্ন হইয়াছে। আমার পিতৃপিতামহের হোমাগ্নিপূত ঠাকুরদালানের ইষ্টক আজ জমিদারের পায়খানায় ব্যবহৃত! আমার ধনধান্যপূর্ণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজ পিশাচের করতলগত।—আর আমি দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় দাঁড়াইয়া কঠোর কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি। হে দেবতা! বলিয়া দাও, কত দিনে এ শাস্তির পরিসমাপ্তি। কিম্বা জন্মজন্মান্তরেও এ কর্ম্মফল আমায় ভোগ করিতে হইবে।"

অধীর হইয়া বালকের ন্যায় তিনি রোদন করিতেন, আর সাধ্বী তখন সেই শতগ্রন্থিময় বস্ত্রাঞ্চল দিয়া স্বামীর চক্ষু মুছাইতেন, সর্ব্বনিয়ন্তার চরণে ভক্তি দৃঢ় করিতে বলিতেন। তাঁহারও ডাগর চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া যাইত—তখন উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া কাঁদিতেন। আর অবোধ শিশুরা আসিয়া কচি কচি হাতে পিতামাতার চক্ষু চাপিয়া ধরিত—আর অশ্রু বহিতে দিবে না!

সে ক্রন্দনে যে সুখ, হে ধনকুবের! ইন্দ্রত্ব লাভেও তোমার ভাগ্যে সে সুখের সম্ভাবনা নাই!

আজি একে একে সেই সব কথা মনে আসিতে লাগিল। একাগ্র চিত্তে সাধ্বী সেই সকল ভাবিতে লাগিলেন—সে এক অপূর্ব্ব ধ্যান। চিত্ত ভরিয়া উঠিল, সে ধ্যানে বাহ্যজগত বিলুপ্তপ্রায় হইল, অন্তর আলোকিত করিয়া পতি-দেবতার শুভ্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল! বহুদিন বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির মত, সে ধ্যানে দুঃখিনীর চিত্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিল। সে দুঃখের চিন্তায় সুখের চিত্র বিজড়িত ছিল বলিয়া, তাঁহার চিত্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিল। নয়নে বারিবিন্দু, অন্তরে আনন্দ, সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তিমধুরিমা, সে বৃদ্ধা দেখিতে পাইল না। দেখিতে পাইলে বুঝি তেমন মর্ম্মচ্ছেদী কথা বলিতে পারিত না।

নবম পরিচ্ছেদ।

তাহার পর অনেকদিন অতিবাহিত হইয়াছে। আজ এই দুঃখের দিনে, অবসর বুঝিয়া, বৃদ্ধা পুনরপি সেই কথা তুলিল।

সে বলিল,—"মা লক্ষ্মি! রাত্রি হয়েছে, তুমি কি ঘুমালে?"

দুঃখিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"না মা, ঘুমাই নাই।"

বৃদ্ধা। বলিতেছিলাম কি, তুমি যে অতিথিটাকে আজ দেখিলে, তাহাকে আর কখন এ অঞ্চলে দেখিয়াছ? সে লোকটা কেমন?

দুঃখিনী। আমি ভাল করিয়া তাঁহার মুখপানে চাহি নাই, আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া, মনে পড়ে না। তবে তাঁহার করুণ কণ্ঠস্বরে বুঝিয়াছি, তিনি সংসারত্যাগী কোন সাধুপুরুষ হইবেন।

বৃদ্ধা। তা হ'লেই হ'ল, আমি বলিবা কোন দুষ্ট লোক ছল করিয়া এসেছিল।

দুঃখিনীর অন্তরাত্মা যেন এই কথায় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন—"না মা, তেমন লোক নহে। আমি মনের কষ্টে ব্যাথাহারী মধুসূদনকে ডাকিতেছিলাম, হরি দয়া করিয়াই তাঁহার অভয়বাণী শুনাইবার জন্য ঐ অতিথিকে পাঠাইয়াছিলেন। আমার দুঃখে যে মা তিনি চোখের জল ফেলিয়াছেন!

হায়! সরলা রমণী বুঝিল না যে চোখের জলের সে পবিত্রতা আর নাই। বৃদ্ধা বলিল, "চোখের জল অমন অনেকেই ফেলিতে পারে।"

হায় অশ্রুবিন্দু! এ সংসার তোমার মূল্য বুঝিতে পারে না; এখন যেন স্বার্থান্ধ সংসার এতই হীন হইয়াছে, কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন এ সংসার দেবতার লীলাভূমি ছিল। এই সংসারের পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ও প্রেম দেবতারও কামনার বস্তু ছিল! মানবের যেটুকু দেবত্ব, মানব যেদিন তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছে, দেবতারও সেদিন অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সবই গিয়াছে, বুঝি ভুল করিয়াই কিম্বা মানবের পরিত্রাণের জন্য এই স্বর্গীয় অশ্রুবিন্দু তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন! অতিথির একবিন্দু অশ্রু বুঝি দুঃখিনীর অপরিমেয় দুঃখরাশি অপসারিত করিয়াছে, তাঁহার অশ্রুবিজড়িত সান্ত্বনাবাণী দুঃখিনীর নিরাশাদগ্ধ হৃদয় শীতল করিয়াছে।

বৃদ্ধা বলিল, "তোমার জন্য সদাই আমার মনে আতঙ্ক হয়। এমন অসহায় অবস্থায় কত বিপদ ঘটিতে পারে!"

দুঃখিনী। আমার আবার কি বিপদ হইবে, মা! আমার মনে হয়, আমার পাপের ভরার চেয়ে, আমার শাস্তির ভার গুরুতর হয়েছে।

বৃদ্ধা। সে কথা নয় মা। তোর এই অতুল রূপের রাশি দেখেই আমার এই ভয় হয়।

রূপের কথায় দুঃখিনী যেন গর্জ্জিয়া উঠিলেন, নয়নের তারা জ্বলিয়া উঠিল, দেহ হইতে যেন অগ্নির উত্তাপ বহির্গত হইল।

বৃদ্ধা এতটা বুঝিল না—কি বুঝিতে চাহিল না। দুঃখিনীকে নীরব দেখিয়া, পুনরপি বলিল,—"আমি বলিতেছিলাম কি, জমীদার বাবুর কথা কিছু মন্দ না। প্রসাদপুরে তোমার শ্বশুরের ভিটায় তিনি ঘর করিয়া দিবেন, তুমি সেখানে থাক, হাজার হোক শ্বশুরের ভিটে—সন্ধ্যাটাও পড়িবে। আর যখন তিনি তোমার সহায়, তখন কার সাধ্য কে কি বলে? এত কষ্ট পাইতেছ, ইহাত চোখে দেখা যায়না, আর কত সহিবে, মা?"

দুঃখিনী হটাৎ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কে আসিয়া যেন তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল। তিনি ধীরভাবে বলিলেন,—"কত সহিব? আমি অনেক সহিতে পারি। সহিবার জন্যইত জন্মেছি। যখন পতিপুত্র হারাইয়াও জীবন-ধারণ করিয়া আছি, তখন সহিতে পারিব না? আর দুঃখ কষ্টের কথা বলিতেছ, তা যেমন করিয়া হোক দিন ত কাটিতেছে।

বৃদ্ধা। কিন্তু আর ত কাটেনা, না খাইয়া কতদিন বাঁচিবে? এ গ্রামের যে দেখে, সেই তোমার জন্য পাগল হয়, তা আমি কাহারও কথা শুনিতে বলি না, মহতের আশ্রয় লওয়াই উচিত। তিনি তোমার জন্য অধীর, এত ধন সম্পত্তি সবই তোমার চরণে ঢালিয়া দিবেন। তোমাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া খাইয়াছেন, আবার যাচিয়া সবই তোমাদের দিতেছেন।

দুঃখিনী। মা, আর ও সব কথা বলিওনা—আমি পেটের দায়ে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিব না। তুমি এ দুঃখিনীকে কোলে স্থান দিয়াছ, এখন নরকে ফেলিয়া দিওনা। তোমার কষ্ট হয়ে থাকে ত, একটী কাজ কর। আমি শুনেছি, ঘোষালদের পাচিকা ছাড়িয়া গিয়াছে, আমাকে সেই স্থানে রাখাইয়া দাও, আমি বেতন হইতে দেবসেবা করিব, আর একমুঠা খাইয়া নিজের ও কন্যার প্রাণরক্ষা করিব।

বৃদ্ধা। এই কি মা অদৃষ্টে ছিল?

দুঃখিনী। আমার ভাগ্যে আর কি হবে? এইই আমার শেষ অবলম্বন।

বৃদ্ধা। এখনও ভেবে দেখ, মা। জমীদার সত্যই পাগল হয়েছে, তুমি তার হয়ে—

দুঃখিনী কাঁদিয়া বলিল—"মা, আমার বাড়া দুঃখিনী কেহ নাই।"

দুঃখিনী সত্য, কিন্তু দুঃখিনী হইলেও রূপের অভাব হয় না। তাঁহারও এ অবস্থায় পড়িয়া রূপের অভাব হয় নাই। তেমন আহার নাই, তবু শরীর লাবণ্যময়, বেশভূষা নাই, তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত;—যেমন মেঘ মধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল! অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয় উন্নতভাব, অনির্ব্বচনীয় প্রেম, অনির্ব্বচনীয় ভক্তি!

কিন্তু এ রূপ ত কেহ দেখিল না, এরূপ ত কেহ বুঝিল না। বৃদ্ধা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তবে সেই ভাল, আমি ঘোষালদের বাড়ীতেই ঠিক করিয়া দিব। আমার আর থাকার প্রয়োজন নাই। তোমার কন্যাকেও তবে তুমি রাখিয়া দিও। কিন্তু আমি বলি, তুমি আমার কথা শুনিলে ভাল করিতে। কে জানিত? তা তুমি যখন কিছুতেই শুনিলে না, তখন তোমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবেই।

দুঃখিনী। সেই কথাই ঠিক। আমার সাধ্য কি, আমি হাতে ঠেলিয়া আমার ভাগ্যকে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলি? তুমি অনেক করেছ মা, নিজের মেয়ের মত করে আমায় রেখেছিলে। আমার অপরাধ গ্রহণ করোনা, আশীর্ব্বাদ করিও যেন ধর্ম্মপথে থাকিয়া শীঘ্র শীঘ্র এ মাটির দেহ মাটিতে মিশাইতে পারি।

দুঃখিনীর নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বৃদ্ধা ধন প্রাপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া মনে মনে অত্যন্ত রাগিল, ভাবিল—"এমন হাবা মেয়েও থাকে? কিন্তু ছুঁড়ীটার কি রূপ! এত দুঃখে পড়েও কিন্তু রূপের তেজ কমে নাই।"

বৃদ্ধা নীরব হইল বটে, কিন্তু রূপের কথা ভাবিতে ভাবিতে সে একবার দুঃখিনীর প্রতি চাহিল।

গৃহ অন্ধকার, আকাশও অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারে সে রূপজ্যোতিঃ ফুটিয়া আছে। এ রূপ সে কমনীয় দেহের নহে; সে আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন, সে অপূর্ব্ব লাবণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল, সে সুকুমার অঙ্গসৌষ্ঠব—এ রূপ সে কিছুরই নহে! এ রূপ অন্তরের। এ রূপের অবলম্বন দেহ নহে, শুদ্ধচিত্ত। এ রূপের

অধিকারী রাক্ষসী মানবী নহে—স্বর্গের দেবী। এ রূপের দ্রষ্টা লালসা-পীড়িত মানব নহে—ধ্যাননিরত মহাযোগী! এ রূপে হৃদয়ের উত্তেজনা নাই, ভক্তির তন্ময়তা আছে, এ রূপে বিশ্বদাহকারিণী শক্তি নাই, মাতৃত্বের সঞ্জীবনী সুধা আছে।

হায় মা! একি অপরূপ রূপ।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রসাদপুর জমীদার-ভবনে একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বৃদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইল। পাছে জমীদার গৃহিণীর সহিত দেখা হয়, এজন্য বৃদ্ধা পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি হটাৎ উভয়ের সাক্ষাৎ হইল।

বৃদ্ধার পিত্রালয় এই গ্রামেই ছিল, এজন্য সে অনেকের পরিচিতা। প্রথম বয়সে ইহার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে লোকে নানা কথা বলিত, তারপর যখন তাহার যৌবননদীতে ভাঁটা পড়িল, তখন এই ধর্ম্মহীনা পাপিষ্ঠা অন্য লোকের অসৎ কার্য্যের সহায়তা করিত। এখন এই বৃদ্ধবয়সে ততটা বাড়াবাড়ি নাই, একটু লৌকিক ধর্ম্মের ভাণও আসিয়াছে, সুতরাং সে এখন ভোল ফিরাইতে পারিয়াছে। তবে জমীদার নাকি বিশেষ অনুগ্রহ করেন, পালে পার্ব্বণে বৃদ্ধার বেশ আর্থিক লাভ হয়, এজন্য তাঁহার উপকার করিতে বৃদ্ধা সম্মত হইয়াছিল।

জমিদারগৃহিণী বৃদ্ধাকে বিশেষরূপে চিনিতেন। তিনি তাহাকে দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন, প্রথমে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, পরে বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ঠাকুর ঝি! এতদিন পরে এখানে কেন? ব্যবসা চলে কেমন? কার সর্ব্বনাশের জন্য আজ এখানে শুভাগমন হয়েছে?"

বৃদ্ধা যেন গায়ে মাখিল না। হাসিয়া উত্তর করিল—"বৌ! আজিও তুমি তামাসা করিবে? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, বৈতরণীর তীরে আসিয়া দাড়াইয়াছি, এখন হরি পার করিলেই বাঁচি!"

বৌ। তুমি ধনী লোক, ধর্ম্মের মাথায় চাপিয়া আছ, নিজের জোরেই পার হবে। হরি দীন দুঃখীর বন্ধু, যার কেহ নাই—কোন সম্বল নাই, হরি তারই কাছে যান!

বৃদ্ধা। ঠিক বলেছিস বৌ! এই রকম কথা আরও একজন বলে। সেই

আমাদের গাঁয়ে যে ব্রাহ্মণ ছিল, দেনার দায়ে সর্ব্বস্ব গেল, ভিটা ছেড়ে আমার শ্বশুর বাড়ীর দেশে গিয়ে বাস করলে, তুমি ত তাদের চিন্‌তে? —

বৌ। হাঁ বুঝেছি। সে দুঃখিনীর ত কপাল পুড়েছে। এখন তাঁর কিরূপ অবস্থা?

বৃদ্ধা। অবস্থা ভাল নহে, তবে মাগীটার বড় দর্প, দুঃখে পড়েও কিছুতে নরম হয় না।

বৌ। না—না—এমন কথা বলো না। আমি যে তাঁকে খুব ভাল বলেই জানি। দর্প করিবার সে লোক নহে, আর এখন কিসেরই বা দর্প করিবে?

বৃদ্ধ মুখ নামাইয়া, একবার চারিদিক চাহিয়া বলিল,—"রূপের দর্প।"

বৌ নীরব হইয়া কি ভাবিল, পরে বলিল,—"না, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর মত আমি তাঁকে ভালবাসিতাম। আহা, যখন বাড়ী ঘর সব গেল, একখানি কুটীর বেঁধে থাকবার জন্য আমার পায়ে ধরিয়া কত কেঁদেছিল, আমি তাঁর কিছুই করিতে পারি নাই। সে জলভরা চোখ দুটী এখনও আমার চোখের উপর ভাসিতেছে। আমি সীতা সাবিত্রীর কথা পুরাণে পড়িয়াছি, যদি চক্ষে দেখিয়া থাকি তবে তিনিই সে দেবী।

তাঁহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল, অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া তিনি নীরব হইলেন।

বৃদ্ধা। সে আর তোমার অপরাধ কি ভাই? দেনার দায়ে এমন কত লোক পথে বসিয়াছে। তা কেহ কিছু যদি সাহায্য করে, মাগীটা তেজ করিয়া তাহা লয়না। না খেয়ে উপোস করে মরবে সেও ভাল, তবু—

বৌ। যে কিছু দিতে চায়, সে কি বিনা স্বার্থে দিতে চাহে?

বৃদ্ধা হাসিয়া বলিল,—"বৌ! তোকে যে লোকে ভগবতী বলে, তা ঠিক। তুই অন্তর্যামিনী। লোকে বিনা স্বার্থে দেয়—এমন ত শুনি নাই।

বৌ। তবেই দেখ, সে যে লয়না ভালই করে। আমিও কিছু পাঠিয়েছিলাম, তা সে লয় নাই।

বৃদ্ধা যেন অবাক্ হইয়া গেল। বলিল,—দেখ, আমি তার জন্য মরি, সে কিন্তু একটীবার একথা আমার কাছে বলে নাই। তা—তোমার টাকা লইল না কেন?"

বৌ। আমি বলিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাই সে কাহাকে বলে নাই। আমার টাকা লয় নাই—সে অনেক কথা!

বৃদ্ধা নাকে হাত দিয়া অধিকতর অবাক হইয়া বলিল,—"এর ভিতর এত

ছিল, আমি ত তার কিছু জানি নাই। তা হবে, এখন ঘোষালদের বাড়ীতে রাঁধুনী হয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন।"

বৌ ক্রমশঃ সমস্তই অবগত হইলেন। এতদূর হীন অবস্থা হইয়াছে জানিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন। তিনি স্বামীর অন্যায় অত্যাচারের কথা সমস্তই অবগত ছিলেন। যতই ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার অন্তর অনুতাপে জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার স্বামীর অন্যায় আচরণে তাঁহার কোন সহায়তা ছিল না, তথাপি তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনিও সেই কার্য্যের জন্য দায়ী। তাই তাঁহার অন্তরের অন্তরে বড় দারুণ জ্বালা লাগিল।

স্বামীর দুর্ব্যবহার তিনি নীরবে সহিয়া আসিয়াছেন। একমাত্র বংশের দুলাল, তাঁহার নয়নানন্দ পুত্ররত্ন যৌবনেই গৃহসুখে উদাসীন, দেশে বিদেশে, তীর্থে তীর্থে, সাধু সন্ন্যাসীর সাহচর্য্যে তিনি দিন অতিবাহিত করেন। মাতার চক্ষে জল দেখিয়া, মাত্র একদিন তিনি বলিয়াছিলেন,—"মা, আর বেশী দিন তোমাকে কাঁদিতে হবে না। পাপের একটা সীমা আছে, আমরা সেই শেষ সীমায় আসিয়াছি, এখন আর অধিক বিলম্ব নাই। আমাদের এ সোণার চূড়ায় শীঘ্রই বজ্রপাত হবে, নূতন জীবনে আমরা আবার বাঁচিয়া উঠিব।" পুত্রের সেই কথা আজ মনে হইল! বৃদ্ধা অবসর বুঝিয়া, বৌকে জ্বালাইবার জন্যও বটে আর কথা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়াও বলিল,—"তোমার কাছে কথা লুকাইতে পারি না বোন্, দাদাবাবু ও মাগীটার নেশায় মজেছেন। অনেক টাকা ঢেলেছেন, তা সত্যি মিথ্যা কে জানে!"

শত অত্যাচার-পীড়িতা, পদদলিতা সাহষ্ণু-প্রতিমা সতী এবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন! সে ভয়ঙ্করীমূর্ত্তি তাঁহার আর কেহ কখন দেখে নাই! বৃদ্ধা অবাক হইয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল!

এই অবসরে জমীদারবাবু সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। মদিরা-নেশায় তিনি উন্মত্তপ্রায় ছিলেন, তিনি বৃদ্ধাকে দেখিয়াই বলিলেন—"কি সুপ্রভাত আজ! আমার আশা বুঝি ফলবতী—নহিলে তুমি সশরীরে এখানে কেন?"

বৃদ্ধা চক্ষু টিপিতে লাগিল, জমীদার সে ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল না, পুনরপি বলিল,—"এতটা টাকা ঢালিলাম, সবই বুঝি আত্মসাৎ করেছ? হাঁ—কি না একটা উত্তর চাই, নহিলে তোমার মাথাটা আজ দেয়ালে ঠুকিয়া গুঁড়াইয়া দিব।"

বৌ আর নীরব থাকিতে পারিল না। সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। আরক্তিম চক্ষে বলিল,—"ঠাকুর ঝি! এই দূতীগিরি তোমার? এই সংবাদ দিতে

এসেছিলে? এই তোমার বৈতরণীর তীর? দূরহ' মাগী—কে আছিস, এখনি এ পাপ আমার সম্মুখ হইতে তাড়াইয়া দে!"

আজ্ঞামাত্র দুই দাসী আসিয়া বৃদ্ধাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। জমীদারের যেন হুঁস হইল, গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "একি তুমি? যাহার মুখে কখন একটী কথা ফুটে নাই, একি সেই তুমি?"

কুপিতা গৃহিণী গ্রীবা বাঁকাইয়া, পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"ছিঃ, তুমি এতদূর অধঃপাতে গিয়াছ!"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জমীদার গৃহিণী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি একান্ত কুপিতা হইয়া বলিলেন, "ছিঃ, তুমি এতদর অধঃপাতে গিয়াছ! তুমি ঐ রমণীকে, তাহার বাল্যকাল হইতে দেখিতেছ—উহার রূপ তোমার অবিদিত নাই! আমি উহাকে নিজের ভগিনীর মত ভালবাসিতাম। তুমি উহার রূপ ও গুণের পরিচয় পাইয়া একদিন বলিয়াছিলে, "গোপালের সহিত যদি মানাইত, ঐ বালিকাকে তুমি পুত্রবধূ করিতে। যাহার প্রতি কন্যার ভাব আসা উচিত, তাহাকে সংসারে অসহায়া অনাথিনী জানিয়া, তোমার এতই নীচভাব! কিন্তু ধর্ম্মে সহিবে না, উহাদের প্রতি অনেক অন্যায় ব্যবহার, আমরা এতকাল করিয়া আসিয়াছি, পাপের ভরা এইবার ডুবিবে।"

জমীদার এতটা কথায় কাণ দিলেন না, সে ইচ্ছাও ছিল না, সে শক্তিও ছিল না। তিনি ধর্ম্মের কথায় জ্বলিয়া উঠিলেন, গৃহিণীকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া বলিলেন,—"এতদিন নীরবে সহিয়া আসিয়াছ, এখন এই বুড়া বয়সে সপত্নীর হিংসা জাগিল! আমাকে ধর্ম্মের ভয় দেখাইও না, ধর্ম্ম নির্ব্বোধ কাপুরুষের অবলম্বন!"

গৃহিণী। ভগবান এতটা কখনই সহিবেন না। আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, তোমার শতসহস্র অত্যাচার আমি নীরবে সহিতে পারি। কিন্তু দেখিলাম, এতটা সহিয়া ভুল করিয়াছি। যদি এতটা না সহিতাম, বুঝি এত পাপ তোমাকে স্পর্শ করিত না। কিন্তু ধর্ম্ম, মান' না মান', ধর্ম্ম আছেন, দেবতা আছেন; এ পাপের দণ্ডও আছে। সত্যই সংসার দানবের রচনা নহে,—এই মহাপাপ শীঘ্রই আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে! সতী চক্ষের জল ফেলিয়া, স্বামী পুত্রের হাত

ধরিয়া, তোমার দেনার দায়ে সর্ব্বস্ব ফেলিয়া, কুটীরবাসিনী। এখন স্বামী পুত্র হারাইয়া, দুইমুঠা অন্নের জন্য পরগৃহে দাসীবৃত্তি করিতেছে, তার উপর এই পাপদৃষ্টি! ভগবান কি এত সহিবেন?

গৃহিণীর চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, কিন্তু সে অশ্রুরাশি তাঁহার ক্রোধোদ্দীপ্ত হৃদয়কে শান্ত করিতে পারিল না। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"এখনও বুঝিয়া দেখ, তোমার কার্য্যের পরিণাম কি! সতীপ্রতিমা সীতাদেবীর প্রতি অবমাননা করিয়া, যেমন দুর্জ্জয় রাবণও সবংশে মরিয়াছে! আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, আমাদের সহস্র সহস্র পাপের ফলে এ সোণার সংসার ছারখার হইবে—বুঝি সে দিনেরও আর বিলম্ব নাই!"

জমীদার নেশায় উন্মত্তপ্রায়, গৃহিণীর পুনঃ পুনঃ এইরূপ তিরস্কার বাক্যে তিনি ধৈর্য্যহীন হইলেন। তিনি অনায়াসে দাসীগণের সমক্ষে গৃহিণীকে পদাঘাত করিলেন, এবং অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া বলিলেন, "সয়তানী এতদিন পরে পাগল হইয়াছে, উহাকে লোহার শিকলে বাঁধিতে হইবে।"

গৃহিণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে দাসীরা জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, কোথাও কি আঘাত পেয়েছ?"

"কিসের আঘাত?"

"বাবু তোমায় ফেলিয়া দিলেন?"

"আমার মনে পড়ে না, বোধ হয় নিজেই পড়িয়া গিয়া থাকিব। তিনি এখন কোথায়?"

"তিনি ঘুমাইতেছেন।"

গৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"তাঁহার যে এখনও আহার হয় নাই।"

(ক্রমশঃ)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

শৈশবে শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৪ পৃষ্ঠার পর)

অনেকে শৈশবকাল হইতে ক্রূরমূর্ত্তি ধারণ করতঃ শাসনচ্ছলে সুকোমলাঙ্গ শিশুর গায়ে চপেটাঘাত করিতে বা বেত্রাঘাত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। আমরা ইঁহাদিগকে সুবুদ্ধি হীন বলিয়া মনে করি। যে ব্যক্তি

পরিবার বা ব্যক্তি, যতই অসভ্য, সে ততই এই ক্রুবশাসনে অভ্যস্ত। ইহাতে শিশুর মন হইতে চিরকালের জন্য গুরুভক্তি, আত্মসম্মান এবং কোমলতাদি দূর করিয়া তৎপরিবর্তে বিপরীত ভাবসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয় এবং তাহার ভবিষ্যৎ জীবনকে নষ্ট করিয়া ফেলে। কবি বট্‌লার (Butler) যথার্থই বলিয়াছেন —"Spare the rod and Spoil the child" অর্থাৎ বেত্রচালন কর এবং শিশুকে নষ্ট করিয়া দাও। ইহার ভাব এই যে, শিশুর অঙ্গে বেত্র প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাহার ভবিষ্যজ্জীবনকে নষ্ট করিয়া ফেলি। আর একটা কথা, যে শিশু মধুর কথায় শাসিত না হইয়া প্রহারে শাসিত হইয়াছে, সে ঠিক জানে যে, অপরকে শাসন করিতে গেলে মধুর কথায় চলিবে না, ভীষণ প্রহারের সঞ্চালন প্রয়োজন। এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে তাহার সেই শৈশবাবস্থার শিক্ষাই বলবতী হয়। সুতরাং ক্রুর অভিভাবকের সন্তান অভিভাবকবৎ লোক সমাজের কণ্টকরূপে বর্ত্তমান থাকে। যিনি বলিবেন, মধুর কথায় শাসন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িলে বাধ্য হইয়া প্রহারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; আমরা তাঁহাকে উচ্চবংশের এবং ইংরাজ পরিবারের শিশুশাসন পদ্ধতি অনুকরণ করিতে অনুরোধ করি। ক্রুর অভিভাবকগণ! ক্রুদ্ধ হইবেন না—বলি "Example is better than precept" উদাহরণই উপদেশ অপেক্ষা সমধিক কার্য্যকারী। আপনারা নিজে যেমনটি দেখাইবেন, অনুকরণ প্রিয় মানবমঞ্জরী শিশু তাহাই অনুকরণ করিবে, সুতরাং নিজেকে ভাল করাই শিশু সন্তানের উন্নতি বিধানের অদ্বিতীয় উপায়। এই হ'ল কাজের কথা। আমরা বাজে কথা লইয়া বড় বড় শ্লোকরাশিতে প্রবন্ধ অলঙ্কৃত করিব, ভগবান যেন এ বুদ্ধি কখনও না দেন। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, শিশুকে শাসনে আনিবার প্রকৃষ্ট প্রন্থা নিজের সাধুচরিত্র গঠনে এবং মধুর সম্ভাষণে অভ্যস্ত হওয়া।

পিতা মাতা বা অভিভাবকের প্রত্যেক আচারে ব্যবহারে যে শিশুর চরিত্র-ভিত্তি স্থাপিত হয়, তাহা সুধীমাত্রেরই বোধগম্য। অনেকস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—ছেলে আসিয়া বলিল "মা, মা, আমাকে সুশীল মেরেছে, এই দেখ আঁচড়িয়ে দিয়েছে—অঁ্যা—অঁ্যা।" অমনি বাড়ীর ঝি হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলের মা পর্য্যন্ত নানা বচসা করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং মা ছেলেকে কোলে ধরিয়া মুখচুম্বন করিয়া তাহার সাথী সুশীলকে অশ্লীলবাক্যে গালাগালি করিতে লাগিলেন। বড়ই আক্ষেপে বলিতে লাগিলেন "সুশীল বড়ই দুষ্ট,

দেখদেখি ছেলে আমার কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গিয়েছে, এমন মড়াপোড়া ছেলেও দেখি নাই!" বলি—হে পরদোষদর্শী মানব। তুমি একবারও ভাবিয়া দেখিলে না যে, তোমার ছেলে সুশীলের কি অনিষ্ট করিয়াছে? তুমি সুশীলকে মড়াপোড়া গালাগালি করিবার সময় একবারও অনুভব করিলেন না যে, তুমি তোমার ছেলেকে যেমন ভালবাস, সুশীলের মাতাও তাঁহার ছেলেকে তেমনি ভালবাসেন? তুমি নিজের ছেলের মুখচুম্বনে যেমনি পটু, সুশীলের মারও সে বিষয়ে তোমা অপেক্ষা কোনোগুণে ন্যূনতা নাই? এবং যদি সুশীলের মাতা তোমার কর্কশবাণী শ্রবণ করিত, তবে তাঁহার মাতৃজনোচিত কোমল প্রাণ বিদীর্ণ হইত না কি? তিনি তোমার পদতলে জীবন প্রতিদান প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমাকে বকুনি হইতে শান্ত করিতেন না কি? এ তো গেল এক দিক। অন্যদিগকেও তোমার বিবেচনাশক্তি ব্যবহারে যে কিরূপ তমসাচ্ছন্ন করিলে তাহার একবার খোঁজ রাখ কি? তুমি যতক্ষণ ধরিয়া গালাগালি করিতেছিলে, অনুকরণপ্রিয় শিশু তোমার মুখপানে তাকাইয়া তাকাইয়া তোমার মুখভঙ্গী অবলোকন করিতেছিল এবং পরকে দোষ-গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া নিজে কি প্রকার অব্যাহতি লাভ করিতে হয়, তাহার সুন্দর নিদর্শন প্রাপ্ত হইল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তুমি সুশীলকে গালি দিয়া, প্রথমতঃ নিজের মুখ এবং মনকে কলঙ্কিত করিলে, নিজের ছেলেকে পরদোষান্বেষিতা শিক্ষা দিলে, ক্রোধের সময় কিরূপ অঙ্গ-ভঙ্গি করিতে হয় তাহা শিখাইয়া দিলে, সুশীলের মধ্যে এবং তোমার ছেলের মধ্যে বিবাদবীজ রোপণ করিলে এবং সুশীলের নির্দ্দোষ পিতামাতার মনে বৃথা গুরুতর আঘাত করিলে। এ আঘাতের স্থল যে সে তোমাকে দেখাইতে পারে—এ সাধ্য তার নাই, কিন্তু অন্তর্য্যামী তাহা দেখিয়া, তাহা জানিয়া তোমার ক্ষিপ্রকারিতার ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তাই বলি, যদি শিশুকে সৎপথে চালাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে পিতামাতার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে আপন ছেলের দোষ তাহাকে দেখাইয়া দিবেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ কলহ না হয়, তাহার জন্য বহুবিধ প্রয়াস পাইবেন। শৈশবকাল হইতে শিশুকে আত্মদৌর্ব্বল্যদর্শী যতই করিতে পারা যায়, সেই পরিমাণে তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। শিশু-চারাটিকে এইরূপ অবিরত যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিলে তবে যুবক-বৃক্ষ হইতে মধুময় ফল প্রত্যাশা করিতে পারা যায়, অন্যথা সকলই বিড়ম্বনা!

পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ যখন ভগবৎ প্রার্থনা করিতে যাইবেন,

তখন শিশুটিকে সঙ্গে লইতে পারেন। তাহা হইলে শৈশবকাল হইতে তাহার মনে একটী সুন্দর ছায়া পড়িয়া যায় এবং কালে সে ভক্তিমান্ হইয়া দাঁড়ায়। আমরা দেখিয়াছি, একটী শিশু প্রায়ই তাহার পিতা এবং খুল্লতাতগণের দেব-পূজার সময় অনিমেষ নয়নে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের দিকে তাকাইয়া থাকিত। তাঁহাদের পূজাদি সমাপ্ত হইয়া গেলে সে যে কোনো উপায়ে একটী ঠাকুর যোগাড় করিয়া পুষ্পপত্রে তাঁহার অর্চ্চনা করিত। সে ছেলেটিকে তাহার কাকা শিখাইয়া দিয়াছিলেন, বলিবে "হে প্রভো, আমায় সুধু ভক্তি দাও।" শিশুও বলিত 'হে প্রভো (এই 'প্রভো' ডাকটি তাহার মুখ হইতে এরূপ ভাবে উচ্চারিত হইত যে, পার্শ্বস্থ লোক মনে করিতেন, শিশুটি ঠিক যেন ভগবানকে সাক্ষাৎ করিয়া 'ভক্তি দাও' বলিয়া তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিতেছে। বাস্তবিক এ 'প্রভো' ডাক যারপরনাই শ্রুতিমধুর হইত) আমায় ভক্তি দাও।' শিশুটির সে বলিবার ছটা যে কেহ প্রত্যক্ষ করিত, সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। এখনও সে ছেলেটি বর্ত্তমান। যদি বাঁচিয়া থাকি এবং সে ছেলেটি যদি অনুকূল অবস্থায় থাকিতে পারে, তবেই তার পরিণাম জানিবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিব। কথায় বলে 'যার বাপ চড়ে ঘোড়া, তা'র বেটা থোড়া থোড়া।' আমরা বলি যদি কোনো সুধী আশৈশব তাঁহার ছেলের সমুচিত যত্ন লয়েন, তবে 'বাপ্ সে বেটা জিয়াদা'ও দেখিতে পারিবেন। আমি কোনও অধ্যাপককে জানি। তিনি তাঁহার শিশুসন্তানগণের প্রাণের প্রাণ বলিলেও চলে। সুতরাং তিনি যেখানেই বেড়াইতে যা'ন, সন্তানগুলিকে কোলে পিঠে লইয়া যা'ন। অধ্যাপকটি বিদ্যায় এবং নৈতিক চরিত্রে বলবান্ ও গম্ভীরাত্মা। তাঁহার ছেলেগুলিতেও সেই সেই সদ্‌গুণের এমন একটী সুন্দর ছায়া পড়িয়া আছে যে, তাহাদের মধ্যে কেহ বর্ত্তমান বাল্যাবস্থা, কেহ শৈশবাবস্থায় পদার্পণ করিলেও, সেই ছায়ার মনোহারিণী কার্য্যকুশলতা সকলকেই মুগ্ধ করিয়া তুলিতেছে! তাঁহার বড় ছেলেটির বয়ঃক্রম প্রায় দশ কি একাদশ বৎসর, তাহার ইংরাজী ভাষায় বাক্যালাপের স্ফূর্ত্তি, তাহার গাম্ভীর্য্য-বিজড়িত রীতিনীতি এবং তাহার ভয়শূন্যতা দেখিয়া, পিতার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র বিচরণ করার একটা মধুময় পরিণাম দেখিতে পাই। অধ্যাপক মহাশয় আধুনিক জনকগণের মত সন্তানগণের নিকট শার্দ্দুলপ্রতিম ভীষণ নহেন, তিনি তাহাদের পরমবন্ধু, এমন কি প্রাপ্তবয়স্ক পকধী অধ্যাপক মহোদয় তাহাদের সঙ্গে টেনিস খেলিতে সামান্যমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি,

'By Heaven's grace, we can make our little homes so many paradises' অর্থাৎ ভগবৎ কৃপায় আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহকে স্বর্গীয় ভবনে পরিণত করিতে পারি। অধ্যাপক মহোদয় ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াও সংসারের সহিত পবিত্র প্রণয়ে আবদ্ধ। তাই যখনই তিনি কলেজে আমাদিগকে Wordsworthএর পদ্যাবলী পড়াইতেন, নিম্নলিখিত কয়টি পংক্তির উপর তিনি বড়ই ঝোঁক দিতেন—

"So didst thou travel on life's common way,
"In cheerful Godliness; and yet thy heart
"The lowliest duties on herself did say."

(*London, 1802.*)

"Type of the wise who soar, but never roam;
"True to the kindred points of heaven and home."

(*To a Skylark.*)

উপরোক্ত পংক্তি কতিপয়ের নিগলিতার্থ এই যে, সেই ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞানী, যিনি পরমার্থ-তত্ত্বসমূহ আলোচনা করিয়াও সাংসারিক বিষয়ে কিছুমাত্র অনাস্থাবান্ নহেন। কেবল অসীম সহিষ্ণু এবং সাহসী ব্যক্তিগণই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আমাদের এত বলার উদ্দেশ্য এই যে, সকল জনকগণ যেন এই চরিত্রের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, এই বিষম সংসারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েন। ইহাতে তাঁহারা সপরিবারে যৎকিঞ্চিৎ বিমলানন্দ উপভোগের আশা করিতে পারেন। অতএব কি প্রার্থনা করিবার সময় (দুর্ব্বল মনের পক্ষে বিধেয় নহে,) কি বিচরণ করিবার সময়, কি সভাসমিতিতে যোগদান করিবার সময়, সমর্থপক্ষে সর্ব্বক্ষেত্রে অভিভাবকগণ সন্তানগণকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিবেন, ইহা আমাদের সবিশেষ প্রার্থনা।

অনেক সময়ে শিশুর ক্রন্দনজনিত বিরক্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জননী সম্মুখে যে কোনো খাদ্য পান, তাহা ছেলের হাতে ধরাইয়া দিয়া তাহার ক্রন্দনের নিবৃত্তি সম্পাদন করেন। দুঃখের বিষয়, একটুও বিচার করিয়া দেখেন না যে, সে খাদ্য শিশুর জীর্ণশক্তির সাধ্য কি অসাধ্য? ইহাতে শিশুগণ সময়ে সময়ে উৎকট পীড়ার কবলে পড়িয়া থাকে এবং জননী একটু বিরক্তির হস্ত এড়াইতে গিয়া বহুল বিরক্তির করগত হইয়া পড়েন। বড়ই পরিতাপের বিষয় অনেক দায়িত্বজ্ঞান লেশমাত্রশূন্য অভিভাবক

শিশুর মুখে মৎস্য মাংস পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। তাহাতে কখনও তাহাদের অজীর্ণ এবং কখনও অন্যান্য ব্যাধির উদ্রেক হইয়া থাকে। একদিন দেখিয়াছিলাম, একটী অভিভাবক তদীয় একটী শিশুকে আহারের সময় নিকটে বসাইয়া তাহাকে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য খাইবার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন। শিশু মৎস্য খাইতে খাইতে গলায় কাটা লাগিয়া যে কি কষ্ট পাইতে লাগিল—লেখনী-সাহায্যে তাহা বর্ণন করা দুরূহ। শিশুর মঙ্গলের জন্য যে কত বিষয়ে দৃক্‌পাত করিতে হয়, যিনি প্রকৃত তদ্বিতেব্রতী, তিনিই অনুভব করিতে পারিবেন। সামান্য সামান্য বিষয়ে অবহেলা করিলে শিশুর যে কি মহান্ ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই স্থানে আমাদের সবিনয় অনুরোধ যে রাক্ষসোচিত খাদ্য, দেবলোকাগত শিশুর হস্তে দিয়া কেহ যেন ভগবানের নিয়ম লঙ্ঘন না করেন এবং ভগবানের নিকট দায়িত্বহীনতার জন্য দোষী না হয়েন।

এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, পিতামাতার চরিত্রের উপরই শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। হে জনক জননি! সন্তান উৎপাদনকরিয়াই কি তোমরা দায়িত্বশূন্য হইয়াছ? এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যদি তাহাতে মনুষ্যত্ব জাগাইতে না পার, তবে তোমাদের 'পিতা মাতা' নাম একটা শূন্য নাম মাত্র নহে কি? আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া, সুদীর্ঘকালাভ্যস্ত নিদ্রা-বিজড়িত নয়নযুগল বিন্যস্ত করিয়া একবার জাপানের দিকে, না হয় আমেরিকার দিকে, না হয় ইংলণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত কর। দেখিবে, তাহারা নামমাত্রে উচ্চ জাতি বলিয়া অভিহিত নহে। তাহাদের মধ্যে সারগর্ভতা বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান। তাহারা শিশুর যেরূপ ভাবে যত্ন লয়, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই মনে হয় যে, ইহারাই লোকপালক হওয়ার উপযুক্ত পাত্র। ভারত! বকাবকি ছাড়িতে হইবে। কার্য্যে দেখাইতে হইবে যে তুমি সেই পূত আর্য্যগণের বংশধর। আর কত দিন ধরিয়া পুরাতন আর্য্যমুনিগণের মর্য্যাদার ঘৃত হস্তে লেপন করিয়া আঘ্রাণ করিতে থাকিবে? এইবার তোমাদিগকেও কিছু ঘৃত উৎপন্ন করিতে হইবে। দেখাইতে হইবে যে, সেই আর্য্যগণের রক্ত তোমাদের সাষ্টাঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। শুনিয়াছি, জনৈক মদ্যপায়ী পিতামহ, কার্য্যে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে তাহার বিশেষ আদরের আড়াই বৎসর বয়স্ক শিশু পৌত্র, তাহার মদের বোতল হস্তে লইয়া পানোদ্যত! পিতামহকে যেরূপ দেখিয়াছে, তাহাই শিখিয়াছে। ভগবান এমন সময়ে পিতামহকে উপস্থিত করাইয়া দেন। কি ভয়ঙ্কর কথা

একদিন দেখিলাম, একটি ছেলে কাশিতে কাশিতে অস্থির হইয়া পড়িতেছে। তথায় যাইয়া দেখি, ছেলেটির হাতে একটি চুরুট! পিতা চুরুট খান, তাই ছেলেও আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ছেলেটির এত কষ্ট দেখিলেন, কিন্তু পিতা মহাশয় কোথায় দুঃখিত হইয়া যাবজ্জীবনের মত চুরুট পান ত্যাগ করিবেন, তৎপরিবর্ত্তে নির্লজ্জ হাস্যপরিপূর্ণ মুখে ছেলেকে বলিতেছেন "আরে দুষ্ট, তুমি আবার চুরুট খেতে শিখেছ?" ছেলে হাস্যপূর্ণ মুখের কথা শুনিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় মধ্যে যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি তাহার মুখকে বিকৃত করিয়া দিলেন—সে বুঝিতে পারিল যে, সে অন্যায় করিয়াছে। কিন্তু পিতা আবার ছেলের মুখ চুম্বন করিয়া আবদার দিয়া বলিতেছেন—"না, না, তোমায় আবার কে গাল দেবে? আমার সোনার চাঁদ—না তোমায় কেউ কিছু বলবে না।" এ সব দেখিয়া শুনিয়া হাসিও পায়, কান্নাও পায়। যাই হোক, যদি সুপুত্র মুখ দর্শন ইচ্ছা থাকে, তবে, হে জনক জননিগণ, আপনাদিগকে প্রথমে সৎ হইতে হইবে। ময়ূরভঞ্জের একটি সবডিভিসন্ বারিপদায় এবার গিয়া এক ভদ্রলোকের বাটীতে ছিলাম। তিনি উৎকলীয়। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার ছেলেগুলির আচার ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ছিলাম। অতঃপর যখন সেই ভদ্র লোকটীর সহিত সাক্ষাৎ করি, দেখিলাম, মাদক দ্রব্যের হস্ত হইতে বঞ্চিত সেই যুবকের নৈতিক বল শিশুসন্তানগণের উপর সম্পূর্ণ-রূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। শত সহস্র শিক্ষকে যাহা করিতে পারে না, পিতামাতার আচার ব্যবহার তদপেক্ষা বহুগুণে কার্য্য করিয়া থাকে। এ সব জানিয়া শুনিয়াও অনেক পিতামাতা যথেচ্ছভাবে কার্য্য করিয়া কেন পাপাচরণ করেন জানিনা।

আমাদের কোনো অধ্যাপক নীতিশাস্ত্র (Ethics) পড়াইতে পড়াইতে একদিন বলিয়াছিলেন 'Superiority consists not in age, Stature or weight of the body, but in the amount of Self-sacrifice and moral character.' অর্থাৎ বয়স, উচ্চতা বা শরীরের গুরুত্বের উৎকর্ষতা নাই, ইহা আছে, কেবল ত্যাগস্বীকার এবং নৈতিক চরিত্রে। আমরা প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি উপরোক্ত সত্যের সারবত্তা দেখিয়াও চক্ষুহীনের মত কার্য্য করিতেছি। দেখিয়াছি, অনেকে দশরথপ্রাপ্ত পুত্র স্নেহের, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ প্রাপ্ত ভ্রাতৃ স্নেহের এবং সীতা সাবিত্রী প্রাপ্ত পতিভক্তির অধিকারী হইতে লালসান্বিত, কিন্তু তাঁহা-দিগের মত চরিত্রবান্ হইতে এবং অদ্ভুত ত্যাগস্বীকার মন্ত্রে আপনাকে দীক্ষিত

করিতে কয়জন অগ্রসর? সেই নৈতিকচরিত্রে নীতিবান্ হইয়া কয়জন আপন দারা ও সহোদরের বর্জ্জন অকাতরে সহ্য করিতে সমর্থ? বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকে অভিভাবক হইতে অগ্রসর; কিন্তু তদীয় দায়িত্ব সকল মস্তকে লইতে পশ্চাৎপদ! এই কথা যেন সকলের মনে থাকে যে, ভয়প্রদর্শনাদি পাশবশক্তি (brutal force) দ্বারা কখনো কাহাকে, এমন কি পশু পর্য্যন্তকেও যথার্থভাবে বশীভূত করিতে পারা যায় না। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—"It is better to be loved than to be feared." ইহার মর্ম্ম এই যে, কেবল প্রেম এবং স্বার্থত্যাগেই সকলে বশীভূত হইয়া থাকে। অতএব সুধীবর্গকে আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যেন এই দুইটীর (স্বার্থত্যাগ এবং নৈতিক চরিত্র) উপর যথাসাধ্য যত্নবান হয়েন। তবেই শিশুর প্রাণ স্বর্গময় হইয়া যাইবে। তাঁহারা নিজেও অপার আনন্দ অনুভব করিবেন।

শিশুর পাঠ্য কোথায়? পুস্তকে সন্নিবেশিত বিষয় সকল তাহার পাঠ্য নহে। তবে তাহার পাঠ্য কি? এই কবিজনমনোহারিণী, অতুল ঐশ্বর্য্য-সম্পন্না, নিত্য নিত্য নবরাগরঞ্জিতা, চারুশীলা প্রকৃতিই শিশুর পাঠ্য। আমি জ্যোৎস্না রাত্রিতে একটী শিশুকে কোলে লইয়া, তাহাকে কতই যে আনন্দ দিই এবং নিজেই বা কত আনন্দ পাই, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। একটী শিশুকে একদিন কোলে করিয়া জ্যোৎস্না-বিস্ফুরিত প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়াছি—সেদিন পূর্ণচন্দ্র নভোমণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। সুনির্ম্মল-প্রাণ সাধুর মনের উপর যেমন সাময়িক দুঃশ্চিন্তা যাতায়াত করে, সেদিন পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলোপরি পয়োদমালা খণ্ডশঃ গতি করিতেছিল। আমি শিশুর মুখপানে নিরন্তর তাকাইতেছিলাম। যখন পয়োদখণ্ড নিশামণিকে আবৃত করে, শিশুর মুখচন্দ্র তখন মলিন পড়িয়া যায়। কতিপয়বার এইরূপ মনো-মালিন্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'খোকা! কি হয়েছে'? খোকা মৃদু মৃদু অর্দ্ধস্ফুটভাবে উত্তর করিল 'চাঁদ লুকিয়ে গেল'। আবার যেই পয়োদখণ্ডের তিরোধান হয়, শিশুর বদনচন্দ্রমাও তৎসঙ্গে প্রফুল্লিত হয়। তখনই বলিয়া উঠে "এই দেখেছ চাঁদ!' তখন উহাকে বলিয়া দিলাম, মেঘে চাঁদকে এমনি লুকাইয়া ফেলে, আবার ছাড়িয়া যায়। শিশু তখন সেই কথাটী শিখিল এবং বোধ হয় যাবজ্জীবন তাহা ভুলিতে পারিবে না। এইরূপে বৃষ্টি হইবার সময় শিশুকে শিক্ষা দিবার অনেক সামগ্রী আছে। যখন শিলাবৃষ্টি পড়িতে থাকে এবং সকলে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাহরণ করিয়া মুখে ফেলিতে থাকেন, শিশুর

তখন আনন্দের সীমা থাকে না। এই সময় শিশুকে শুধু এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিতে হয় "বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন এমনি—শিলা পড়ে।" সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, শিশুকে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, —যাহাতে তাহার আনন্দের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এইবার আমরা শেষ কথা বলিয়া পাঠকপাঠিকার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিব। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শিশুগণকে যারপরনাই ভালবাসিতেন এবং তাহাদের সঙ্গে গল্প করিতে ভালবাসিতেন এবং সকলকে তাহাদের সহিত সঙ্গ করিতে আদেশ দিতেন, কেননা তাহারা শুদ্ধসত্ত্ব। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট বলিতেন—'Suffer little children to come unto me,' অর্থাৎ ছোট ছেলেদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও। এইস্থানে শিশুগতআত্মা জীবশুভাকাঙ্ক্ষী মহাত্মা ফ্রোবেলের নামোল্লেখ না করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে পারিলাম না। কি উপায়ে শিশুদিগকে প্রকৃতভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, সেই ভাবনায় তাঁহার কিণ্ডারগার্টেন (শিশু উদ্যান) শিক্ষা-প্রণালীর উদ্ভাবন। ভগবান আমাদের হস্তে সেই শিশুপালনরূপ এক গুরুভার দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা কয়জন সে দায়িত্ব বুঝি? মহাত্মা ফ্রোবেলরই সেই দায়িত্ব পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিয়াছিলেন—"Give me the first six years of a child's life, and I care not who has the rest" অর্থাৎ একটী শিশুর প্রথম ছয় বৎসর আমার হাতে দাও, তারপর তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ কাহার নিকট কাটিল, সেজন্য আমি তোয়াক্কা রাখিনা। একথা বলিবার সারমর্ম্ম এই যে, মানব জীবনের প্রথম ছয় বৎসরের (এই সময়কে আমরা শৈশবকাল বলিয়া ধরিয়াছি) মধ্যে যে ধারণা জন্মিয়া যায়, তাহা প্রায় চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। ঈশ্বর (God), প্রকৃতি (Nature), এবং মানবজাতির (Humanity) সহিত পরিচয় করিতে হইলে এই শৈশবাবস্থাই প্রশস্ত। যিনি তাহা করেন, তিনি প্রকৃত শিশুর আত্মীয়। তাঁহাকে আমরা মহাত্মা ফ্রোবেলের নিম্নলিখিত পংক্তি কতিপয় উপহার দিয়া বিশ্রাম লাভ করিব;—"Man is the image of God, his destiny is to become like Him. Man is atonce the child of humanity and the child of God, and the aim of education is to bring him while he is a child, into harmonious relations with all the three."

অর্থাৎ মানব ভগবানের প্রতিকৃতি। তাঁহারই মত হওয়া তাহার অদৃষ্ট।

মানব একাদিক্রমে প্রকৃতি, মানবজাতি এবং ভগবানের সন্তান। শৈশবাবস্থায় তাহার সঙ্গে এই তিনটীর মৈত্রীপূর্ণ সম্বন্ধ আনয়ন করাই শিক্ষাব উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

রামকৃষ্ণ-গুণ-কীর্ত্তন।

(১)

জয় রামকৃষ্ণ প্রভু অশেষ গুণসিন্ধু।
তব কৃপাবলে নরে লভিল জ্ঞানবিন্দু॥
তুমি (হে।) রামকৃষ্ণ হরি,
দীন কাঙ্গাল বেশ ধরি,
আসি ধরা'পরে কত নরে করিলে ত্রাণ।
কত নাস্তিকে মজায়ে দিলে (হে।) দিব্যজ্ঞান॥

(২)

কেশব, রামাদি জনে বিতরিলে করুণা।
দেশে দেশে বাজিল তোমার গুণের-বীণা॥
মধুর লীলারব শুনি,
মজিল কত শত প্রাণী,
লুটায়ে চরণে বিকা'ল প্রাণ পদতলে।
হইল বিরাগী, তব অনুরাগী সকলে॥

(৩)

ভকত-হৃদয় করি, গোপনে গোপনে চুরী।
মর্ত্ত্যে প্রেম বিলালে, কি খেলা খেলিলে হরি!
তব মূর্ত্তি জপিয়া ধ্যানে,
তরিল কত ভক্তজনে,
ধারা বহিল নয়নে, ভাবুক হৃদি মগ্ন।
তব নামে মোক্ষলাভ, থাকেনা কোন বিঘ্ন॥

(৪)

রামকৃষ্ণ নাম, জপরে ভাই অবিরাম।
শোক তাপ দূরে যাবে, পূরিবে মনস্কাম॥
কি দিব তাহার তুলনা,
অপার নামের মহিমা,
রামকৃষ্ণ দাসে কয়, তোমায় জেনেছি প্রভু।
যা'বল যা'কও, তুমি দেবের দেব তবু॥

(৫)

নামটীকে যে সার করেছে, ভয় আছে কি তার।
অবহেলে চলে যাবে, সে ভবনদী পার॥
কর হে জীবনে সম্বল,
নামটী, লোটাটি, কম্বল,
বিরলে বসি, দিবানিশি কর (তাঁর) আরাধন।
"জয় রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ" ডাকো সে হৃদি-রতন॥

সেবক—শ্রীমনোহরচন্দ্র বসু।

আবাহন।

ক্ষুব্ধ স্তব্ধ বাঙ্গলার আবাসে আবাসে
তব আবাহন,
পতিত লাঞ্ছিত শত, পুণ্যস্মৃতি স্মরি
আনন্দে মগন।
যে দিন জাহ্নবী কোলে তপোবন মাঝে
স্বর্গীয় সঙ্গীত—
উঠেছিল, তন্দ্রাসুপ্ত আছিল বাঙ্গালী
হারায়ে সম্বিত।
সে দিন চায়নি কেহ মুদ্রিত নয়নে,
ছিল গো শয়নে;
কামিনী কাঞ্চন মাঝে, সঁপি প্রাণ মন
মত্ত প্রলোভনে।

তার পর প্রতীচ্যের মুক্ত নভঃতলে
সেই পুণ্য গান,—
ছুটিল তাড়িৎ মন্ত্রে কাঁপায়ে ত্রিলোক
উদ্বোধিয়া প্রাণ।
সেই দিন সেই দিন নবীন উষায়
জাগিল সন্তান,
মোহের তন্দ্রায় তবু নিমিলিত আঁখি
দোদুল্যিত প্রাণ।
আজি দেব, জাগিয়াছে তোমার সন্তান
তোমার সেবক,
তোমার কাহিনী গায় রোমাঞ্চিত কায়ে
যুবক বালক।
(প্রভু) তোমার চরণ রেণু ধরিতে মস্তকে
শত কোটী প্রাণ ;
অপেক্ষায় আছে বসি, রচি মহাপীঠ
করিছে আহ্বান।
এস দেব, একবার আবাসে আবাসে
দানিতে অভয়।
একবার একবার জ্যোতির্ম্ময় রূপে
সে অমর কায়।
অশ্রুসিক্ত মহাপীঠে পাতিয়ে আসন
হোমাগ্নির পাশে
তোমার চরণ তরে কোটী কোটী প্রাণ
দরশন আশে।
উদ্ভাসিত কর আজি সেবক আলয়
চরণ প্রভায়,
সেবকের মুগ্ধ হৃদি, তৃপ্ত কর প্রভু
আনন্দ সুধায়।

অধম সেবক 'কালী'।

রথযাত্রা উৎসব।

গত ২৪শে ও ৩২শে আষাঢ়, রথযাত্রা উপলক্ষে যোগোদ্যানে আনন্দ উৎসব হইয়াছিল। নারিকেলডাঙ্গা ষষ্ঠীতলার বালক সেবকমণ্ডলী ঠাকুরের রথযাত্রা উৎসব করিয়া রথ যোগোদ্যানে লইয়া গিয়াছিলেন। নিম্নের গীতটী গাহিতে গাহিতে রথ টানা হইয়াছিল।

গীত।

হেররে নয়ন ভবি, রামকৃষ্ণ রথোপরে।
জনম হবে না নিতে, যাতনাময় জঠরে॥
জীবদুঃখ দুঃখহারী, নিরখি সহিতে নারি,
ত্যজিয়ে গোলোকপুরী জনম মানবোদরে।
আহা মরি কত ব্যথা সয়েছে জীবের তরে॥
ত্রিতাপ-তাপিত-জন, জুড়াতে জীবন প্রাণ,
চরণ শরণ লহ, নিমেষে কলুষ হরে।
অহেতুক কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু এসেছেরে॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

আগামী ১১ই ভাদ্র, ইংরাজী ২৭শে আগষ্ট, শনিবার, জন্মাষ্টমীর দিন, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইবে। তত্ত্বমঞ্জরীর পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা সাদরে এই উৎসবে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছি। সকল সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের নিকট সানুনয় প্রার্থনা, তাঁহারা যেন স্ব স্ব সম্প্রদায়ে উৎসবে যোগদান করিয়া ঠাকুরের নাম গানে উৎসবক্ষেত্র মুখরিত করেন। আলস্যের ও ঔদাসীন্যের বশবর্ত্তী হইয়া এমন শুভমুহূর্ত্ত কেহ অবহেলা করিবেন না, ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

ভাদ্র, সন ১৩১৭ সাল।

চতুর্দ্দশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।*

[শ্রীম—কথিত।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে, জন্মোৎসব দিবসে, বিজয়, কেদার, রাখাল, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

25th May, 1885

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[পঞ্চবটীমূলে ভক্তসঙ্গে।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতলায় পুরাতন বটবৃক্ষের চাতালের উপর বিজয়, কেদার, সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। কয়েকটী ভক্ত চাতালের উপর বসিয়া আছেন। অধিকাংশই চাতালের নীচে, চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া আছেন। বেলা ১টা হইবে।

ঠাকুরের জন্মদিন ফাল্গুনমাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। কিন্তু

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, আশ্বিন মাসের প্রথম হইতেই ১৩।২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে প্রকাশক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র গুপ্তের নিকট এবং সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে। মূল্য এক টাকা পাঁচ আনা।

তাঁহার হাতে অসুখ বলিয়া এতদিন জন্মোৎসব হয় নাই। এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। তাই আজ ভক্তেরা আনন্দ করিবেন। সহচরী কীর্ত্তনী গান গাইবে। সহচরী প্রবীণা হইয়াছে, কিন্তু প্রসিদ্ধ কার্ত্তনী।

আজ রবিবার ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। জ্যৈষ্ঠ শুক্ল প্রতিপদ।

মাষ্টার ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া পঞ্চবটীতে আসিয়া দেখেন যে, ভক্তেরা সহাস্যবদন—আনন্দে অবস্থান করিতেছেন। ঠাকুর বৃক্ষমূলে চাতালের উপর যে বসিয়া আছেন, তিনি দেখেন নাই। অথচ ঠাকুরের ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তিনি কোথায়? এই কথা শুনিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিলেন। হঠাৎ সম্মুখে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া মাষ্টার অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, ঠাকুরের বামদিকে কেদার (চাটুয্যে) এবং বিজয় (গোস্বামী) চাতালের উপর বসিয়া আছেন। ঠাকুর দক্ষিণাস্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাষ্টারের প্রতি)। দেখ কেমন দু'জনকে (কেদার ও বিজয়কে) মিলিয়ে দিয়েছি!

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মাধবীলতা আনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটীতে দ্বাদশাধিক বৎসর হইল রোপণ করিয়াছিলেন। আজ মাধবী বেশ বড় হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা উঠিয়া দুলিতেছে, নাচিতেছে—ঠাকুর আনন্দে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন—'বাঁদুরে ছানার ভাব! পড়লেও ছাড়ে না।'

সুরেন্দ্র চাতালের নীচে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর সস্নেহে তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি উপরে এসো না। এমনটা (অর্থাৎ পা মেলা) বেশ হবে।'

সুরেন্দ্র উপরে গিয়া বসিলেন। ভবনাথ জামা পরিয়া বসিয়াছেন দেখিয়া সুরেন্দ্র বলিতেছেন—কি হে, বিলাতে যাবে না কি?

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন—আমাদের বিলাত ঈশ্বরের কাছে।

ঠাকুর ভক্তদের সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি মাঝে মাঝে কাপড় ফেলে, আনন্দময় হয়ে বেড়াতাম। শম্ভু এক দিন বল্‌ছে, 'ওহে তুমি তাই নেংটো হয়ে বেড়াও!—বেশ আরাম!—আমি এক দিন দেখলাম।'

সুরেন্দ্র। আপীষ থেকে এসে জামা চাপকান খোলবার সময় বলি—মা তুমি কত বাঁধাই বেঁধেছ!

[সংসার, অষ্টপাশ ও তিন গুণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। অষ্টপাশ দিয়ে বন্ধন। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি-অভিমান, সঙ্কোচ,—এই সব।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—

গান— আমি ঐ খেদে খেদ করি শ্যামা,
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি (গো মা)। ইত্যাদি।
শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)
ঘুড়ি আশাবায়ুভরে উড়ে বাঁধা তাহে মায়া দড়ি। ইত্যাদি।

"মায়া দড়ি, কি না মাগ ছেলে।" 'বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা কর্কশা হয়েছে দড়ি'। "বিষয়—কামিনীকাঞ্চন।"

গান—ভবে আশা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম।
আশার আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম।
প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল,
(শেষে) কচে বারো পেয়ে মাগো, পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলাম।
ছ' দুই আট, ছ'চার দশ, কেউ নয় মা আমার বশ,
খেলাতে না পেলাম যশ, এবার বাজী ভোর হইল।

"পঞ্জুড়ী অর্থাৎ পঞ্চভূত। পঞ্জা ছক্কায় বন্দী হওয়া অর্থাৎ পঞ্চভূত ও ছয় রিপুর বশ হওয়া।"

"ছ তিন নয়ে ফাঁকি দিব"*। ছয়কে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ ছয় রিপুর বশ না হওয়া। তিনকে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ তিন গুণের অতীত হওয়া।

"সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণেতেই মানুষকে বশ করেছে। তিন ভাই; সত্ত্ব থাকলে রজঃকে ডাকতে পারে, রজঃ থাকলে তমঃকে ডাকতে পারে।

"তিন গুণই চোর। তমোগুণে বিনাশ করে, রজোগুণে বদ্ধ করে। সত্ত্ব গুণে বন্ধন খোলে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্য্যন্ত যেতে পারে না।

বিজয় (সহাস্যে)। সত্ত্বও চোর কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়।

ভবনাথ। বাঃ!—কি চমৎকার কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, এ খুব উঁচু কথা।

* একথাগুলি গানের একটী চরণে আছে, সেটি পাওয়া গেল না।

ভক্তেরা এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বন্ধনের কারণ কামিনীকাঞ্চন। কামিনীকাঞ্চনই সংসার। কামিনীকাঞ্চনই ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না।

[কামিনীকাঞ্চন আবরণ। 'মাগসুখত্যাগ জগৎসুখত্যাগ'।]

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের গামছা লইয়া সম্মুখ আবরণ করিলেন। আর বলিতেছেন—"আর আমায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ?—এই আবরণ! এই আবরণ গেলেই চিদানন্দ লাভ।

"দ্যাখো না,—যে মাগসুখ ত্যাগ করেছে, সে'ত জগৎসুখ ত্যাগ করেছে। ঈশ্বর তার অতি নিকট।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও কামিনী।]

ভক্তেরা কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, নিঃশব্দে এই কথা শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদার, বিজয় প্রভৃতির প্রতি)। মাগসুখ যে ত্যাগ করেছে, সে জগৎসুখ ত্যাগ করেছে!—এই কামিনীকাঞ্চনই আবরণ! তোমাদের ত এত বড় বড় গোঁফ—তবু তোমরা ঐতেই রয়েছ!—বল!—মনে মনে বিবেচনা করে দেখ!—

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ, তা সত্য বটে।

কেদার অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,—

"সকলকেই দেখি মেয়ে মানুষের বশ। কাপ্তেনের বাড়ী গিছলাম;—তার বাড়ী হয়ে রামের বাড়ী যাব। তাই কাপ্তেনকে বল্লাম, 'গাড়ীভাড়া দাও'। কাপ্তেন তার মাগকে বল্লে। সে মাগও তেম্নি—'ক্যা হুয়া' 'ক্যা হুয়া' কর্‌তে লাগল। শেষে কাপ্তেন বল্লে, যে ওরাই (রামেরা) দেবে। গীতা ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভিতরে! (সকলের হাস্য।)

"টাকা কড়ি সর্ব্বস্ব সব মাগের হাতে! আবার বলা হয়,—'আমি দু'টো টাকাও আমার কাছে রাখ্‌তে পারি না—কেমন আমার স্বভাব!'

"বড়বাবুর হাতে অনেক কর্ম্ম, কিন্তু করে দিচ্ছে না। একজন বল্লে, গোলাপীকে ধর, তবে কর্ম্ম হবে।' গোলাপী বড়বাবুর রাঁড়।

[স্ত্রীলোক ও 'কলমবাড়া রাস্তা'।]

"পুরুষগুলো বুঝতে পারে না, কত নেমে গেছে।

"কেল্লায় যখন গাড়ী করে গিয়ে পৌঁছিলাম, তখন বোধ হলো, যেন সাধারণ রাস্তা দিয়ে এলাম। তার পরে দেখি যে, চারতোলার নীচে এসেছি। কলমবাড়া (sloping) রাস্তা।

"যাকে ভূতে পায়, সে জান্‌তে পারে না, আমায় ভূতে পেয়েছে। সে ভাবে, আমি বেশ আছি।

বিজয় (সহাস্যে)। রোজা মিলে গেলে, রোজা ঝাড়িয়ে দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কথার বেশী উত্তর দিলেন না। কেবল বলিলেন যে, 'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

তিনি আবার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে, আজ্ঞে হাঁ, আমার স্ত্রীটি ভাল। এক জনেরও স্ত্রী মন্দ নয়! (সকলের হাস্য)।

"যারা কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বুঝতে পারে না। যারা দাবা বোড়ে খেলে, তারা অনেক সময় জানে না, কি ঠিক চাল। কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে, তারা অনেকটা বুঝতে পারে।

"স্ত্রী মায়ারূপিণী। নারদ রামকে স্তব করতে লাগলেন,—'হে রাম, তোমার অংশে যত পুরুষ; তোমার মায়ারূপিণী সীতা—তাঁর অংশে—যত স্ত্রী। আর কোন বর চাই না—কেবল এই কোরো, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!'

সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্র ও তাঁহার নগেন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতুষ্পুত্রেরা আসিয়াছেন। গিরীন্দ্র আফিসের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, নগেন্দ্র ওকালতির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীন্দ্র, নগেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি)। তোমাদের বলি—তোমরা সংসারে আসক্ত হইও না। দ্যাখো, রাখালের জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েছে,—সৎ অসৎ বিচার হয়েছে।—এখন তাকে বলি, 'বাড়ীতে যা;—কখনও এখানে এলি,—দুই দিন থাক্‌লি।'

"আর তোমরা পরস্পর প্রণয় করে থাক্‌লে—তবেই মঙ্গল হবে। আর আনন্দে থাক্‌বে। যাত্রাওয়ালারা যদি এক সুরে গায়, তবেই যাত্রাটী ভাল হয়,—আর যারা শুনে, তাদেরও আহ্লাদ হয়।

"ঈশ্বরে বেশী মন রেখে, খানিকটা মন দিয়ে সংসারের কাজ করবে।

"সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা,—আর কাজে চার আনা। সাধুর ঈশ্বরের কথাতেই বেশী হুঁস্। সাপের ন্যাজ্ মাড়ালে আর রক্ষা নাই!—ন্যাজে যেন তার বেশী লাগে।

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবার সময় সিঁতির গোপালকে ছাতির কথা বলিয়া গেলেন। গোপাল মাষ্টারকে বলিতেছেন—'উনি বলে গেলেন, ছাতি ঘরে রেখে আসতে।' পঞ্চবটীতলায় কীর্ত্তনের আয়োজন হইল। ঠাকুর আসিয়া বসিয়াছেন। সহচরী গান গাহিতেছে। ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া আছেন।

গত কল্য শনিবার অমাবস্যা গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস। আজ মধ্যে মধ্যে মেঘ করিতেছিল। হঠাৎ ঝড় উপস্থিত হইল।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কীর্ত্তন ঘরেই হইবে, স্থির হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সিঁতির গোপালের প্রতি)। হ্যাঁগা, ছাতিটা এনেছ ?

গোপাল। আজ্ঞা—না, গান শুনতে শুনতে ভুলে গেছি।

ছাতিটী পঞ্চবটীতে পড়িয়া আছে; গোপাল তাড়াতাড়ি আনিতে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। আমি যে এত এলো মেলো তবু অতদূর নয়!

"রাখাল এক জায়গায় নিমন্ত্রণের কথায় ১৩ইকে বলে ১১ই!

"আর গোপাল—গরুর পাল! (সকলের হাস্য)।

"সেই যে, স্যাক্‌রাদের গল্পে আছে—একজন বল্‌ছে 'কেশব,' একজন বল্‌ছে 'গোপাল,' একজন বলছে 'হরি,' একজন বল্‌ছে 'হর'! সেই গোপালের মানে গরুর পাল! (সকলের হাস্য)।

সুরেন্দ্র গোপালের উদ্দেশ করিয়া আনন্দ করিতে করিতে বলিতেছেন—"কানু কোথায়?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে।)

কীর্ত্তনী গৌরসন্ন্যাস গাইতেছে—ও মাঝে মাঝে আখর দিতেছে—

(নারী হেরবে না!) (সে যে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম!)
(জীবের দুঃখ ঘুচাইতে) (নারী হেরিবে না!)
(নইলে বৃথা গৌর অবতার!)

ঠাকুর গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসকথা শুনিতে শুনিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। অমনি ভক্তেরা গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন! ভবনাথ, রাখাল, ঠাকুরকে ধারণ করিয়া আছেন—পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর উত্তরাস্য; বিজয় কেদার, রাম, মাষ্টার, মনমোহন, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা মণ্ডলাকার করিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ কি আসিয়া ভক্তসঙ্গে হরিনাম-মহোৎসব করিতেছেন!

অল্পে অল্পে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। ঠাকুর সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন। 'কৃষ্ণ' এই কথা এক এক বার উচ্চারণ করিতেছেন। আবার এক এক বার পারিতেছেন না। বলিতেছেন, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! সচ্চিদানন্দ!—কই তোমার রূপ আজকাল দেখি না! এখন তোমায় অন্তরে বাহিরে দেখছি!—জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সবই তুমি!—মন, বুদ্ধি, সবই তুমি!—গুরুর প্রণামে আছে—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

"তুমিই অখণ্ড—তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছ! তুমিই আধার, তুমিই আধেয়!

"প্রাণকৃষ্ণ! মনকৃষ্ণ! বুদ্ধিকৃষ্ণ! আত্মাকৃষ্ণ! প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন!

বিজয়ও আবিষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর বিজয়কে বলিতেছেন—বাবু, তুমিও কি বেহুঁস হয়েছ?

বিজয় (বিনীতভাবে)। আজ্ঞা, না।

কীর্ত্তনী আবার গাহিতেছেন—'আঁধল প্রেম!' কীর্ত্তনী যাই আঁখর দিলেন—'সদাই হিয়ার মাঝে রাখিতাম, ওহে প্রাণবঁধু হে।' ঠাকুর আবার সমাধিস্থ!—ভবনাথের কাঁধে ভাঙ্গা হাতটী রহিয়াছে।

কিঞ্চিৎ বাহ্য হইলে কীর্ত্তনী আবার আঁখর দিতেছেন—'যে তোমার জন্য সব ত্যাগ করেছে, তার কি এতো দুঃখ?'

ঠাকুর কীর্ত্তনীকে নমস্কার করিলেন। বসিয়া বসিয়া গান শুনিতেছেন। মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট। কীর্ত্তনী চুপ করিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তের প্রতি)। প্রেম কাকে বলে। ঈশ্বরে যার প্রেম হয়—যেমন চৈতন্যদেবের—তার জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে; আবার দেহ যে এতো প্রিয়, এ পর্য্যন্ত ভুল হয়ে যাবে!

প্রেম হলে কি হয়, ঠাকুর গান গাইয়া বুঝাইতেছেন।

গান—হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে।

(সেদিন কবে বা হবে)

(অঙ্গে পুলক হবে) (সংসারবাসনা যাবে)

(আমার দুদ্দিন ঘুচে সুদ্দিন হবে) (কবে হরির দয়া হবে)

ঠাকুর দাঁড়াইয়াছেন ও নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের বাহু আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলের ভিতর তাঁহাকে লইয়াছেন।

ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে আবার সমাধিস্থ। দাঁড়াইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় আছেন। কেদার সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্য স্তব করিতেছেন—

'হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং, হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।

জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপম্, সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

ঠাকুরের ক্রমে ক্রমে সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন ও শ্রীভগবানের নাম করিতেছেন—ওঁ সচ্চিদানন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! যোগমায়া!—ভাগবত ভক্ত ভগবান্!

যে স্থলে কীর্ত্তন ও নৃত্য হইয়াছিল, সেই স্থানের ধূলি ঠাকুর লইতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[সন্ন্যাসীর কঠিন ব্রত। সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষা।]

ঠাকুর গঙ্গার ধারের গোল বারাণ্ডায় বসিয়াছেন। কাছে বিজয়, ভবনাথ, মাষ্টার, কেদার প্রভৃতি ভক্তগণ। ঠাকুর এক একবার বলিতেছেন—'হা কৃষ্ণ চৈতন্য!'

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)। ঘরে নাকি অনেক হরিনাম হয়েছে—তাই খুব জমে গেল।

ভবনাথ। তাতে আবার সন্ন্যাসের কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা! কি ভাব!

এই বলিয়া গান ধরিলেন।

গান—প্রেমধন বিলায় গোরারায়।

প্রেম কলসে কলসে ঢালে ত না ফুরায়!

চাঁদ নিতাই ডাকে আয়! আয়! চাঁদ গৌর ডাকে আয়!
(ঐ) শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতির প্রতি)। বেশ বলেছে কীর্ত্তনে,—'সন্ন্যাসী নারী হেরবে না, এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। কি ভাব!

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সন্ন্যাসীকে দেখে তবে সবাই শিখবে—তাই অত কঠিন নিয়ম। সন্ন্যাসী নারীর চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখবে না!—এমনি কঠিন নিয়ম।

"কালো পাঁটা মার সেবার জন্য বলি দিতে হয়—কিন্তু একটু ঘা থাকলে হয় না। রমণীসঙ্গ তো করবে না—মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত করবে না।

বিজয়। ছোট হরিদাস ভক্ত-মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছিল। চৈতন্যদেব হরিদাসকে ত্যাগ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন—যেমন সুন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোট্‌কা গন্ধ! ও গন্ধ থাকলে বৃথা সৌন্দর্য্য।

"মাড়ওয়ারী আমার নামে টাকা লিখে দিতে চাইলে;—মথুর জমি লিখে দিতে চাইলে; তা লতে পারলাম না।

"সন্ন্যাসীর ভারী কঠিন নিয়ম। যখন সাধু সন্ন্যাসী সেজেছে,—তখন ঠিক সাধু সন্ন্যাসীর মত কাজ করতে হবে। থিয়েটারে দেখ নাই!—যে রাজা সাজে, সে রাজাই সাজে, যে মন্ত্রী সাজে, সে মন্ত্রীই সাজে।

"একজন বহুরূপী ত্যাগী সাধু সেজেছিল। বাবুরা তাকে এক তোড়া টাকা দিতে গেল। সে উঁহুঃ করে চলে গেল,—টাকা ছুঁলেও না। কিন্তু খানিক পরে গা হাত পা ধুয়ে নিজের কাপড় পরে এলো। বল্লে, 'কি দিচ্ছিলে এখন দাও'।' যখন সাধু সেজেছিল, তখন টাকা ছুঁতে পারে নাই। এখন চার আনা দিলেও হয়।

"কিন্তু পরমহংস অবস্থা বালকের অবস্থা। তখন স্ত্রীপুরুষ বোধ থাকে না। তবু লোকশিক্ষার জন্য সাবধান হতে হয়।

শ্রীযুক্ত কেশব সেন কামিনীকাঞ্চনের ভিতর ছিলেন।—তাই লোকশিক্ষার ব্যাঘাত হইল। ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ইনি (কেশব)—বুঝেচো?

বিজয়। আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এদিক ওদিক দুই রাখতে গিয়ে তেমন কিছু করতে পারলেন না।

বিজয়। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বল্লেন, 'নিতাই, আমি যদি সংসার ত্যাগ না করি, তা হলে লোকের ভাল হবে না।' সকলেই আমার দেখাদেখি সংসার কত্তে চাইবে।—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে হরিপাদপদ্মে সমস্ত মন দিতে চেষ্টা করবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন।

"সাধু সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করবে।

"আবার নির্লিপ্ত হলেও লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনীকাঞ্চন রাখবে না। ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগৎ গুরু।—তাকে দেখে তবে লোকের চৈতন্য হবে।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। ভক্তেরা ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

বিজয় কেদারকে বলিতেছেন—'আজ সকালে (ধ্যানের সময়) আপনাকে দেখেছিলাম,—গায়ে হাত দিতে যাই—কেউ নাই।'

মাতৃমূর্ত্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮৪ পৃষ্ঠার পর)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঘোষালকর্ত্তা বিপত্নীক, সর্ব্বদাই রুক্ষ স্বভাব। সংসারের খুঁটিনাটি লইয়াই ব্যস্ত। তিনি দুঃখিনীকে আশ্রয় দিলেন, দুই টাকা বেতন দিবেন, কিন্তু তাহার কন্যা সঙ্গে থাকিলে বেতন পাইবেনা। অর্থাৎ, সেই শিশুর একমুঠা অন্নের জন্য সেই বেতন কাটা যাইবে। তবে অনেক কাঁদাকাটিতে স্থির হইল, দেবসেবার জন্য দুঃখিনী একখানি করিয়া নৈবেদ্য পাইবে, পূজা হইয়া গেলে তাহা ফেরত আনিতে হইবে।

তাহাতেই স্বীকার করিয়া, মনের দুঃখ মনে চাপিয়া, দুঃখিনী প্রায় দুই মাস কাটাইল।

একদিন কন্যার অসুখ, সে নিয়তই কাঁদিতেছে, মায়ের কোল ছাড়িতে চাহে না। অনেক কষ্টে রান্না শেষ হইয়াছে, দুঃখিনী বলিল,—"বড় বউ-ঠাকুরাণি! তুমি যদি বাবুদের পরিবেশন কর, আমি মেয়েটাকে একটু ভুলাইয়া রাখি।"

বড় বৌ। আমরা যদি এতটা কাজ করিব, তবে রাঁধুনি চাকরাণী রাখিবার দরকার কি? আমার কাছে স্পষ্ট কথা, কাজ না পার, আজিকার রোজও পাইবে না।"

দুঃখিনী ম্লানমুখে হাসিয়া বলিল,—"তাই!"

বস্তুতঃই সেদিনকার রোজ মিলিল না। কোন এক আত্মীয় সেই সময় বাড়ীতে আসাতে, দুঃখিনীর অন্ন তাহাকে দেওয়া হইল, এবং কর্ত্তার বিশেষ অনুমতি লইয়া তাহাকে একটী পয়সা দেওয়া হইল। সেই পয়সায় ঠাকুরের ধূপধুনা কিনিয়া আনিয়া, দুঃখিনী উপবাসী রহিল।

কন্যার অসুখ বাড়িল, কেহ নাই যে একবার দেখে। পরদিন পীড়িত শিশুকে লইয়া ঘোষালদের বাড়ীতে আসিলেন। আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল, বড়বৌ গরগর করিতে লাগিল। স্পষ্টই বলিল, "মেয়ের অসুখ হইয়া থাকে, বাড়ীতে বসিয়া থাক'—এত বেলায় আসিবার দরকার নাই।

শিশু, রোগে অচৈতন্য হইয়া রান্নাঘরের এক কোণে পড়িয়া রহিল, তাহার মাতা একমুষ্টি অন্নের জন্য রাঁধিতে বসিল। প্রায় বেলা দ্বিপ্রহরে, শিশু চক্ষু মেলিল, "জল" "জল" করিয়া চীৎকার করিল। তাহার মাতা বউঠাকুরাণীর নিকট একটু মিছরী ভিক্ষা করিল। বৌ ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল,—"কর্ত্তাকে বলিব, এবার রাঁধুনি চাকরাণীদের মিছরীর যেন বন্দোবস্ত করেন।"

দুঃখিনীর চক্ষে জল আসিতেছিল, বুঝি ভয়ে সে চক্ষের জল চক্ষেই শুকাইল; তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ অশ্রু পৃথিবীর বুকে পড়িলে, পৃথিবী জ্বলিয়া যাইবে।

বেলা দ্বিপ্রহরে, আপনার কাজ সারিয়া, কর্ত্রীর অনুমতি লইয়া, তিনি গঙ্গাতীরে এক কবিরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কন্যাকে দেখাইলেন। কবিরাজ বলিলেন, "অবস্থা ভাল নহে, খুব সাবধানে চিকিৎসা করিলে কি হয় বলা যায়না।"

"তবে কি কোন আশা নাই?"

কবিরাজ। এ পীড়ার মূল কারণ তোমাদের অনাহার উপবাস। তা চিকিৎসা করিয়া কি করিব? আর, ঔষধের মূল্যও দিতে পারিবে না?

দুঃখিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"আমার কিছুই নাই, কি দিব? আপনি দয়া করিয়া ইহার চিকিৎসা করুন। আমি পতিপুত্রহীনা দুঃখিনী, আমাকে দয়া করিলে, ভগবান আপনার মঙ্গল করিবেন।"

কবিরাজ। তোমার মত দুঃখিনীত অনেক, কিন্তু আমার চলিবে কিরূপে, মা?

নিরাশ হইয়া, দুঃখিনী কন্যাকে কোলে লইয়া, গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার মনের ভাব, সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভিন্ন এ সংসারে আর কে বুঝিবে?

তখন গঙ্গার জল মধুর কল্লোলে মধুর সঙ্গীত করিতেছিল। সেখানে তখন তেমন লোকের সমাগম ছিল না, দুঃখিনী ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিয়া, অঞ্জলি-

পূর্ণ করিয়া, গঙ্গাজল কন্যাকে পান করাইলেন। গঙ্গার সে মধুর জল-কল্লোল তেমনি মধুর শুনাইতেছিল; আকাশ তেমনি রবিকর-উদ্ভাসিত হইয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল; বৃক্ষবল্লরী বায়ু বিকম্পিত হইয়া, তেমনি দুলিতেছিল; পক্ষীকুল নীরবে কুলায় বসিয়া, বিশ্রামসুখে নিমগ্ন ছিল; দূরাগত জন কোলাহল তেমনি সাগ্রহে দিক মুখরিত করিতেছিল;—কোথাও কিছুরই বৈলক্ষণ্য ছিল না। মানবের সুখ দুঃখের সহিত যেন প্রকৃতির কোন সম্বন্ধই নাই।

কন্যা যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। দুঃখিনী তাহাকে লইয়া, গঙ্গাতীরস্থ দেবমন্দিরে গেলেন। কন্যা মা তাকে ছাড়িয়া, দূরে বসিল, তাহার মাতার আনন্দ হইল—বুঝি দেবতার আশীর্ব্বাদে তাহার পীড়ার উপশম হইল। তিনি একাগ্রমনে দেবতার ধ্যান করিতে বসিলেন।

ইতিমধ্যে এক ইতরজাতিয়া রমণী একথালা অন্ন লইয়া তাহার শিশুপুত্র কন্যাগুলিকে সেই প্রাঙ্গণে খাওয়াইতে বসিল। শিশুগণের কোলাহলে, দুঃখিনীর শিশুও হামা দিয়া নামিয়া আসিল এবং সেই শিশুগণের সঙ্গে মিশিয়া গেল। অন্নের থালা দেখিয়া, খাবা খাবা করিয়া সেই অন্ন মুখে তুলিল। সেই রমণী দেখিয়া ত অবাক। কাহার এ সোণার শিশু? সে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল, বড় আদর করিল, নিজের শিশুগণের সহিত তাহাকেও খাওয়াইতে লাগিল।

ধ্যানান্তে দুঃখিনী, কন্যাকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া, চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে অবাক হইলেন। সেই রমণী দুঃখিনীকে চিনিত, সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মা—এ কন্যা কি তোমার? আমি যে না জানিয়া ইহার মুখে অন্ন দিয়াছি!"

দুঃখিনী। সেজন্য তোমার কোন অপরাধ হয় নাই।

রমণী। আমি যে শূদ্রা!

দুঃখিনী। তুমি সর্ব্বজাতির শ্রেষ্ঠবর্ণা! তুমি দুঃখীর সন্তানকে কোলে তুলেছ, নিরন্নকে অন্নদান করেছ। যদি আমার কোন পুণ্য থাকে, তাহার ফলে তুমি বৈকুণ্ঠে স্থান লাভ করিবে।

বস্তুতঃ এই দৃশ্যে দুঃখিনী এতদূর চমৎকৃতা হইয়াছিলেন যে, তিনি নিজের ক্ষুৎপিপাসা ভুলিয়াছিলেন, কন্যা যে পীড়িতা, মুহূর্ত্তের জন্য সে চিন্তাও ভুলিয়াছিলেন। সেই শূদ্রাণী শিশুগণকে পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল, গৃহ হইতে সুমিষ্ঠ ফল, কিছু দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন আনিয়া, ঠাকুর দালানে আসন পাতিয়া দুঃখিনীকে ভোজন করাইতে বসিল।

তখন যেন সব মনে পড়িল। ঘোষালদের বাড়ীতে তাঁহার অন্ন পড়িয়া আছে, কন্যা বিষমরূপে পীড়িতা—এক এক করিয়া সব মনে পড়িল। সামান্যমাত্র আহার করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন।

বাড়ীতে প্রবেশমাত্রেই ঘোষালদের বড়বৌ বলিলেন,—"কিগো ঠাকুরাণি! এতক্ষণে সময় হল? আদর সোহাগ থাকে, কাজ কর্ম্ম সেরে করলে হয়না? আমরাত আর তোমার মাহিনা খাইনা যে সারাদিন তোমার জন্য বসে থাকব?"

দুঃখিনী নিরুত্তর রহিলেন, রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। বড়বৌ বলিলেন, "আর ওদিকে এখন কি করিবে? ঝি চলিয়া গেল, তোমার ভাত বাহিরে রাখিয়াছিলাম, কুকুরে খাইয়া গিয়াছে। তুমি খাও না খাও, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু কুকুরে ভাত খাইয়াছে শুনিলে কর্ত্তা রাগ করিবেন। এই পয়সাটা নাও, কিছু কিনে খেও, কাল হইতে ত অন্ন জুটে নাই।

দুঃখিনী পয়সাটি লইয়া গেলেন। সন্ধ্যা অবধি ছুটি থাকে। কেহ একবার জিজ্ঞাসা করিল না, সে কি খাইবে, কেহ একবার জানিতে চাহিল না—তাঁহার কন্যা কেমন আছে, কি খাইয়াছে।

তিনি কুটীরে ফিরিয়া গিয়া, ভূমে অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিলেন। কন্যা ঘুমাইয়া পড়িল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"দুঃখেই কি বিধাতার এত আনন্দ? আমার সহস্র সহস্র মহাপাপের কি এখনও প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? তবে আরও দাও, প্রভু। অস্থি পঞ্জর ভাঙ্গিয়াছে, হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, আরও কত দুঃখ দিবে, দাও প্রভু, আমি বুক পাতিয়া দিয়াছি।"

রাত্রে কন্যার বিকার দেখা দিল। দুঃখিনীর সে দারুণ যন্ত্রণা আমি বলিতে পারিব না—সে শক্তি আমার নাই।

প্রাতে অবস্থা আরও মন্দ হইল। ঘোষালদের বাড়ীতে না গেলেই নহে, নিজের উদরের জন্য না হোক, মেয়েটার জন্যও বটে—তাঁহার অন্নের বিনিময়ে যদি কর্ত্তা কন্যার ঔষধ কি একটা পথ্যের ব্যবস্থা করেন, আর সর্ব্বোপরি চিন্তা—দেবসেবা। সেই বিকারগ্রস্থা কন্যাকে বুকে করিয়া দুঃখিনী বাহির হইলেন।

বিস্তর বেলা হইয়াছিল। ঘোষালকর্ত্তা শুনিলেন, বাঁধুনী এখনও পর্য্যন্ত আসে নাই। বড়বৌ অনেক কথা লাগাইল, কর্ত্তা ক্রোধে অধীর হইয়াছিলেন। দুঃখিনীকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই তিনি বলিলেন,—"এ বাড়ীতে তোমার আর স্থান নাই। লোকে যে কুলটা বলিয়া তোমায় আশ্রয় দেয় না—এখন বুঝিতেছি, তাহা সত্য, তুমি এই দণ্ডেই দূর হও!"

দুঃখিনী কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিলেন। সে কান্না এত যে তাহা নদীর আকার ধারণ করিতে পারে। কেহ ডাকিল না, কেহ জিজ্ঞাসা করিল না। দুঃখিনী সেই অদ্ধমৃত কন্যাকে লইয়া, চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন।

যিনি ভূগর্ভস্থ অতি ক্ষুদ্র কীটাণুরও সংবাদ রাখেন, সেই দয়াময় অনন্ত করুণা-নিদানের চরণে কি এ কাতর হাহাকার পৌঁছিবে না?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রসাদপুরের জমিদার বুঝিলেন, এ রমণী রত্ন তাঁহার ভাগ্যে মিলিবে না। তাঁহার সহস্র চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

তাঁহার গুণধর ভাই বলিলেন, "দাদা, তুমি নিজে যদি চেষ্টা করিতে, নিরাশ হইতে হইত না। তুমি ভাগ্যবান পুরুষ, ধূলামুঠা ধরিয়াছ, সোণামুঠা হইয়াছে। এত টাকা তাহার জন্য পাঠাইলে, কোন ফলোদয় হইল না?"

জমি। টাকার কথা যদি বলিলে ত বলি, সেই বুড়ি মাগিটা সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছে, নহিলে সে রমণী এত দুঃখ কষ্ট পাইবে কেন? তা যাহোক, তাহাকে না মিলিয়াছে, ভালই হইয়াছে। বস্তুতঃ আমার তত ইচ্ছা ছিল না। তোমরা পাঁচজনে যখন যেমন চালাইযাছ, চলিয়াছি; নহিলে সেই চিত্রদর্শনের দিন হইতেই আমার প্রাণে কেমন একটা আতঙ্ক ধরিয়াছে।

ভাই। তোমার ও যেমন কথা। সাহস বা ভয় মনের একটা অবস্থা মাত্র। ভয়ের বস্তু জগতে কিছুই নাই। যাহারা ভীরু, কাপুরুষ, ধর্ম্মরাক্ষস তাহাদিগকেই আক্রমণ করে, সাহসী পুরুষ প্রতিপদেই বিজয় লাভ করে। তুমি এখন নিতান্তই অপদার্থ হইয়াছ, তাই তোমারও সাহস উদ্যম তেমন পূর্ব্বের মত আর নাই। আমি এই বুঝিয়াছি, মনের বাসনা অতৃপ্ত থাকিতে শান্তিলাভ অসম্ভব; তাই যত সাধ আছে, আগে সব পিপাসার পরিতৃপ্তি করি, তারপর যদি ধর্ম্ম কি পুণ্য থাকে, তার অনুষ্ঠানে মন দিব।

জমি। এ জনমেও তাহা হইবার নহে। বরং সমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া তাহার অসংখ্য তরঙ্গমালার সংখ্যা করিতে পারিবে, তথাপি এ জীবনে যে কত বাসনা নিয়তই জাগিতেছে, তাহারা ইয়ত্তা করিতে পারিবে না। "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব"—আগুনে যত আহুতি পড়িবে, আগুনের শক্তি ততই বাড়িবে। বাসনার সমাপ্তি নাই!

ভাই হাসিয়া বলিলেন, "দাদার শাস্ত্রেও দখল আছে, কেবল কামিনী ও কাঞ্চনে বিদ্যাটা ফুটিতে দেয় নাই।"

জমিদার গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"কথাটা উড়াইয়া দিবার নহে। আমার ত পাপের ইয়ত্তা নাই, কিন্তু ভোগেরও একটা সীমাত আছে, বুঝি আমি সেই সীমাতেই পৌছিয়াছি। যেদিন আমি আমার পত্নীর—সেই সতীলক্ষ্মীর অবমাননা করি—সেদিনের কথা তুমি জান। সেদিনের একটী ঘটনা তোমাকে বলি নাই।"

ভাই। দোহাই তোমার। ধর্ম্ম কি আর কিছু যদি হয়, পরে শুনিব, তার আগে সুরাপাত্র নিঃশেষ করা যাক্।

জমি। তাহা হইলে আমি আর বলিতে পারিব না। কথাটা এই। আমার স্ত্রী প্রায়ই রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিত না, তাহার মস্তিষ্ক নিতান্ত গরম। কিন্তু সেইদিন রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইয়াছিল। রাত্রশেষে সে এক স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠে এবং আমার হাত ধরিয়া বলে,—"ঐ দেখ, পূর্ব্ব গগনে কি এক বিরাটপুরুষ স্বর্ণকিরণে রঞ্জিত হইয়া, স্বর্ণমুকুটে শোভা পাইতেছে।" আমি বিস্ময়ে চাহিলাম, কিছুই না। জগত সংসার নীরব নিস্তব্ধ, যেমন প্রতিদিনের রাত্রি, সেদিনও তেমনি। গৃহিণী পরিষ্কার কণ্ঠে বলিলেন—"আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তোমার মস্তকে পদধূলি দিতেছেন—আর তুমি এই দেহ ছাড়িয়া, দেহান্তর লাভ করিয়াছ।"

ভাই। আর বৌদিদি তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেছেন।

জমি। যাই বল, এক এক সময় আমার মনে কেমন একটা ঘাত-প্রতিঘাত হয়। আগে বুঝিতাম না, এখন ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছি। বুঝিতেছি যে, দেহটা ছাড়া আর কিছু আছে। বুঝিতেছি যে, মানুষে পশুত্ব অপেক্ষা দেবত্বই বেশী, আমি দেবতা চরণে দলিয়া, পশুকে মস্তকের ভূষণ করিয়াছি। বুঝিয়াছি যে, ধন্বন্তরীর সুধাভাণ্ড ত্যাগ করিয়া, হলাহল সেবন করিয়াছি। বুঝিয়াছি যে, এ ভ্রম একদিন অপসারিত হইবেই। বুঝি আমার সেদিন আগত, প্রায়, তাই ভগবান চিত্রে দর্শন দিয়াছেন, স্বপ্নে তাঁহার মঙ্গল-অভিপ্রায়ের আভাষ দিয়াছেন।

গুণধর ভাই হোঃ হোঃ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"দাদার চক্ষু যে সত্য সত্যই জলে ভিজিয়া গেল!" সে তৎক্ষণাৎ সুরাপাত্র বাহির করিয়া, দাদার চক্ষু রক্তিম আভায় রঞ্জিত করিয়া দিল।

সে শুভ্র মুহূর্ত্ত নিমিষে অন্তর্হিত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখিনী এবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, ঘোষালদের বাড়ী মাড়াইবেন না। অথচ তিনি কি করিবেন—তাহাও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া, কন্যার মুখ চাহিয়া পড়িয়া রহিলেন। ভাবিলেন—ভগবান তাঁহার অদৃষ্টে আরও কি লিখিয়াছেন, তাহা তিনি দেখিবেন।

তিনি দুইদিনের উপবাসা। দারুণ দুশ্চিন্তায় দেহ ও মন অবসন্ন। সম্মুখে অর্দ্ধমৃত শিশু কন্যা—শেষ মায়ার ক্ষীণ আলোকরেখা, বুঝি সে ক্ষুদ্র জীবনের আশা নাই, সে মৃণ্ময় ক্ষুদ্র দীপ বুঝি নির্ব্বাণোন্মুখ!

যতক্ষণ আশা থাকে, মমতা থাকে, ব্যাকুলতা থাকে, ততক্ষণ জীবনের সঙ্গে নানা সংগ্রাম চলে। যখন সে সকলের কিছু থাকেনা, দেহ নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকে, মনও যেন সকল চিন্তা হইতে বিরত হইয়া স্থির হয়। কিন্তু সেই মন, সেই অবস্থায় যে বিষয়ের ভাবনা করে, তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়!

আজ দুঃখিনীরও সেই অবস্থা। কন্যার চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তা সে হৃদয়ে তখন স্থান পাইতেছিল না। একবিন্দু ঔষধ কি একটুকু পথ্য তাহার মিলিল না। কন্যা মরিতে বসিয়াছে মরিবেই, কিন্তু তার আগে তাঁহার মৃত্যু, হইল না কেন?—না, তাহা তিনি চাহেন না, তাহা হইলে তাঁহার কন্যার কি হইবে? কে দেখিবে—বাঁচিলে, কে খাওয়াইবে, কে যত্ন করিবে! আর যদি মরে? তবে একত্রেই দুইজনের কেন মৃত্যু হয় না?

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। সন্ধ্যা আসিল। দেবসেবা হইল না। সে কথা দুঃখিনী ভুলে নাই, কিন্তু বুঝিল "যাঁহার পূজা তিনি করাইলে পূজা হইবে, নহিলে আমার সাধ্য কি তাঁহার পূজা করি? যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, পূজা হইবেই, যদি আমাকে ছাড়িয়া থাকেন, কেন তাঁহার পূজা করিব?—আমি কি ছিলাম, কি হইয়াছি! কে করিল? তুমি ছাড়া, নাথ! জগতে আর দ্বিতীয় শক্তি কি আছে? এত মনস্তাপ, এত মর্ম্মভেদী যাতনা, এততেও কি দয়াময়! তোমার করুণার উদ্রেক হয় না? আর কত দুঃখ দিবে, দাও দেব! আমার—শক্তির পরিচয় দিয়াছি, এইবার তোমার শক্তির পরীক্ষা লইব।"

দুঃখিনীর চক্ষু দিয়া প্রবল বারিধারার ন্যায় অশ্রু নির্গত হইল! তিনি যুক্ত-করে যখন বলিতে লাগিলেন—"হে দীননাথ, দুঃখিনী নিতান্তই জ্ঞানহীনা—কি বলিতে কি বলিয়াছি, যাহা ভাবিবার নহে, তাহাও ভাবিয়াছি; তুমি আমার

সহস্র সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি পাতকী, কিন্তু তুমিত পতিতপাবন, তুমি চরণে ঠেলিলে—আমার আশ্রয় কোথায়?”

কন্যা ডাকিল,—“মা, জল! বড় ক্ষুধা—পেটে জ্বালা ধরিয়াছে, আমায় কিছু দাও মা!” এত কথা সে কহিতে শিখে নাই, এত কথা সে বলিতে পারিল না, কিন্তু তদ্গতপ্রাণা জননী যেন তাহাই শুনিলেন।

তিনি অন্যমনস্কে উঠিয়া, একটা হাঁড়ির মুখ খুলিলেন—কিছুই নাই! ঠাকুর ঘরে গেলেন, প্রসাদী চালের এক কণাও কোথায় পড়িয়া নাই! উঠানে নামিলেন, বৃক্ষের তলায় খুঁজিলেন, কিছুই মিলিল না! আকাশে চাহিলেন—আকাশ অন্ধকার! ঠাকুরের প্রতি চাহিলেন, ঠাকুরকে দেখিতে পাইলেন না! মাথা ঘুরিতে লাগিল, কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি পড়িয়া যাইতেছিলেন,—এমন সময়, কন্যা পুনরপি যাতনা-জড়িত স্বরে ডাকিল—“মা!”

দুঃখিনীর চমক্ ভাঙ্গিল, গৃহাভ্যন্তরে ছুটিয়া গিয়া, কন্যাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। গঙ্গাজল তাহার মুখে ঢালিয়া দিলেন, দুই চিবুক বহিয়া তাহা পড়িয়া গেল।

অনাথিনী, একাকিনী, অসহায়া, সেই দুঃখিনী। সম্মুখে সেই কন্যা!

দুঃখিনীর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“মধুসূদন! দয়াময়! হরি!—এই শেষ তোমার নাম গ্রহণ করিলাম। যদি আর কখন বলাও তবেই বলিব; নহিলে এই শেষ! আমার ধর্ম্ম বিলুপ্ত হোক্, আমার পুণ্য-পবিত্রতা নরকে নিমজ্জিত হোক্, আমার সতী নাম ঘুচিয়া যাক্! দোহাই তোমার, যদি কেহ থাক, আমার জীবন প্রাণ মন, আমার দেহ, রূপ, যৌবন, সর্ব্বস্ব লও—তার বিনিময়ে একমুষ্টি অন্ন দিয়া, আমার কন্যাকে বাঁচাও!”

কন্যা মুখ ব্যাদন করিল, আবার গঙ্গাজল! এবার কন্যাকে শয্যায় রাখিয়া, উন্মাদিনী ছুটিয়া বাহিরে আসিল। আকাশ নিবিড় অন্ধকারে আবৃত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পথে দাঁড়াইয়া, উন্মাদিনী চীৎকার করিল—“কে আছ, পিশাচ! এস, এস,—এই অবসর! এই বিশ্ববিজয়ী রূপ যৌবন গ্রহণ কর, তার বিনিময়ে, এক মুষ্টি অন্ন দিয়ে, আমার কন্যাকে বাঁচাও!”

কেহ শুনিল না, কেহ আসিল না। আকাশ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত, একটি ক্ষুদ্র তারাও জ্বলিতেছিল না। পথে কোন জনমানবের সমাগম ছিলনা, রাত্রি অধিক না হইলেও চারিদিকে গম্ভীর নীরবতা বিরাজ করিতেছিল।

পাগলিনী দারুণ উত্তেজনায় আরও অগ্রসর হইল। নিকটে লোকালয়, কোন গবাক্ষ নিঃসৃত আলোক-রশ্মি দেখিয়া একবার মুহূর্ত্তের জন্য চমকিয়া উঠিল। আবার চিত্তের বিকৃতি জন্মিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল, চীৎকারে সে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, পুনরপি বলিতে লাগিল,--"কত জনে, কত সাধনা করেছিলে--আজ সেই রূপ যৌবন চরণে লুটাইব। এস, এস, দোহাই তোমার, এক মুষ্টি অন্ন, আর কিছুই নহে—মাত্র একমুষ্টি অন্ন, তার বিনিময়ে, আমি রূপ যৌবন নারীর সর্ব্বস্ব উপহার দিব!"

একজন সে কথা শুনিল। বিশেষ মনযোগের সহিত সে কথা শুনিল, বুঝিল এ রমণী কে। তাহার নিরাশা দগ্ধ হৃদয়ে আশার আলোক দেখা দিল, অন্তরে আহ্লাদের তরঙ্গ বহিল।--সে কি আশা? সে কি আহ্লাদ? পাপিষ্ঠ তাহা বুঝিল না, দ্রুত বাহিরে আসিল। দেখিল, অদূরে এক রমণী আকাশ পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গবাক্ষ-নিঃসৃত ক্ষীণ আলোক রেখা তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে। চক্ষে জলধারা বহিতেছে, সেই জল চিবুক বহিয়া, তাহার ছিন্নবসন আর্দ্র করিতেছে! সয়তান একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, বড় আশা করিয়া সে আসিয়াছিল, কিন্তু সে মূর্ত্তিতে কি এক অপূর্ব্ব তেজ প্রদীপ্ত হইতেছিল যে তাহা দেখিয়াই সে স্তম্ভিত হইল, আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

রমণীর হৃদয় ভেদ করিয়াই যেন একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, সেই উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে চারিদিকের বায়ুও যেন উত্তপ্ত হইল। তখন সেই উত্তপ্ত বায়ু মূর্ত্তিমান কামের অঙ্গ স্পর্শ করিল—সে আর মুহূর্ত্তমাত্র তিষ্ঠিতে পারিল না, দ্রুত পলায়ন করিল।

কেহ আসিল না দেখিয়া, পাগলিনী উদ্ভ্রান্ত চিত্তে পথের এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে যাতনা-জড়িত স্বরে বলিতে লাগিল,—"এস তুমি, শীঘ্র এস; আর সময় নাই! আমি রূপের ভাণ্ডার যাচিয়া দিতেছি, গ্রহণ করিবে ত এস! আমার ভিক্ষা একমুষ্টি অন্ন,—অর্থ নহে, অলঙ্কার নহে, একমুষ্টি অন্ন!"

সে করুণ-কণ্ঠ একজনের করুণ হৃদয় স্পর্শ করিল। সে ছুটিয়া নিকটে আসিল, বলিল—"কে মা, তুমি?"

পাগলিনী চমকিয়া দাঁড়াইল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিল—"এসেছ?—একমুষ্টি অন্ন নিয়ে এসেছ? আমি দুই মুঠা চাহিব না। দাও—দাও—দাও,

শীঘ্র দাও, সময় নাই। সে আমার অনাহারে মরিতেছে, যদি মরিয়া থাকে, তার চিতার আগুণে একমুষ্টি অন্ন ফেলিয়া দিব। সে না খাইয়া গেলে, তিনি স্বর্গ হইতে বলিবেন 'তোর রূপ যৌবন ছিল, তাই দিয়ে কেন বাছাকে বাঁচালি না ?'

আগন্তুক। মা, মা, মা !

পাগলিনী পিছাইয়া গেল, চীৎকার করিয়া বলিল—"ছিঃ, ও কথা বলিতে নাই। আমি যে এই দেহ মন প্রাণ উপহার দিতে এসেছি। "মা" নামে ত কেহ আমাকে ডাকে না ? এ রূপের শোভা দেখে ত কেহ মা'কে স্মরণ করে না ?—চেয়ে দেখ, চক্ষু আবৃত করনা, এ মুখের পানে চেয়ে দেখ, লোকে বলে—এ মুখের জন্য দেবতাও স্বর্গত্যাগী হইতে চাহে !"

"মা, মা ! আর ও কথা বলিওনা। এখনি যে মেদিনী রসাতলে ডুবিবে ! আমি সন্তান, তুমি জননী। এস মা, তোমার কুটীরে এস, আমি তোমার চরণ সেবা করিব।"

"তুমি আমার কন্যাকে অন্ন দিবে ? তাহাকে বাঁচাইবে ?"

"হাঁ মা, তাহাকে বাচাইব।"

"তবে এস, শীঘ্র এস। কিন্তু আমি কিছুই দিতে পারিব না, আমি বড়—বড় দুঃখিনী।"

"তোমার শুভ আশীর্ব্বাদই আমার পুরস্কার।"

দুঃখিনী ভগবানের শক্তির পরীক্ষা চাহিয়াছিল ! ব্রহ্মাণ্ডপতি ক্ষুদ্র কীটাণুর সে সাধ পূর্ণ করিলেন !

(ক্রমশঃ)

সেবক শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

বেদব্যাস।

(১)

খর-স্রোতা দুকুল-প্লাবিনী সরস্বতী—
অনিল লহরে মিশি,
নাচিছে দিবস নিশি,
কুলুতানে মধু গায় নদী পুণ্যবতী।

(২)

তরু'পরি গাহে পিক পাপিয়া বুলবুল—
কাকলি ধ্বনিত স্থান,
সুপবিত্র প্রাণারাম—
কুসুম সৌরভে করে মানস আকুল।

(৩)

তট'পরি ক্ষুণ্ণমনে বসি ঋষি ব্যাস,
মহর্ষি উধাও মন,
হারা যেন কি রতন,
কি যেন নাহিক চিত্তে কিসের প্রয়াস!

(৪)

জ্ঞানের ভাণ্ডার করি বেদব্যাস যিনি,
রাশি রাশি গ্রন্থ যাঁর,
হিয়া ভারাক্রান্ত তাঁর,
উধাও মানস কেন শান্তিহারা তিনি!

(৫)

ভক্তাধীন ভগবান কৃপাসিন্ধু হরি—
মনে পেয়ে সে সন্ধান,
উঠিল কাঁদিয়া প্রাণ,
মহর্ষির সুপ্রভাত অজ্ঞান শর্ব্বরী।

(৬)

ডাকিলেন ভগবান দেবর্ষি নারদে—
হে নারদ, মর্ত্তে যাও,
মহর্ষিরে দেখা দাও,
সন্তপ্ত মহর্ষি বসি সরস্বতী নদে।

(৭)

সদানন্দ প্রেমময় দেবর্ষি চলিল,
বীণায় মধুর তানে,
বিভুর কীর্ত্তন গানে,
নয়ন গলিল—আহা মরম মোহিল।

(৮)

জ্ঞান অবতার কবিকুলের ভূষণ,
বসি যথা বেদব্যাস,
উধাও ময়মাকাশ,
দেবর্ষি নারদ আসি দেন দরশন।

(৯)

জ্ঞান গৌরবের মূর্ত্তি ঋষি বেদব্যাস,
পাশে প্রেম ভক্তি স্ফূর্ত্তি,
দেবর্ষি নারদ মূর্ত্তি,
দেবর্ষি মহর্ষি পাশে কি শোভা বিকাশ।

(১০)

কহিলেন ব্রহ্মাপুত্র দেবর্ষি মহান্,—
মহর্ষে! কি হেতু ক্ষুণ্ণ,
কেন চিত্ত শান্তি শূন্য,
অধীর কেন গো তব তত্ত্বজ্ঞ পরাণ?

(১১)

কি কারণ ক্ষুণ্ণমন তব তপোধন,
অসার সংসারে সার,
পরারাধ্য প্রাণাধার,
লেখনী কি করিয়াছে সে গুণ কীর্ত্তন?

(১২)

কহিলেন দেবর্ষিরে মহর্ষি তখন,
লভিয়াছি জ্ঞানধন,
এবে প্রেম আকিঞ্চন,
হৃদয়-মন্দিরে চাহি পূজিতে চরণ।

(১৩)

মধুভাষী নারদের অমিয় বচন,
কহিলেন—তপোধন,
সবি দেখি আয়োজন,
একটাই বাকি কেন রেখেছ এখন?

(১৪)

এস আজি সে দক্ষিণা কর সমাপন,

নৈবেদ্য সাজায়ে রাখি,

দক্ষিণাই দেখি বাকি,

মনফুলে সে দক্ষিণা করনা অর্পণ।

(১৫)

মহর্ষির প্রেমআঁখি ফুটিল তখন,

দেবর্ষি দিলেন দীক্ষা,

মহর্ষির মহা শিক্ষা,

জ্ঞানে প্রেমে সম্মিলন, অতি সুশোভন।

(১৬)

এই ফলে সুধাময় সুগ্রন্থ সৃজন—

লেখনীর মধু বৃষ্টি,

শ্রীমদভাগবৎ সৃষ্টি,

সংসারী জীবের প্রাণে অমিয় সিঞ্চন।

(১৭)

প্রাণারাম বিনা কোথা প্রাণের আরাম!

মোহ-অন্ধ জীব সব,

চিত্তে হাহাকার রব,

আসা যাওয়া জন্ম মৃত্যু নাহিক বিশ্রাম।

(১৮)

সচ্চিদানন্দের নামে হ' মন মগন,

লেখনি, পবিত্র মুখে—

ফোটাও পরম সুখে,

পাতকীতারণ, বিভু ব্রহ্ম সনাতন।

(১৯)

এই যেন হয় নাথ প্রভু ভগবান,

বারেকের তরে হায়,

ফোটে যেন রসনায়,

"জয় ভগবান" বলি ছোটে গো পরাণ।

শ্রীসুশীলমালতী সরকার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

গত ১১ই ভাদ্র, শনিবার, জন্মাষ্টমীর দিন, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে পঞ্চবিংশ বার্ষিক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১২৯৩ সালের জন্মাষ্টমীর ৮ দিন পূর্ব্বে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বস্বরূপে প্রয়াণ করেন। জন্মাষ্টমীর দিন তাঁহার সমগ্র সেবক ও শিষ্যমণ্ডলী একমত ও একত্রিত হইয়া ঠাকুরের দেহাবশেষ যোগোদ্যানে সমাহিত করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন। এই দিন হইতে ঠাকুর জগজ্জীবের নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই হইতে এই পঁচিশ বৎসর জন্মাষ্টমীর দিন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা কল্পে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়া আসিতেছে। আর যাবৎ এই জগৎ থাকিবে, ততদিন এই উৎসব তাঁহার পর পর ভক্তগণের দ্বারায় পরিচালিত হইবে। হে জগদ্বাসি, ঐ দেখ—তোমাদের পরিত্রাতা নিত্যলীলারূপে চিরতরে যোগোদ্যানে বিরাজমান। সেবকমণ্ডলী এই উৎসবে যথার্থই গাহিয়াছেন—

(গীত)

প্রেমের লীলা, প্রেমের খেলা, প্রেমের মেলা, যোগোদ্যানে।
আজ নদীয়ার ন্যায়, নামের বন্যার, ভেসে যায় নাম সংকীর্ত্তনে।
সবে ভাবে বিহ্বল, প্রেমে ঢল ঢল, রামকৃষ্ণনামামৃত পানে॥
দয়াল প্রেমের অবতার, আসি ধরাতে এবার,
(জীবের দশা হেরি বহে নয়নের ধার)
ভাঙ্গি প্রেম-ভাণ্ডার, বিলায় ভারে ভার, অযাচিতে কত যতনে।
কে প্রেম-ভিখারী, আয় ত্বরা করি, বাঞ্ছাকল্পতরু সন্নিধানে॥
কিবা কোটী শশী পরকাশি, উজলিছে মোহন রূপরাশি,
(রূপের প্রভায় আলো দশদিশি)
(তাহে সুধাধরে ঝরে হাসি)
বসি পদ্মাসনোপরে, বরাভয়করে, অভয় দিতে সাধন-ভজনহীনে॥
প্রভু দুর্ব্বলেরি বল, দীনের সম্বল,
(ও তাঁর পতিতপাবন নাম ভরসা কেবল)
দিয়ে রামের দোহাই, এই ভিক্ষা চাই, কৃপা যেন রহে অভাজনে।
বলে জয় রাম, জয় রামকৃষ্ণ, স্থান পাই অভয়-শ্রীচরণে॥

সেবক রামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ কল্পবৃক্ষের আদি মধুর ফল। সে ফলের আস্বাদ যাঁহারা লইয়াছেন, তাঁহারা তৃপ্তপ্রাণ, অমর ও ধন্য। এ ফলের মধুর রস, মধুর ভাব, জগতের জীব অনন্তকাল যতই আস্বাদ করিবে, ততই রামকৃষ্ণ কল্পবৃক্ষের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। রামচন্দ্রই ঠাকুরকে সর্ব্ব প্রথমে 'ঠাকুর' বলিয়া জানিতে পারেন, বুঝিতে পারেন। তিনিই ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রথমে তাঁহাকে 'অবতার' বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। আর তিনিই জগতের সমক্ষে তাঁহাকে প্রথমে 'অবতার' ও 'ঠাকুর' বলিয়া ঘোষণা ও প্রচার করেন। রামকৃষ্ণকে জানিতে হইলে, রামকৃষ্ণকে বুঝিতে হইলে রামচন্দ্রের সহায়তা ভিন্ন উপায় নাই। রামচন্দ্র তাঁহার প্রাণের দেবতার কাহিনী তাঁহার গ্রন্থাবলীতে যেরূপ অকপট চিত্তে, জলন্ত বিশ্বাসের সহিত বলিয়া গিয়াছেন, এমনটী আর কেহ আজও পর্য্যন্ত বলিয়াছেন বলিয়া, আমাদের জানা নাই। ঠাকুর! তাই আজ তোমার ভক্তশ্রেষ্ঠ, সেবকমণ্ডলীর অগ্রগণ্য রামের দোহাই দিয়া তোমাকে ডাকিতেছি, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও।

ত্রয়োদশবর্ষ ধরিয়া রামচন্দ্র এই উৎসব যোগোদ্যানে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি উপস্থিত জনসাধারণকে যে ভাবে আপ্যায়িত ও সেবা করিতেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার চরণাশ্রিত শিষ্যমণ্ডলী আজও তাঁহার আদর্শে সাধারণের সেবা করিয়া থাকেন। এবারে উৎসবে প্রায় দশসহস্র দর্শক উপস্থিত হইয়া প্রভুর গুণকীর্ত্তনে যোগদান করেন। সেবকমণ্ডলী সাধ্যমত সকলের যত্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি যদি কোনওরূপ ত্রুটি হইয়া থাকে, সাধারণে তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

জন্মাষ্টমীর দিন, রেঙ্গুনের সেবকমণ্ডলী ঠাকুরের বিশেষ উৎসব করিয়াছিলেন। নামকীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের আরাঙ্গবাদস্থ সেবকমণ্ডলী এই বৎসর ঠাকুরের প্রথম উৎসব করিয়াছেন। ঠাকুরের নামগান ও 'জয় রামকৃষ্ণ' নাদে আনন্দপ্রবাহ বহিয়াছিল। আশা করি উৎসব স্থায়িত্ব লাভ করিবে এবং ঠাকুরের নামে সকলেই বিগলিত হইয়া যাইবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

আশ্বিন, সন ১৩১৭ সাল।

চতুর্দ্দশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবলীলা।*

শেষ প্রহব প্রহর নিশি, রামকৃষ্ণ প্রেম শশী,
উঠিয়া বসল শেষ পরে।
সহসা কি মনোভাব, কে বুঝে প্রেম প্রভাব,
মধুবাণী 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' স্ফুরে॥
ক্রমে প্রভু ধীবে ধীরে, পশ্চিম অলিন্দ পরে,
গৃহদ্বার খুলি উপনীত।
এক দুই তিন চাবি, নামি ধাপ সাবি সারি,
প্রাঙ্গণেতে আসিলা ত্বরিত॥
ঐ যে দাঁড়ায়ে ফাঁকে, মোর প্রাণসখা ডাকে,
কেমনেতে ধৈরয ধরি—
হেন ভাবে হয়ে ভোরা, চলে রায় মাতোয়ারা,
পঞ্চবটী পানে মুখ করি॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি চিতে, পথপানে যেতে যেতে,
চলে রায় উদ্যান ভিতর।

---

* দক্ষিণেশ্বর চিত্র।

গোলাপের বৃক্ষ যত, তাহাতে কণ্টক যুত,
প্রভু অঙ্গ করিল বিদর॥
বিন্দু লক্ষ্য নাহি তায়, প্রাণদেব চলি যায়,
বসন লাগিল এবে গাছে।
'কিষ্ট' 'কিষ্ট' রব সার, মত্ত সে প্রভু আমার,
বদ্ধভাবে দাঁড়াইযে আছে॥
আঁখিধারা বহি যায়, (বুঝি) সুরধুনী পানে ধায়,
মৃত্তিকা ভিজেছে কত তাহে।
রাধাভাবে মত্ত প্রাণ, মরি কি প্রেম বিধান,
কভু মুদে, কভু আঁখি চাহে॥
প্রভুরে নিকটে পেয়ে যত ফুল কলি।
চৌদিক আমোদ করি ফুটিল সকলি॥
(যেন কুঞ্জ ভেলারে) (রাধাশ্যামের মিলন সুখে)
বহুক্ষণ হেন ভাবে প্রভুব কাটিল।
ঊষাকালে দীননাথ* সেরূপ দেখিল॥
সেবক বিহীন ভাবে থাকা কভু নহে।
'শুক-সারি' প্রতি তেঁহ বুঝাইয়া কহে॥
তাঁদের আদেশে দাস সদা প্রভু সাথী।
আমি জনমে জনমে যেন দাস হয়ে থাকি॥
(প্রভুর দেব-দেহ আগুলিয়া)
(আমাব আর কোন সাধ নাহি মনে)

শ্রীরামকৃষ্ণের নবভাব।

বন্দনা।

"জয় নিত্য নিরঞ্জন, সত্য সনাতন, মোক্ষ নিকেতন, ত্রাণকারী।
জয় ভক্তিবিধায়ক, শক্তি-সুনায়ক, ভবাব্ধিভেলক, পাপহারী॥
জয় ভক্তবিনোদন, দুষ্কৃতিবারণ, শশাঙ্কগঞ্জন, রূপধারী।
জয় জিত-যোগীজন, কামিনীকাঞ্চন, ত্যাগী মহাজন, ব্রহ্মচারী॥

* তৎকালে দেবোদ্যানের খাজাঞ্চী।

জয় প্রণব বিহারী, শুদ্ধ বেদাচারী, জীব হিতকারী, নারায়ণ।
জয় পঞ্চ উপাসক, মোহ বিনাশক, সিদ্ধি বিধায়ক, সনাতন॥
জয় সাধক ভাস্কর, তান্ত্রিক প্রবর, বীরপশ্বাচার, ভাবধারী।
জয় সিদ্ধ পঞ্চতপা, অধীশ অজপা, পাহি কুরুকৃপা, তাপবারি॥
জয় স্বধর্ম্মপালক, সর্ব্বসুচালক, জ্ঞান বিস্তারক, বিশ্বপাতা।
জয় দয়া পাবাবার, পাতকী উদ্ধাব, দুস্তব নিস্তার, মুক্তিদাতা॥
জয় মহাভাব ভোরা, বাহ্য জ্ঞানহাবা, সর্ব্ব মনোহরা, মোক্ষদাতা।
জয় জীব দয়াবান, সর্ব্ব সমজ্ঞান, অকৃতি অজ্ঞান পরিত্রাতা॥
জয় যিশু মতধাবী, ভেদরোধকাবী, সর্ব্বসমাচারী, ভক্ত প্রভু।
জয় কাফেব দমন, বিহিত কোবাণ, ইসলাম সাধন, সিদ্ধ বিভু॥
জয় বিভূতি ভূষণ, বপু বিনোদন, অজিন বসন, দেব হব।
জয় চন্দন চর্চ্চিত, জবা বিলম্বিত, হাব বিভূষিত, কলেবব॥
জয় ভৃগু শাক্যদেব, নানক, কেশব, ইসা মূশা সব, মূর্ত্তিধারী।
জয় মহেশ ঘবণী, কেশব রমণী, ত্রিতাপহাবিণী, শুভঙ্করী॥
জয় দেব পরাৎপব, সংসাব সাগর, ত্রাহিমে নিস্তার, কর্ণধার।
জয় কলুষনাশক, সজ্জন পালক, ধর্ম্ম সুরক্ষক, অবতার॥
জয় সুরেন্দ্র বন্দিত, যতীন্দ্র সেবিত, নরেন্দ্র পূজিত, মনোহর।
জয় বিজয় ত্রিভুবন, পণ্ডিত সুধীগণ, জ্ঞান হুতাশন, দীপ্তকর॥
জয় রামকৃষ্ণ প্রভু, দীপ্যমান বিভু, স্রষ্টাপাতা ত্রিভু, মহেশ্বর।
জয় বাণী বিবন্দিত, প্রেম বিমণ্ডিত, ভীত পদাশ্রিত, বিঘ্নহর॥"

যে অবতার 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে অভিহিত হইয়া আমাদের এই বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বসাধারণের কল্যাণার্থ সনাতন উপদেশ সকল প্রদান করিয়া গিয়াছেন, নিম্ন গীতি ভিন্ন তাঁর কি পরিচয় দিতে পারি।

গীত।

"কি ব'লে তাঁর দিব পরিচয়।
সে যে দয়ার নিধি, প্রেম জলধি, দেখলে নয়ন শীতল হয়॥
ভাবলে মন শীতল হয়।
কোটী সূর্য্য এক করিলে, তুলনা তাঁর নাহি হয়—
সে অনন্ত আকাশপূর্ণ, আশ্চর্য্য আলোকময়॥

তাঁর প্রিয় শিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্র, যিনি সংসারে থাকিয়া কি ভাবে জীবন যাপন করিতে হয়, তাহার আদর্শ নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখাৎ তদীয় উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্ম বলিলে যাহা সত্য ধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, যাহা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলকারী সেই সনাতন ধর্ম্ম বুঝায়, যাহা প্রত্যেকের অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম। এই সনাতন ধর্ম্ম প্রকটিত করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। হিন্দুর অধিকার সময়ে যে যে ধর্ম্ম ভাবের প্রাবল্য হইয়াছিল, সেই সেই ভাবেরই প্রচার হইত। বেদের সময়ে বৈদিক, পুরাণের সময়ে পৌরাণিক, তন্ত্রের সময়ে তান্ত্রিক এবং বুদ্ধাবতারে বৌদ্ধধর্ম্মের কার্য্য হইয়াছে। মুসলমানদিগের অধিকারকালে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচার হয়। বর্ত্তমানকালে খৃষ্টমতাবলম্বী জাতির আধিপত্যে খৃষ্টধর্ম্মেরও প্রচার হইতেছে। এইরূপ যে ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই ধর্ম্মই যেন বিশ্বসংসারকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সযত্নে বাহু প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। সকলেই বলিতেছেন যে, যদ্যপি কাহারও এই বিষাদপূর্ণ সংসারে দুঃখসঙ্কুল পাঞ্চভৌতিক দেহের স্বচ্ছন্দতা লাভ এবং বিবিধ অলীক কুসংস্কার-বিশিষ্ট আত্মার মুক্তিসাধন করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, তুমি এখনই ত্রিতাপ জ্বালার দুর্ব্বিসহ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, স্বর্গীয় শান্তির শীতলতায় সুস্নিগ্ধ হইবে এবং কালকবলিত হইলে প্রেমময়ের প্রেম নিকেতনে চিরশান্তি লাভ করিবে। এইরূপে সংখ্যাতীত ধর্ম্মপ্রণালী সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দিতেছে।

বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে যে সকল উপাসক সম্প্রদায় আছেন, সাধারণতঃ সেই সকল সম্প্রদায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা—সৌর, গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব। বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে অতি প্রাচীন ও বৈদিক তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। "বিষ্ণু দেবতা অস্য" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা বৈষ্ণবপদ সাধিত হইয়াছে। বিষ্ণু বৈদিক দেবতা। বিষ্ণু উপাসকদিগের সাত্ত্বিকভাবে যজন; তাঁহাদের স্বর্গ কামনা নাই, প্রাণী বলি নাই, সোমপানও নাই। ইঁহারা শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানের আরাধনা করেন। ইঁহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও উপাসনা পদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে উত্তম, নিষ্কাম ও ভগবদ্ভাবপূর্ণ। শ্রীমুকুন্দের পাদসেবায়, তদীয় নাম শ্রবণ কীর্ত্তনে, তাঁহার স্মরণে বন্দনে, দাস্যে, অর্চ্চনায়, সখ্যে ও আত্মার্পণে যাঁহার দৃঢ়মতি, তিনিই বৈষ্ণব।

সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদের কর্ম্মকাণ্ডস্থ পশু হিংসা উঠাইয়া দিয়া

বুদ্ধদেব (শাক্যসিংহ) প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বীয় ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আবার এগার শত বৎসর হইল শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ মতকে নিরস্ত করিয়া পৃথিবীতে অদ্বয় ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু বৌদ্ধমতকে নিরস্ত করিতে গিয়া তিনি বিবর্ত্তবাদের অবতারণ করিয়াছেন, তদনুসারে স্বয়ং পরমেশ্বরই স্বীয় মায়া দ্বারা আপনাকে বিবর্ত্তিত করিয়া জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ও জীবরূপ ধারণ করিয়াছেন। অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি ব্রহ্ম, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, আমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না; অভ্যাসবশতঃ দেহ যে সকল কার্য্য করে, সে আমার নয়, দেহের ;—আমি তাহার জন্য দায়ী নহি ; আমার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক নাই ; আমি স্বয়ম্ভূ, আপনিই আপনার নিয়ন্তা। শঙ্করের শিক্ষায় এইরূপ আহঙ্কারিক বুদ্ধি উদিত হইল। জীবের প্রতি দয়া উঠিয়া গেল, পরকালের ভয়, ঈশ্বরের ভয় উঠিয়া গেল, ভগবদ্ভক্তিও উঠিয়া গেল। ক্রমে তন্ত্রোক্ত ভ্রষ্টাচার, বামাচার প্রভৃতি কদাচার সমাজে প্রবেশ করিল। সাত্ত্বিকভাব উঠিয়া গেল। তামসিক পূজা অর্চ্চনাদিতে দেশ আচ্ছন্ন হইল।

এই সময়ে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিপথ উদ্ঘাটিত করিলেন ; দেখাইলেন যে, ভক্তি স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহা উপার্জ্জন করিতে হয় না, জীবের চিত্তে তাহা স্বভাবতঃ নিহিত রহিয়াছে। যদি চেষ্টা করিয়া নিবারণ করা না যায়, তবে চিত্ত আপনা হইতেই ভক্তিপথে ধায়। এই পরম রস পাইয়া আনন্দিত মনে শত শত, সহস্র সহস্র লোক ভক্তিপথ অবলম্বন করিল। জীবের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, নিজ সম্পত্তি, শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেই প্রেমধনের আস্বাদন দেখাইলেন এবং জীবকে কৃতকৃতার্থ করিলেন।

বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাত্মা রামচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে লিখিয়াছেন যে, ধর্ম্ম কখনও দুই হয় না, ধর্ম্ম এক অদ্বিতীয়। সকল দেশের সকল লোকের এক ধর্ম্ম। যেমন মনুষ্য এক—হিন্দু, মুসলমান, সাহেব, কাফ্রী, চীনেম্যান, রুষ সকলেই মানুষ—এক অদ্বিতীয় মানুষ। শরীরের বর্ণনা সর্ব্বত্রই এক হইয়া থাকে। ক্ষুধা পিপাসার এক প্রকার বর্ণনা হইয়া থাকে। জাতি কিম্বা দেশভেদের জন্য কখন তাহার প্রভেদ হয় না। সেই প্রকার ধর্ম্ম বলিলে একই বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মের যে ভাবান্তর দেখা যায়, তাহা মনুষ্যদিগকে দেখিলেই বুঝা যাইবে। বস্তুগত এক হইয়া সকলেই পৃথক। সহোদরেরা সকলেই পৃথক। যেমন নরনারীগণ মূলে এক হইয়া স্থূলে বিভিন্ন, সেইরূপ মূলে এক ধর্ম্ম থাকিয়া স্থূলকার্য্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যভাবের দ্বারা তাহারও পার্থক্যভাব দেখাইবে।

রামকৃষ্ণদেব তদনন্তর জলের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন, যে আকাশের জল সর্ব্বত্রই প্রায় বিশুদ্ধ। কিন্তু সেই জল পৃথিবীতে সমাগত হইয়া স্থানিক কারণ বিশেষে নানাবিধ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোথাও কূপ, কোথাও খাত, কোথাও পুষ্করিণী, কোথাও গঙ্গা, আবার কোথাও নর্দ্দামা এবং কোথাও সমুদ্র ইত্যাদি। কূপ, খাত, পুষ্করিণী প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মরাজ্যের পার্থক্যতা বঝিতে হইবে এবং মূলে এক জ্ঞানও থাকিবে। যেমন তিনি বলিয়াছেন যে, সিযালদহে গ্যাসের মশলার ঘর। উহা এক অদ্বিতীয়। কিন্তু সহরে কোথাও ঝাড়ে, কোথাও লণ্ঠনে, কোথাও পরীতে, কোথাও আলোকবিহীন শিখায় জলিতেছে। স্থূল আবরণ বা দীপশিখার তারতম্য দেখিলে ভাববৈচিত্র্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু যে গ্যাসের নিদান জানে, সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পায় যে, এক গ্যাস সহরের সর্ব্বত্রে জলিতেছে।

বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখ হইতে সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, পুষ্পমাল্যে নানাবিধ ফুল সংস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটী সূত্র, সেইরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মভাবের অন্তরে অদ্বিতীয় আমি সূত্রবৎ অবস্থিতি করিয়া থাকি। এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবতারে উদ্ভাসিত হইয়া পরম পবিত্র গীতায় লিপিবদ্ধ ছিল। কালক্রমে মনুষ্যসমাজ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হইলে যখন লোক সকল হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল, তখন শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গাবতার গ্রহণপূর্ব্বক নিজে আচরিয়া জীবকে শিক্ষা দেন এবং তাহাই রামকৃষ্ণদেব কার্য্যের দ্বারা সেই ভাবের অভিপ্রায় সম্যকরূপে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনের প্রেমলীলা, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা ব্যতীত অন্যত্র লাভ করা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি অতি সুধাময়, তাহা গৌরাঙ্গ উপাসনা ব্যতীত কখনই লাভ করা যায় না। মাতৃভাবের কার্য্য আদ্যাশক্তি ভগবতী ভিন্ন নিরাকার ব্রহ্মে কখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পিতার ভাব পুত্রে, মাতার ভাব স্ত্রীতে যেমন অসম্ভব, ধর্ম্মরাজ্যের ভাবও তদ্রূপ জানিতে হইবে। তাই রামকৃষ্ণদেব নিজে সাধন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সার্ব্বজনীন ভাবের তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণ বলিয়া হউক, রাম বলিয়া হউক, কালী বলিয়া হউক, চৈতন্য বলিয়া হউক, মহম্মদ বলিয়া হউক, ঈশ্বর বলিয়া হউক, যে যে কোন ভাবে এক ভগবান বলিয়া প্রেমে হউক বা সত্ত্বমুখ বা তমোমুখ ভাবে হউক, অথবা কৃপায় হউক, অর্থাৎ যে যে কোন প্রণালীমতে অনুরাগী হইবেন, তাঁহারই ঈশ্বর লাভ হইবে। কোন ধর্ম্মই ভ্রান্তিসঙ্কুল নহে,

কোন ধর্ম্মই অমূলক নহে, যে যে মতে যে ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সেইভাবেই চরিতার্থ হইয়া থাকে, কারণ ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। সর্ব্বত্রে একই অদ্বিতীয় চৈতন্যশক্তি বিরাজিত। বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিলে একটী বিশেষ প্রকার সম্প্রদায় বুঝাইবে না, কারণ ধর্ম্ম পাঁচটা হইতে পারে না, ছোট বড় হইতে পারে না।

সামঞ্জস্য স্থাপন করা ভগবানের কার্য্য। যখন পাষণ্ডেরা বলবান হয়, তখনই তাহাদের দলন না করিলে সাধারণ সমতা রক্ষা হয় না। অত্যাচারী রাবণের দ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেব সমতা ভঙ্গ হইয়াছিল, তাই ধনুর্ধারী রামের অবতবণ। কংসের অত্যাচাবে যখন সকলের শান্তিভঙ্গজনিত মনের সমতা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হিংসাবৃত্তির উত্তেজনায় যখন সর্ব্ব-সাধারণের মানসিক অসমতা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দুর্ব্বল কলির জীবের সাংসারিক আসক্তির প্রাবল্যজনিত স্বার্থ-পরতার বৃদ্ধি, জ্ঞান বিলুপ্তি এবং পশুবৎ আকারে পরিণত হওয়ায়, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবনী মাঝারে প্রেমের প্রস্রবণ খুলিয়া অপামরকে প্রেমিক করিয়া সমতা স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে জগাই মাধাইকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপা না করিলে তাহাদেব কি কখনও অন্য উপায় হইত? বর্ত্তমান কালে সর্ব্বত্রে সকলের মনে সমতা ভঙ্গের বিলক্ষণ লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। চারিদিকে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। যাহাতে এক ভাবে, এক স্থানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নরনারী উপবেশন করিতে পারেন, যাহাতে সকল ধর্ম্মের সারভাগ মন্থনপূর্ব্বক এক স্থানে সংস্থাপিত করিতে পারেন, পরস্পর সৌভ্রাতৃসূত্রে গ্রথিত হইয়া হিন্দু, মুসলমান, ম্লেচ্ছাদি সমুদয় মনুষ্য পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, এমত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হওয়া উচিত। কেশব বাবু এইরূপ ধর্ম্মভাবের আভাষ দিয়াছিলেন। চিকাগোর বিরাট ধর্ম্মমণ্ডলীতে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের অভিনয় করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, এ প্রদেশেও স্থানে স্থানে ঐরূপ ভাবের আভাষ পাওয়া যাইতেছে। লোকের এইরূপ অবস্থা হইবে জানিয়া ভগবান তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে রামকৃষ্ণদেব ধর্ম্মজগতের আভ্যন্তরিক কার্য্য যাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গের তাহা আলোচনা ও শিক্ষা করা উচিত। সকল ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করা যায় না। সারাংশ লইতে হইলে তাহাব সাধনা চাই। তাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে সকল ধর্ম্মই সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়া যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই আমাদের শিরোধার্য্য, অবনত মস্তকে তাই গ্রহণ করিয়া সাধন করিয়া যাইতে হইবে। রামকৃষ্ণদেবের এই

অনুপম ধর্ম্মভাব বাস্তবিক প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের হৃদয়ের সামগ্রী। এই ভাবে দ্বেষাদ্বেষ নাই, ধর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকার নাই। তিনি বলিতেন, যেমন চাঁদামামা সকলেরই, ভগবান তেমনি সকলেরই। ভগবানকে সাধু ভাষায় উপাসনা করিলে তিনি শ্রবণ করেন, এমন কোন কথাই নাই। তাঁহার কোন বিশেষ নাম ধরিয়া না ডাকিলে, তিনি শুনিতে পান না, এমন কোন কথাই নাই। আমার একজন সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমার আর একজন সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা হইতেই পারে না। এক ঈশ্বর সকলের কর্ত্তা, সকলের ভর্ত্তা এবং সকলের পরিত্রাতা। তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ হইলেও, প্রত্যেক দেবতাই সেই সনাতন চিদানন্দ এবং নিরাকার সত্ত্বার সহিত মানবাত্মার মহোচ্চ সম্বন্ধ আবিষ্কারক একটী শক্তি এবং আকারে পরিণত তত্ত্ব। রামকৃষ্ণদেব শৈবও নহেন, শাক্তও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন এবং বৈদান্তিকও নহেন ; অথচ এ সকলই তিনি, কারণ তিনি শিবের উপাসনা করেন, কালীর উপাসনা করেন, রামের উপাসনা করেন, কৃষ্ণের উপাসনা করেন এবং বেদান্ত মতেরও দৃঢ় সমর্থনকারী।

রামকৃষ্ণদেব অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া সর্ব্বত্রে সমতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, এক ঈশ্বরের অনন্ত ভাব ; অনন্ত ভাবের পরিচয় স্থূল-জগতের অনন্ত প্রকার বস্তু ; অনন্ত বস্তুর সমষ্টিই ঈশ্বর। যেমন চন্দ্র সূর্য্য এক অদ্বিতীয়। মনুষ্য, জীব, জন্তু, জল, বায়ু, মৃত্তিকা, পাহাড়, পর্ব্বত সকলেই এক চন্দ্র সূর্য্যের দ্বারা আপনাপন ভাবের কার্য্য করিয়া লইতেছে। উদ্ভিদেরা উদ্ভিদদিগের প্রয়োজন মত এবং জীবগণ তাহাদের প্রয়োজন মত কার্য্য করিতেছে। ইহারা পরস্পর কলহ করে না। যতক্ষণ উহারা আপন কার্য্য আপনি করে, ততক্ষণই সমাজ রক্ষা হয়। হিন্দুতে হিন্দুভাব, মুসলমানে মহম্মদীয় ভাব, খৃষ্টানে খৃষ্টভাব এবং বৌদ্ধে বুদ্ধ ভাব ; অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে যে প্রকার ভাব উত্থিত হইবে, সেই ভাব তাহার নিজের বলিয়া বুঝিতে হইবে? একজনের ধর্ম্মভাব অন্যে অবলম্বন করিতে গেলে ধর্ম্মের সমতা স্থাপন না হইয়া অসমতাই সংঘটন হইয়া যায়। তাই তিনি বলিতেন যে "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"

অদ্বৈত ভাব অর্থে এক জ্ঞান বুঝায়। যে জ্ঞানে দুইটী ভাব থাকিতে পারে না, এখন জ্ঞানকেই অদ্বিতীয় জ্ঞান বলা বলা যায়। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা কর ; অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞান যাহাকে বলে, তাহা অগ্রে লাভ করিয়া তদনন্তর যাহা ইচ্ছা, অর্থাৎ যে কোন

প্রকার সাধন ভজন করিতে হয়, তাহা করিলে তবে সর্ব্বত্র সমতা স্থাপন হইবে। অদ্বৈত জ্ঞান ব্যতীত সমতা সংস্থাপনের দ্বিতীয় পন্থা নাই। অদ্বৈত জ্ঞান লাভ-পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিলে কালে সর্ব্বত্রে আকাঙ্ক্ষিত সমতা স্থাপন হইয়া যাইবে। তাই বলিয়া স্থূল জগতকে মায়া বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে না ; তাহা হইলে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভাব, প্রেম কিছুই থাকে না ; ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের স্বাতন্ত্র্য থাকে না ; নিত্য লীলা একাকার হইয়া যায় ; সাকার রূপের মহাপ্রলয় হয়, এমন কি উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া আইসে। বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অদ্বৈত জ্ঞান শিক্ষা করিয়া যাহা ইচ্ছা, অর্থাৎ যাহার যাহা ধারণা, যাহা যাহার আনন্দকর, যাহা যাহার রুচিজনক, তাহাই তাহার করিবার বিষয়। যে ব্যক্তি যে ভাব আশ্রয় করিয়া ভগবানকে লাভ করিতে পারে, যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি দৃঢ় হয়, তাহার পক্ষে তাহাই অবলম্বনীয়।

"যাহার যাহাতে রুচি, যে নামে ধারণা।
তাহার তাহাই বিধি, তাহাই সাধনা॥
ভাবময় নিরঞ্জন, ভাবের সাগর।
যাহার যে ভাবে ইচ্ছা, তাহাতে উদ্ধার॥"

"অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যাহা ইচ্ছা কর।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "যে ভাবে বা যে নামেই ভগবানের উপাসনা কর, এক ভগবান ও সকল ধর্ম্মই সত্য, এই জ্ঞান রাখিও। অর্থাৎ একটীতে নিষ্ঠা করিয়া অপরকে ভুল বলিওনা, বা ঘৃণা করিও না। বিদ্বেষ করিলে কোন ফল হইবে না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীআনন্দগোপাল সেন, বি, এ।

সঙ্কীর্ত্তন।*

ভগবান যে সময়ে নরলীলা করিবার জন্য অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই সময়ে তাঁহার লীলাপুষ্টি মানসে, তিনি কতকগুলি লোকের ভিতরে আপনার কার্য্যসিদ্ধকরী শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত লোকের

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব উপলক্ষে, যশোহর—চেঙ্গটীয়া ধর্ম্মাশ্রমে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত সেবক-সমিতির সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ। ১০ই চৈত্র, সোমবার, সন ১৩০৮ সাল।

দ্বারা এরূপ কার্য্য স্বতঃই হইয়া যায়, যাহা তাঁহার লীলাখেলার মহা সহায়তা করে। সঙ্কীর্ত্তন বিবরণে আমরা তাহার কিছু দৃষ্টান্ত দিব।

ভগবানের নাম মাহাত্ম্য ও তাহার প্রভূত শক্তির পরিচয় চিবকালই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া এই নামধর্ম্মে এক নবভাব এবং নবশক্তির সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার চতুর্ব্বিংশ বর্ষ বয়সে পিতৃ-কার্য্যোপলক্ষে গয়াধামে গমন করেন। তথা হইতে তাহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া একদিন তাহার টোলের পড়ুয়াগণকে লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেই কীর্ত্তনটি এই—

"হরি হরয়ে নমঃ, বাম যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"

বাঙ্গালা ৯১৫ সালে প্রথম এই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়।

গৌরাঙ্গ যে ভাব প্রচাব করিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন, তাহা ধারণা করিবার জন্য তাঁহার সম সময়ে সেই প্রকারের লোকও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার পড়ুয়াগণ ব্যতীত, শ্রীবাস, মুরারী, মুকুন্দ, গদাধর, রূপ, সনাতন, বল্লভ, চন্দ্রশেখর, যবন হরিদাস প্রভৃতি সকলেরই বিষয় একবার অনুধাবন করিয়া ভাবিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যেন তাঁহাদের ভিতরে নিমাইয়ের কার্য্য সংসাধন করিবার জন্য কি এক অদ্ভুত শক্তি নিহিত ছিল।

নিমাই ৯১৫ সালে যে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই কীর্ত্তন ভক্তগণ সহযোগে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কীর্ত্তনে নবভাব, নবরাগ, নবসুর ইত্যাদি সংযোজিত হইতে লাগিল। খোল করতালরূপ বাদ্যযন্ত্রের সমাদর ও সমাবেশ হইল। হরিনাম, নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তনরূপে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই নাম সঙ্কীর্ত্তনের কি প্রভূত শক্তি, মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে তদ্দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিয়া জগতে তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপে নাম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশ বিদেশেও নামপ্রচার হইতে লাগিল। নবদ্বীপ সে সময়ে সহর ছিল। সর্ব্বপ্রকারের নানা স্থলের লোক তথায় নানা কারণে যাতায়াত করিত। যাঁহারা ভক্তপ্রাণ, তাঁহারা এই নব নামকীর্ত্তনপ্রথা আপনাপন স্বদেশে লইয়া গিয়া নিজেদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিলেন। নিমাইয়ের সন্ন্যাসের পর কীর্ত্তনের স্রোত অতি তীব্রবেগে প্রবাহিত হইল। নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে ছিলেন। প্রতিবর্ষে রথযাত্রার সময়ে ভক্তগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। সে সময়ে জগন্নাথধামে পদব্রজে যাইতে

হইত। তাঁহারা যাইতে যাইতে পথে যথায় বিশ্রাম করিতেন, তথায়ই কীর্ত্তনাদি করিতেন। এইরূপেও নামকীর্ত্তন লোক মধ্যে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। পুরীধামে রথযাত্রার সময়ে সে এক অতুলনীয় দৃশ্য। কোনও প্রেমিক ভক্তের একটি সঙ্গীত দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি—

"দয়াল গৌর নাচে ব'লে হরিবোল।
হরিবোল বিনা নাই অন্য বোল॥
বামে নাচে অদ্বৈত দয়াল, করে দিযে করতাল,
প্রভুর দক্ষিণে নিতাই নাচে প্রেমে মাতোয়াল,
দু'ভাই যেচে যেচে নেচে নেচেরে মহাপাতকীরে দিচ্ছে কোল॥
হরিনামে বেজেছে মাদোল, প্রেমে হচ্ছে দোল মাদোল,
সঙ্গে প্রভুর সাত সম্প্রদায় চতুর্দ্দশ মাদোল,
নামে গগণে উঠিল ধ্বনিরে, শুনে ভক্তপ্রাণ হ'ল শীতল॥"

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাবসানের পরেও কিছুকাল বিশুদ্ধভাবে কীর্ত্তনাদি চলিয়াছিল। ক্রমে তাহাতে আবরণ পড়িতে লাগিল। ব্রজবুলির কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া সখীসম্বাদের সৃষ্টি হইল। তাহা হইতে কবি, দাঁড়াকবি প্রভৃতি নানাপ্রকারের কুরুচিপূর্ণ ভাব সমস্ত প্রচার হইতে লাগিল। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে মহাপ্রভু শক্তিসঞ্চার করিয়া কলির জীবকে ভবার্ণবে তরিবার জন্য যে অমূল্য সম্বল দিয়া গিয়াছিলেন, কালের প্রাদুর্ভাবে সে সমস্ত কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। অনধিকারীদিগের দ্বারায় তাঁহাতে ভ্রষ্টাচার ও কুৎসিৎ ভাব সমস্ত প্রবিষ্ট হইয়া দেশকে কদাচারী করিয়া তুলিল। ধর্ম্মে গ্লানি প্রবেশ করিল।

যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, সেই সময়ে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মকে উদ্ধার করেন। মহাপ্রভুর অপ্রকট কালের ঠিক ৩০০ বৎসর পরে ১২৪১ সালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অবনীতে অভ্যুদিত হয়েন। সে আজ ৬৭ বৎসরের কথা। এই শতাব্দীতে জগতে বিবিধ ধর্ম্মভাবের অভ্যুত্থান হইয়া মহাগণ্ডগোল সমুত্থিত করিয়াছিল। রামকৃষ্ণদেব সাধন দ্বারায় প্রত্যেক পন্থায় সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া জগতকে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, সকল ধর্ম্ম মত, সকল ধর্ম্মপথই সত্য, যদি তাহা ধর্ম্মেরই জন্য অবলম্বন করা যায়। ইহা সত্য হইলেও, তিনি বারবার বলিয়াছেন যে, কলির জীবের পক্ষে নামই সহজ উপায়। যোগ যাগ প্রভৃতি একালে হওয়া অতীব কঠিন। নবাবী কালের টাকা যেমন ইংরাজ রাজত্বে চলে না, তেমনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ধর্ম্মসাধন-সোপানে এখন ঈশ্বর লাভ করা দুরূহ।

রামকৃষ্ণদেবের এই ভাব ধারণা করিবার জন্য, ইহার পোষকতা করিয়া জীবের মধ্যে ইহা প্রচার করিবার জন্য, ঠিক সেইরূপ শক্তিশালী লোকসমূহ জন্মগ্রহণ করিযাছিল। কেশবচন্দ্র, রামচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির জীবন, তাহার জলন্ত সাক্ষ্য। তাঁহাদের জীবন সভ্যসমাজে অবিদিত নাই। কত নগণ্য প্রদেশে ঠিক ঐরূপ কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য কত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা কে জানে! কত দূর দূরান্তরে ঐ ভাব ধারণা করিবার জন্য ঠিক ঐ প্রকারের লোক সমস্ত জন্মিয়াছিল, এখনও জন্মিতেছে। এমেরিকা, ইংলণ্ড, কি প্রকারে তাঁহাব ভাব বুঝিল? মোক্ষমূলার কেমন করিয়া কেশব-জীবন দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মজগতে কি একটা মহল্লীলা ঘটিবে! সে সমস্ত রামকৃষ্ণ শক্তির অতুলনীয় মহিমা।

আমরা এই প্রদেশে কয়েকটী জীবন দেখিতে পাই, যাঁহাদের ভিতরে এই ভগবচ্ছক্তির ক্রিয়া হইযাছে। যাহাদেব মধ্যে জ্ঞান নাই, ভক্তি নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, সাধন নাই, ভজন নাই, সেই সমস্ত হিন্দুসন্তানের পরিত্রাণের জন্য, কলিতে নাম সংকীর্ত্তনই একমাত্র গতি। ইহা ঠিক কথা হইলেও, আমাদের প্রদেশে সে সঙ্কীর্ত্তন আদর পায় নাই। কারণ, সখীসম্বাদ ও কবি ইত্যাদি তাহার স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা দেখিয়া, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে একটী লোকের প্রাণ প্রথম বিচলিত হইয়া উঠে। ইনি নরেন্দ্রপুরগ্রামস্থ স্বর্গীয় মথুরানাথ মজুমদার*। তাঁহার দ্বারায় যে কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছিল, এইক্ষণ তাহার সুন্দর বিকাশ দেখিয়া প্রাণ হইতে স্বতঃই "মথুরানাথ ধন্য," "মথুরানাথ ধন্য" এই বাক্য ধ্বনিত হইতে থাকে।

মথুরানাথের পূর্ব্বে সাতক্ষীরা-নিবাসী কাশীবাবুর প্রবর্ত্তিত কতকগুলি সংকীর্ত্তন অত্রস্থলে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেগুলি পুনঃ পুনঃ গীত হওয়ায় লোকের আর তাহাতে আস্থা ছিল না। মথুরানাথ বাল্যকাল হইতে গীত রচনা করিতে পারিতেন। অনেক কবির দলে তিনি গীত রচনা করিয়া দিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার নিজেরও একটী সখের যাত্রার দল ছিল। তিনি সে সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে সঙ্কীর্ত্তন করিতে মানস করেন। তিনি গ্রামস্থ লোকজনসহ একটী সম্প্রদায় করিয়া স্বয়ং গীত রচনা করিতে লাগিলেন।

---

* ইনি ১২৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৮৮ সালের ৩রা আশ্বিন, রবিবারে পরলোকগত হন। ইঁহার জীবনী ও সংগীতাবলী প্রকাশিত করিতে আমাদের বাসনা আছে।

তাঁহার মাসতুতো ভাই ৺ রুক্মিণীকান্ত রায় আজীবন তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। রুক্মিণীকান্ত সঙ্কীর্ত্তনে সুর সংযোজন করিতেন। ৺ চন্দ্রবদন গোস্বামী সংগীতের ভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং "খোঁড়া-গোঁসাই" নামে পরিচিত অপর ব্যক্তি গীতের ভাষাগত শুদ্ধাশুদ্ধের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাহা সংশোধন করিতেন। মথুরানাথ তাঁহার অনেক গীতে "গোঁসাই চন্দ্রকান্ত বলে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভণিতা দিয়াছেন। গোস্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশের এবং স্বীয় আত্মগরিমাশূন্যতার ইহা পরাকাষ্ঠা নিদর্শন। সুবাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এই দলের উন্নতিকল্পে অনেক সহায়তা করিয়াছেন, এবং তিনিই এই দলে বাজাইতেন।

মথুরানাথ যে সমস্ত গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক গীতে রামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের ভাব স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। একটী গীতাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। যথা,—

> "উপাসনার কারণ, পঞ্চ ভাবেতে ভাবে পঞ্চজন—
> শাক্তের শক্তি, শৈবের শিব, বৈষ্ণবের শ্রীজনার্দ্দন,
> আবার সৌরী হয় যে জন, সূর্য্য তার কারণ, গাণপত্য ভাবে গজানন,
> নানারূপে, নানাভাবে, করেন হরি জীবের নিস্তার।
> তাঁরে রাখালভাবে ভাবে রাখালগণ,
> বনে বনে গোধন চরাণ শ্রীনন্দের নন্দন;
> শিল্পকারী যারা, বিশ্বকর্ম্মাভাবে ভাবে তারা,
> মগে বলে ফরাতারা, যীশু বলে খৃষ্টানেরা,
> আবার খোদা ব'লে ডাকে মুসলমান যাহারা,
> বদর বলে নায়ের মাঝিরা—
> এক ব্রহ্ম হতে বহুরূপে হরেন হরি ভাবের ভার।"

আমাদের আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। মথুরানাথ যখনই তাঁহার মস্তিষ্ক ও লেখনী হইতে ঐ শেষ পংক্তিটী বাহির করিয়াছেন, তখনি বুঝিয়াছি—তিনি ঐশ্বরিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। মথুরানাথ স্বীয় সম্প্রদায় বহুদিন মনোমত চালাইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার স্বরচিত সংগীতগুলির দ্বারায় তিনি এ প্রদেশে পরম প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

মথুরানাথের সময়ে চেঙ্গটীয়া গ্রামে ৺ অভয়াচরণ রায় একটী সঙ্কীর্ত্তনের দল করেন। ইহাতে গ্রামস্থ অনেক ভদ্রসন্তান যোগ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয়

কেদারনাথ মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি এ সম্প্রদায়ে বিশেষ সহায়তা করিতেন।

অভয়াচরণের পরলোক গমনান্তে কেদারনাথের ভ্রাতা ও মথুরানাথের জামতা শ্রীকাশীনাথ মজুমদার প্রায় ২৪ বৎসর বয়সে একটী সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠন করেন। ইহা কলিকাতার সভ্য সম্প্রদায়ের আদর্শে গঠিত হয়। এই সময়ে কলিকাতায় ৺ কেশবচন্দ্রের মহা প্রাদুর্ভাব ছিল। এ সম্প্রদায় গঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই মথুরানাথ ইহাতে যোগদান করিলেন। সঙ্কীর্ত্তনে জামাতার অধ্যবসায় ও অনুরাগ দেখিয়া তিনি অতীব আনন্দিত হইলেন এবং স্বীয় সংগীতাদির দ্বারা তাহাকে সহায়তা করিতে লাগিলেন। সে সময়ে কাশীনাথ-সম্প্রদায়ে বেবাগ্দী-নিবাসী যজ্ঞেশ্বর আচার্য্য নামে একজন বাদক ছিলেন। তাঁহার বাদ্যশক্তি অতুলনীয়। দুঃখের বিষয়, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কাশীনাথের আন্তরিক যত্ন, মথুরানাথের অমিয় সদৃশ সংগীত, যজ্ঞেশ্বরের সুধাক্ষরিত বাদ্য, এবং গায়কবৃন্দের সুমধুর কণ্ঠ, এই সমস্তের সমন্বয়ে সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়টী এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল।

এই সম্প্রদায় হইতে এ প্রদেশে একটী শুভযোগ উপস্থিত হইল। সকলে সুধামাখা হরিনামের স্বাদ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ইহার দৃষ্টান্তে দেয়াপাড়া, জগন্নাথপুর, পোস্তাগ*, গাদগাছি, মাগুরা, মহাকাল, ধোপাডিহি, বারান্দি, দক্ষিণডিহি, কোণাখোলা প্রভৃতি জানিত স্থলে, এবং অনেক অজানিত গ্রামে, নানা নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, এবং পুরাতন সম্প্রদায়েরা আপনাদিগকে নব উদ্যমে ঐ ভাবে পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তনে বেড়াউত্তর কমাইয়া, কেবল হরিনাম করিবার জন্য অনেক সম্প্রদায় মনোযোগী হইল। ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। মথুরানাথ রচিত প্রায় সমুদয় সঙ্কীর্ত্তনগুলি এইক্ষণ কাশীনাথের নিকটে পাওয়া যায়, এবং তাঁহার দলের উপেন্দ্রনাথ এইক্ষণ কাশীনাথের দলের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ও বাদক।

শ্রীগৌরাঙ্গ মুসলমানকে পরিবর্ত্তিত করিয়া হরিনাম দিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণদেব সকলকে স্ব স্ব ভাবে রাখিয়া তাহাদের সহিত তত্ত্বালাপ করিয়াছেন। কাশীনাথের সম্প্রদায়ে এই ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রূপচাঁদ বিশ্বাস নামক

---

* গ্রামে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য "রূপসনাতনের ভিটা" বলিয়া একটী স্থান আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই স্থলের স্মরণার্থে কোনরূপ মহোৎসব স্থাপনা, উচিত বলিয়া বিবেচনা হয়।

কোনও এক আনুষ্ঠানিক মুসলমান ইহাতে সময়ে সময়ে হরিগুণগান রচনা করিয়া দিয়াছে, এবং হরির লুট প্রভৃতি লইয়া তাহাকে অবাধে ভক্ষণ করিতে দেখা গিয়াছে। সে ব্যক্তি আপন ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া পরধর্ম্ম সমর্থন করিয়াছে, এবং এখনও করে, ইহা দেখিয়া কি বলিব না যে, রামকৃষ্ণশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে এ প্রদেশে কার্য্য করিয়াছে ?

নরেন্দ্রপুরে মথুরানাথ সম্প্রদায় ক্ষীণ ভাব ধারণ করিলেও, একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। গ্রামে হরির লুটাদি হইলে অনেকে সমবেত হইয়া গান করিতেন। কিছুকাল হইল উক্ত গ্রামবাসী ৺ গোপালকৃষ্ণ মজুমদার (ঝড়ুবাবু) ঐ সম্প্রদায়কে নবোদ্যমে জাগ্রত করেন, কিন্তু তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত বাণীকান্ত রায় দলের অধ্যক্ষপদে বরিত হইয়াছেন। বাণীকান্ত রচনাপটু, তিনি অনেকগুলি সঙ্কীর্ত্তন স্বসম্প্রদায়ের জন্য রচনা করিয়াছেন। সে গীতগুলি মধুর ও সুভাব সম্পন্ন। ১৩০৩ সালে ধর্ম্মাশ্রমের উৎসবে গীত হইবার জন্য বাণীবাবু প্রথম 'রামকৃষ্ণ-সংগীত' রচনা করিয়া গান করেন।

সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে সিঙ্গা-সোলপুর নিবাসী ৺ আনন্দচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্প্রদায়ের অতি সুযশ শ্রবণ করা গিয়াছে। এইক্ষণ তাঁহার পুত্র এই সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতেন। এতদ্ব্যতীত বারান্দি নিবাসী শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তী ও দক্ষিণডিহি নিবাসী শ্রীমনোহরচন্দ্র দের সম্প্রদায়দ্বয় ইদানীং উল্লেখ যোগ্য।

বহুদিন হইতে "ভাটপাড়া" নামক স্থানে রথযাত্রার সময়ে হরিসঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় সকলের একটী সম্মিলন ঘটনার সুব্যবস্থা ছিল। দুঃখের বিষয় প্রায় দশ বৎসরকাল সে মিলনের তত সুব্যবস্থা নাই। আশা করি, সে স্থলের বাসিন্দাগণ তদোদ্ধারে উৎসাহিত হইয়া কার্য্য করিবেন।

প্রায় বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে চেঙ্গটীয়া গ্রামে ৺ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনা করেন। তাঁহার উৎসাহে এবং গ্রামস্থ সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় ও ভদ্রসন্তানগণের যত্নে প্রতি বর্ষে এই উপলক্ষে উৎসব করিয়া নগরকীর্ত্তন বাহির হইত। কিন্তু সে ভাবের কার্য্য বহুদিন এ স্থলে চলে নাই। এইক্ষণ শ্রীমদ্ প্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজী মধ্যে মধ্যে উৎসব করিয়া, হরিনামের উচ্চ রোলের সহিত এই গ্রামে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করাইয়া থাকেন। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী রাখিয়া আরও শুভকার্য্য সম্পাদন করান, ইহা আমাদের প্রাণের একান্ত বাসনা।

মথুরানাথ ও কাশীনাথ প্রভৃতির সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়ে যে রামকৃষ্ণ শক্তির প্রচ্ছন্ন

বিকাশ বলিয়াছি, এইক্ষণ তাহা প্রকাশ্যভাবে আরম্ভ হইয়াছে। ১৩০২ সালের ২৯শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, জন্মাষ্টমীর দিন চেঙ্গটীয়া গ্রামে ধর্ম্মাশ্রম নামে একটী সভা গঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত অসাম্প্রদায়িক ভাবের প্রচার এবং প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়কে আপনভাবে উন্নত হইতে শিক্ষা প্রদান করা। হিন্দুপ্রাণ যাহাতে আপন ধর্ম্মে বলীয়ান হইয়া উঠে, কুপ্রবৃত্তি, বিষয়লালসা প্রভৃতি পরিহার করিয়া যাহাতে শ্রীহরির অভয়চরণে মজে, এবং যাহাতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি আপনাদের হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে, তাহার জন্য ও ধর্ম্মাশ্রম কার্য্যসাধনে তৎপর।

এই উদ্দেশ্য যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার জন্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মজুমদার, শ্রীবাণীকান্ত রায়, শ্রীমদ্ প্রাণকৃষ্ণ দাস প্রভৃতি বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, ও করেন। ডাক্তার ৶ কালীদাস ঘোষ ইহাদের একজন সহযোগী ছিলেন। কি স্বদেশে, কি বিদেশে যে সকল নরনারী ধর্ম্মাশ্রমের জন্য কিঞ্চিৎ কার্য্যও করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, আমরা তাঁহাদের নিকটে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ জানিবেন।

প্রতি বর্ষে দোলের সময় ধর্ম্মাশ্রমে একটী মহোৎসব হইয়া থাকে। তখন ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতাদি ও দুই দিবস অনবরত হরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। তাহাতে সকলের প্রাণমন বিগলিত হয়, পাপ তাপ ধুইয়া যায়, প্রেমানন্দে সকলে জয় জয় রবে নাচিতে থাকে। হরিনামের মহারোলে গগণপ্রান্ত ছাইয়া যায়।

ধর্ম্মাশ্রম স্থাপনার পর হরিনামের দলাদলি ও বেড়াউত্তর অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। ধর্ম্মাশ্রমে উক্ত বিষয় নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই অত্রস্থলে প্রচলিত। মানব-অন্তরে প্রেমভক্তির বিকাশই ইহার উদ্দেশ্য। ভগবদ্‌প্রসাদে এ উদ্দেশ্যের কথঞ্চিৎ সাফল্য দেখা যাইতেছে।

এই ধর্ম্মাশ্রমের আদর্শে ১৩০৬ সালে ধোপাডিহি গ্রামে ও ১৩০৭ সালে নরেন্দ্রপুরে এক একটী ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইয়াছে। বর্ষে বর্ষে সে সকল স্থলেও হরিনামের আনন্দরোল উঠিতেছে। ইহাদের প্রতি এবং সকল সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের প্রতি আমরা অন্তরের সহিত সহানুভূতি জানাইতেছি। প্রার্থনা—কলির নামধর্ম্মপ্রচারে কেহই যেন বিরত না হন। হরিনামে এ দেশকে সকলে মিলিয়া মাতাইয়া তুলুন। জীব উদ্ধার হউক।

যে হরিনামে নারদ ঋষি বিভোর ছিলেন, যে হরিনামে ধ্রুব প্রহ্লাদ পাগল হইয়াছিলেন, যে হরিনাম লইয়া স্বয়ং ভগবান গৌরবেশে দেশে দেশে ফিরিয়া-

ছিলেন, যে তারকব্রহ্ম নামের বীজবাক্যে নামধারণ করিয়া ভগবান সম্প্রতি রামকৃষ্ণরূপে জীবের হিতার্থে ও পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছিলেন, আজ সকলে মিলিয়া সেই হরিনাম কর। ভাই বন্ধুতে মিলিয়া সেই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কর। তোমাদের প্রেমভক্তি লাভ হইবে, ভবভয় দূর হইবে, শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া জীবনে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবে।

জপ তপ যাগ যজ্ঞ নাহি প্রয়োজন।
কলিকালে কর সবে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

জীতু খাঁ।

(জিথড় গ্রামের পুরাতন কাহিনী।)*

প্রকাণ্ড সরোবর,—দূর হইতে স্রোতবিহীনা নদী বলিয়া অনুভূতি হইতেছে। অগ্রসর হইয়া দেখি, বৈশাখের গগনবিলম্বী মেঘমালা হইতে কে যেন একখণ্ড নীরদখণ্ড ভূতলে আয়তক্ষেত্রের ন্যায় পাতিত করিয়া রাখিয়াছে। সরোবর-তটে বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষ। ঘন পল্লবশ্রেণী সমাচ্ছন্ন বৃক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গাম্ভীর্য্যের অভিব্যক্তি। শাখায় শাখায় অনন্ত বিহঙ্গকুলের কুলায়-শ্রেণী। সুবৃহৎ কোটর প্রদেশে চক্র-নির্ম্মাণকারী মধুকরের গুঞ্জনধ্বনি—মধ্যে মধ্যে কাটবিড়ালীর আবাসস্থল। বিস্তীর্ণ তলপ্রদেশে মার্ত্তণ্ডতাপিত জীবসমূহের শান্তি-নিকেতন। পরার্থপরতাময় প্রাণ শত বর্ষা, শত বাদল, শত মার্ত্তণ্ডকিরণ, শত প্রভঞ্জন, পরের জন্য মস্তকে বহন করে। কে বলে সুখ আত্মপ্রতিষ্ঠায়? আত্মবিসর্জ্জন ব্যতীত সুখশান্তির কল্পনা মরীচিকা মাত্র।

সরোবর-সলিল এতই নির্ম্মল যে, অগাধ জলরাশির তলপ্রদেশজাত তৃণগুল্ম জলজ শৈবালাদি পর্য্যন্ত নয়নপথে দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছন্দে পরিদৃষ্ট হয়। সরোবরের একধারে শৈবালাবৃত, তন্নিম্নে মৎস্যকুল আস্ফালন করিতেছে। তীরভূমি আম, জাম, নারিকেল, তাল প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষে পরিপূর্ণ। সেই অশ্বত্থমূলে প্রকৃতির কনক কিরীট। কোন্ প্রকৃতিসুন্দর মহাপুরুষ এ বিস্তৃত প্রান্তরে এরূপ কাকচক্ষু সদৃশ নির্ম্মল জলাশয় খনন করিয়াছেন? কোন্ সৌন্দর্য্যপ্রিয় সুরুচিসম্পন্ন

---

* জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী ঝিনাইদহ মহাকুমার মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র পল্লী। ঝিনাইদহ হইতে দশ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

প্রেমিক পুরুষপুঙ্গব সরোবরের চতুপার্শ্বস্থ উন্নত ভূমিখণ্ডে সারিবন্দিভাবে ফলবান বৃক্ষসমুদয় রোপণ করিলেন? কোন নিঃস্বার্থ হৃদয়বান মহাপুরুষ পরের জন্য এত স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন? প্রায় তিনশ, সাড়ে তিনশ বৎসর পূর্ব্বে এই পল্লীতে এই সরোবর। এই সরোবরের দক্ষিণদিকে 'জীতু খাঁ' নামক এক জলদস্যুর বাড়ীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ঐ জলদস্যু জীতু খাঁর নামানুসারে অত্র পল্লীর নাম 'জিথড়' হইয়াছে। এ সময় এদেশে লোকের বসতি খুব কম ছিল। এই গ্রামের উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর ব্যাপী জলাশয় ছিল। জীতু খাঁ দস্যুদিগের দলপতি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বোক্ত বাড়ীটী জীতু খাঁর বাড়ী নহে, উহা [illegible] না। অন্যান্য তাহার সহচরেরা বাস করিত। ঐ বাড়ীটার চারিদিকে পরিখা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

গ্রামের পূর্ব্বদিকে সাঙ্কাই নদী। উক্ত নদীর [illegible] নীলের কুটী বর্ত্তমান আছে। উক্ত স্থানে জীতু খাঁর বাড়ী ছিল, ওখানে জীতু খাঁ বাস করিত। বাড়ীটা প্রকাণ্ড, প্রায় ৫০০ বিঘা জমী ব্যাপী হইবে। উহার চারিদিকে প্রকাণ্ড গড়, তন্মধ্যে পুষ্করিণী অদ্যাপিও বর্ত্তমান। দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, পূর্ব্বে এ বাড়ীটা একজন বড় লোকের বাড়ী ছিল।

পূর্ব্বে যে বাড়ীর ভগ্নাবশেষ কথা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছি, উহার পশ্চিম হইতে "যাদুড়িয়া" গ্রাম পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড পথ। সে পথকে জীতু খাঁর জাঙ্গাল বলে। প্রকাশ আছে যে, যাদুড়িয়ার যাদুবিবি নাম্নী জীতু খাঁর স্ত্রী বাস করিতেন। যাদুবিবির নামানুসারে উক্ত গ্রামের নাম যাদুড়িয়া হইয়াছে। জীতু খাঁর স্ত্রী, জীতু খাঁর মত পাষণ্ড ছিলেন না। তিনি অত্যাচার করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ ভাল বাসিতেন না। তাই তাঁহাকে যাদুড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল। যাদুড়িয়া যাইবার সুবিধার জন্য জীতু খাঁ ঐ রাস্তা বাঁধিয়া ছিলেন। যে সময় জীতু খাঁ এ পল্লীতে বাস করিতেন, তখন এখানে ভদ্রলোকের বসতি হয় নাই। কেবল কয়েক ঘর নমশূদ্র বাস করিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই গ্রামের পূর্ব্বে সাঙ্কাই নদী। নবগঙ্গা নদী হইতে এই নদী খালাকারে বহির্গত হইয়া কটকী বেগবতী ও চিত্রানদীর সহিত যুক্ত হইয়াছে। উত্তর প্রদেশস্থ লোকের দক্ষিণাঞ্চলে গমনাগমন করিবার জন্য একমাত্র পয়নালা সাঙ্কাই নদী। দস্যু জীতু খাঁর অত্যাচারে শত শত লোক সাঙ্কাই-জীবনে জীবন হারাইয়াছে। এই জিথড় গ্রামের নিকটস্থ দুই চারি ক্রোশ মধ্যস্থ জলাশয় তাহার রাজত্ব ছিল। জীতু খাঁর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকা ছিল—সেই নৌকায়

দস্যু জীতু খাঁর অনুচরেরা অবিরত জলপথে ভ্রমণ করিত। যদিও জীতু খাঁ জলদস্যুর রাজা, তথাপি তাহার হৃদয় উন্নত ছিল। এই গ্রামে যে সকল লোক বাস করিত, তাহাদিগের কোন প্রকার অভাবের কথা শুনিলে তাহা পূরণ করিতেন। অনেক সময় গরীব দুঃখীকে অন্নদান করিতেন। তিনি গ্রামে গ্রামে পার্শ্ববর্ত্তীস্থানে যাহাতে লোকালয় স্থাপিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন এবং লোকালয় স্থাপন করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদিগের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। এমন কি, অনেককে চাষের গোরুও কিনিয়া দিয়াছেন, শুনা যায়।

একদিন তাহার অনুচরেরা একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মণ সাহায্য পাইবার আশায় ঐ জীতু খাঁর বাড়ীতে কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইয়া আত্মদুঃখ জ্ঞাপন করিল।

ব্রাহ্মণ উপস্থিত মাত্র জীতু খাঁ, সাদরে আসন প্রদান করিয়া বলিলেন, "আপনি এই ডাকাতের পুরী কিজন্য আসিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণ অতি কাতরবিনম্র বচনে বলিলেন—"আপনার অনুচরেরা আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আনিয়াছে—এমন কি আমার দুগ্ধপোষ্য শিশুর আহারোপযোগী খাদ্য নাই—হয় ত পুত্রটী শীঘ্রই মায়ের কোলে মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইবে। পুত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিবার পূর্ব্বে আমাকে হত্যা করুন।"

এরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে দস্যুপতির পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তৎক্ষণাৎ একজন অনুচরকে আজ্ঞা করিলেন—"ব্রাহ্মণের স্ত্রী ও পুত্র শীঘ্র আমার সমক্ষে আনয়ন কর।"

দস্যুপতির মুখনিঃসৃতবাণী শ্রবণে ব্রাহ্মণের হৃদকম্প উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—"একে ত আমার যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে—তার উপর আবার ব্রাহ্মণী ও পুত্রের উপর অত্যাচারের জন্য অনুচর পাঠাইল।"

দস্যুপতি পুনরায় অনুচরকে ডাকিয়া বলিলেন "খবরদার, ব্রাহ্মণপত্নীর উপর যেন অত্যাচার না হয়।"

দস্যুমুখে এরূপ আশ্বাসবাণী শ্রবণে ব্রাহ্মণের শুষ্ককণ্ঠ কিঞ্চিৎ শীতল হইল। মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতে ব্রাহ্মণপত্নী ও ব্রাহ্মণকুমার দস্যু সমক্ষে আনীত হইল। ব্রাহ্মণকুমারের মুখাবলোকন করিয়া দস্যুর পাষাণ হৃদয় গলিল। দস্যুর ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, মুখকান্তি গম্ভীর হইল, চক্ষু হইতে দুই এক ফোঁটা অশ্রুবারি গড়াইয়া পড়িল—পরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ব্রাহ্মণের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল।

পাঠক মনে করিতে পারেন যে, শত শত নরহত্যা, শত শত ব্যক্তির ধন লুণ্ঠন ইত্যাদি ব্যাপারে, যাহার প্রাণ গলিতনা, সামান্য শিশুর ক্রন্দনে তাহার সেই পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল কেমন করিয়া ? ইহা কি সম্ভবে ?

লোকের স্বভাব কি ? অন্যায় কাজ করিলে, পরে আত্মধিক্কার উপস্থিত অবশ্যই হইবে। অন্যায় কার্য্যের জন্য আপনাকে ধিক্কার আসিবেই আসিবে। তাই, তাহার প্রাণ গলিয়াছিল। আবার হয়ত ঐ পুত্রটীর ক্রন্দন দেখিয়া তাহার মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল যে, আমার ত পুত্র আছে—তাহার উপর যদি কেহ ঐরূপ অত্যাচার করে, তবে আমার মনের ভাব কেমন হয় ? সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণের অপহৃত ধনের দ্বিগুণ ধন তাঁহাকে দিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন।

পাঠক ! মনে রাখিবেন, জীতু খাঁর বিবি জিথড়ে আইসেন না। তিনি ও তাঁহার পুত্র "যাড়ডিয়া" গ্রামে থাকেন। তখন পুত্র সাবালক হইয়াছে, তাঁহার বিবাহ দিয়া জীতু খাঁ কতিপয় বিশ্বাসী অনুচর সমভিব্যাহারে একদিন রাত্রিতে কোথায় চলিয়া গেলেন। অনেকদিন কাটিয়া গেল তবু আসিলেন না দেখিয়া, কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "জীতু খাঁ মরিয়া গিয়াছে"—কেহ বা বলিতে লাগিল— "জীতু খাঁ রাজার হাতে ধরা পড়িয়াছে।" কেহ বলিতে লাগিল—বাঘে খাইয়াছে ?" ইত্যাদি নানা প্রকার কথা উঠিল। যেমন একজন লোকের অনেকদিন সন্ধান না পাইলে লোকে বলিয়া থাকে—আরো আজকালকার সময়ের মত নয়—সে সময়ে এদেশে লোকের বসতি হয় নাই—বাঘ ভালুক ইত্যাদি হিংস্রজন্তুর অভাব ছিল না। বহুকাল কোন সংবাদ না পাইয়া সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল যে, জীতু খাঁ মরিয়া গিয়াছে। এদিকে জীতু মরিয়া গিয়াছে ভাবিয়া, তাহার পুত্র ও স্ত্রী জিথড়ের ঘর বাড়ী আসবাব পত্রাদি যাহা লইবার তাহা লইয়া গেলেন এবং যাহা লইতে না পারিলেন, তাহা বিক্রয় করিলেন। দশ, বার বৎসর পরে জীতু খাঁ পুনরায় দেশে ফিরিলেন। এখন আর জীতু খাঁ সে জীতু খাঁ নয়, তাহার ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার সে তীব্রতা নাই, সে স্পৃহা নাই। এখন তিনি নির্ব্বিকার—ফকির বেশধারী। প্রথমে কেহ তাহাকে চিনিতে পারে নাই, ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিল—ইনিই সেই দস্যু জীতু খাঁ।

কোন দিন জঙ্গলে—কোন দিন নদীতটে—কোন দিন শ্মশানে—কোন দিন পূর্ব্বকথিত অশ্বত্থমূলে—বা কোন দিন পথপার্শ্বে পড়িয়া থাকিতেন। কোন দিন বা কাহারও বাড়ী অতিথি হইতেন, কোন দিন বা ভিক্ষার বহির্গত হইতেন।

তাহার নিকট জাতি-ধর্ম্ম ভেদাভেদ ছিল না। অনেকেই তাহাকে ভক্ত বলিয়া জানিত। কেহ কেহ বা বলিত "এখন বৃদ্ধ হইয়াছে ডাকাতি করিবার সাধ্য নাই, তাই ভণ্ডামির জাল পাতিয়া বসিয়াছে?" যখন সকলে দেখিল যে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের এক কণিকাও সঞ্চিত রাখিতেন না—যখন যা পাইতেন, তদ্দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করিয়া অল্পমাত্র নিজে গ্রহণ করিতেন, এবং অবশিষ্ট অশ্বত্থবৃক্ষ-বাসী কাক চিল, পারাবত প্রভৃতি পক্ষীকুলের মধ্যে ও শিয়াল, কুকুর ইত্যাদি পশুদিগের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেন—অনেকেই দেখিয়াছেন যে, ঐরূপ অন্নদানের সময় পশুপক্ষীগণ তাহাদের বংশগত দ্বেষহিংসা ভুলিয়া গিয়া, ফকিরের চারিদিকে আসিয়া অন্নগ্রহণ করিত। কেহ কেহ বা হস্ত হইতেই অন্নগ্রহণ করিত—এরূপ দেখিয়া শুনিয়াও কেহ কেহ বলিয়াছেন—"এ ভণ্ডামিতে আর ভুলিতেছি না। কুকুরগুলি বশীকরণ শিখিয়া আসিয়াছে তাই জীবজন্তু তাহার বশ হইয়াছে। বকধার্ম্মিকের এ ধর্ম্মতত্ত্বে আর কেহ ভুলিতেছি না। আমরা সহোদর ভাইকে ভালবাসিতে জানিনা—তা আবার কীটপতঙ্গ জীবজন্তু প্রভৃতির ভালবাসারহস্য বুঝিব কেমন করিয়া? বুঝি না বলিয়া বিশ্বাসও করিনা।

কিছুদিনের মধ্যে জীতু খাঁ ফকির বলিয়া চারিদিকে নাম পড়িয়া গেল। চারিদিক হইতে উৎকট রোগ মুক্তির আশায় মোকর্দ্দমা মামলার সুফলের আশায়, হৃত দ্রব্যাদির সন্ধান পাইবার আশায় দলে দলে লোক ফকিরের আবাসে আসিতে লাগিল; এবং প্রতীকার আশায় ফকিরের নিকট ধন্না দিয়া থাকিত। ফকিরের নিকট গেলে ফকির কেবল বলিতেন—"তোমার বিশ্বাস আছে? খোদার প্রতি বিশ্বাস আছে? ভগবানের প্রতি বিশ্বাস আছে?"

তাহার ঔষধের মধ্যে কেবল তুলসীর পাতা, ও তুলসীতলার মাটি ছিল। অধিকাংশ লোকের ব্যাধি আরোগ্য হইত এমন কি ঐ ঔষধ দ্বারা জনৈক কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন শুনা যায়। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। বিশ্বাসের দ্বারা ভগবানকে বাধ্য করা যায়, রোগ ত সামান্য কথা। ফকিরের উপর তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল—তাই তাহাদের ব্যারাম আরোগ্য হইত।

একদিন ফকিরসাহেব জিথড়ে কালীবাড়ী বসিয়া আছেন, পার্শ্বেও কতকগুলি লোক বসিয়া ভজন গাহিতেছে, এমন সময় আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। হটাৎ এক জটাধারী অর্দ্ধ উলঙ্গ সন্ন্যাসী দ্রুতপদবিক্ষেপে ছুটিয়া আসিয়া ফকিরের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "এখনও কার্য্য সমাধা হয় নাই?"

ফকির সাহেব ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন—সপ্তাহাধিককাল সময় দিন।" ইহা বলিতে বলিতে ফকিরসাহেব গাত্রোত্থান করিল, সন্ন্যাসী বংশদণ্ড স্কন্ধে ফেলিয়া পূর্ব্ববৎ দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিলেন—ফকিরও পশ্চাদানুসরণ করিলেন।

ফকিরের পার্শ্ববর্ত্তী লোকমণ্ডলী অবাক হইয়া গিয়াছে—যেন তাহাদিগকে বোবায় ধরিয়াছে, কাহারও একটা কথা সরিল না। দেখিতে দেখিতে উভয়ে নয়নপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন—কিজন্য গেলেন, কেহই বলিতে পারেনা। দুই তিন দিন কাটিয়া গেল তবু ফকির আসিলেন না দেখিয়া, সকলে ভাবিল ফকির চলিয়া গিয়াছে। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল।

তিনদিন পরে ফকির ফিরিলেন—সঙ্গে বহুসংখ্যক কুলি-মজুর। ফকিরের আদেশমত সেই বিস্তৃত মাঠের মধ্যে সরোবর খনন করিল। শুনা যায় ঐ সন্ন্যাসীই নাকি সরোবর খনন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

পাঠকগণ, জনপ্রবাদের যতটুক বিশ্বাস করিতে হয় করুন। এটী কিন্তু সত্য যে, অদ্যাপিও ঐ সরোবরের নাম "জীত খাঁ ফকিরের দীঘি।" জীত খাঁ দেশে ফিরিয়াছেন শুনিয়া তাহার স্ত্রী ও পুত্র বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ফকির সাহেব আর গৃহে ফিরিলেন না। কেবল তাহার পুত্রকে বলিলেন—"বাবা মনে রেখ, অর্থই অনর্থের মূল। এই অর্থের জন্য কত কি করিয়াছি, তার ইয়ত্তা নাই।" জীতখার পুত্রের নাম চাঁদ খাঁ। তিনি যে গ্রামে বাস করিতেন সেই গ্রামের নাম "চাঁদো" হইয়াছে। ফকির জীতখাঁর জাতি ধর্ম্ম ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল না, তাঁহাকে ভক্তিভাবে যে যাহা দিত তাহাই পরিতুষ্ট হইয়া আহার করিতেন। একদিন কতকগুলি মুসলমান তাঁহাকে বলিয়াছিল "আপনি ফকির, আপনি যাহার তাহার ভাত খান কেন! ইহাতে খোদাতালার কাছে গুণাগারি হইতে হয়।"

ফকির সাহেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"ও সব তোমাদের কথা, তোমরা নানা সম্প্রদায়ের লোক লইয়া নানা সাম্প্রদায়িকভাবে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস কর, তাই ওরূপ বল। আমার সমাজ কি বাবা? আমার সব সমান, যখন ঘর দুয়ার ত্যাগ করেছি—তখন সব সমান।"

ফকির সাহেবের এরূপ উক্তিতে তাঁহার উপর কাহার কাহার বীতশ্রদ্ধা জন্মিল, এবং যাহারা একটু শিক্ষিত তাহারা বলিতে লাগিল—"তাইত, ফকি

সকল ত্যাগ করিয়া আল্লার নামে ফকিরই হলো, তবে তার আবার জাত কি?" শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের এরূপ উক্তিতে ফকিরের উপর যাহাদের একটু বীতশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তাহা কাটিয়া গেল।

পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী আসিয়া আচণ্ডাল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ও ভিক্ষুকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখনও এদেশে জলদস্যু জীতু খাঁর ভয় যায় নাই। নানা স্থানে নানা সম্প্রদায়ের লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই নিমন্ত্রণে যোগদান করিল না। যাহারা আসিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অত্যাচারের ভয়ে, কেহ কেহ বা বহুমূল্য অর্থ পাইবার আশায় সরোবর তীরে অশ্বত্থবৃক্ষপাদমূলে সমবেত হইলেন। যাহারা আসিলেন না, তাহাদের মনেও ভয় রহিল—পাছে তাহার নিমন্ত্রণ রাখিলাম না বলিয়া আমাদের উপর অত্যাচার করে। খুব আমোদ প্রমোদ ও দরিদ্রনারায়ণদিগকে অর্থদান প্রভৃতি দ্বারা উৎসব কার্য্য নির্ব্বাহ হইল। সন্ন্যাসীও তাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

পাঠক, আজ আবার শুনিলাম, জীতু খাঁ নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুরসিদাবাদ জেলায় নাকি তাঁর বাড়ী ছিল। মুসলমান তনয়া যাদুবিবির সহিত প্রেমাকৃষ্ট হওয়াতে এবং উক্ত ঘটনা লোকালয়ে প্রকাশিত হওয়াতে জীতুঠাকুর যাদু-বিবিকে লইয়া এ লোকশূন্য জলাভূমিতে বাস করিতে লাগিলেন। আসিবার কালে যে সমুদায় টাকা কড়ি আনিয়াছিলেন, তাহা খরচ হইয়া আসিলে, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কোন উপায় না থাকায়, জীতুঠাকুর দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই কতকগুলি কার্য্যপটু কর্ম্মী অনুচর প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বে নাকি যাদুড়িয়া বাস করিতেন, যখন দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন—তখন এই বর্ত্তমান জিগড়গ্রামে আসিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করেন এবং অনুচরবর্গ সদ্ভাব্যবহারে বাস করিতে থাকেন। যাদুবিবি যাদুড়িয়াতেই ছিলেন—তিনি জিগড় গ্রামে আসেন নাই। যাদুড়িয়া যাইবার অসুবিধার জন্য জিগড় হইতে যাদুড়িয়া পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ রাস্তা প্রণয়ন করেন। উহাকে স্থানে স্থানে জীতুখাঁর জাঙ্গাল ও স্থানে স্থানে যাদুবিবির জাঙ্গাল বলে।

জীতু ফকিরের শেষজীবনী। জীতু ফকির দস্যু বলিয়া আর কেহ বিশ্বাস করে না—এই যে সেই জলদস্যু জীতু খাঁ তাহা যেন লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। দলে দলে লোক তাহাকে গুরুস্থানে বসাইয়াছে। সকলেই তাঁহার শিষ্য হইল। এসময় পূর্ব্বকথিত সরোবরের দক্ষিণমাঠের মধ্যে "কালী"—গাছতলায় তিনি অবস্থিতি করিতেন। তিনি মুসলমানদিগের নিকট আল্লা ও হিন্দুদিগের সহিত কালী

তারা, হরি, কৃষ্ণ ইত্যাদি পৌরাণিক কথা বলিতেন। তখন যাহার গাছে যে ভাল ফল হয়, যাহার গোরুতে প্রথম দুগ্ধ হয়, তাহা ফকিরকে আনিয়া দেয়। ফকিরের উপর সকলেরই বিশ্বাস ঘনীভূত হইয়াছে। সকলেই একবাক্যে ফকিরকে ভগবান জানিত লোক বলিত। যদি কেহ তাহার দস্যুবৃত্তির কথা বলিত, তবে লোকে বলিত "পূর্ব্বজন্মের কোন পাপের ফলে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। রত্নাকরও দস্যু ছিল, তারপর সে রামনামের গুণে তরে গেল।"

ফকির হিন্দুই থাকুন আর মুসলমানই হউন, কিন্তু তাহার যে দীঘি তাহা পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বা। আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে যে, মুসলমানেরাই পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বা করিয়া দীঘি পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করে। তিনি হিন্দুই হউন, আর মুসলমান হউন, তজ্জন্য আমাদের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তাহার শেষ জীবনী অবগত হইলে আর বোধ হয় না যে, ইনিই সেই জলদস্যু জীতু খাঁ। ইহার পর জীতু খাঁর কি দশা হইল, তাহা অদ্যাপিও জানা যায় নাই। কেহ বলেন—ফকির কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। কেহ বলেন, সাঙ্গাই নদীতীরের শ্মশানে ফকিরের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান উক্ত সরোবরের উত্তর তীরে ভবানীপুর ও দক্ষিণতীরে জিগড়গ্রাম অবস্থিত।

ব্রহ্মচারী দেবব্রত।

প্রার্থনা।

শ্রী-চরণে এই আশা কর'হে পূরণ।
রা-খিও অন্তিমে নাথ, এই আকিঞ্চন॥
ম-ঙ্গলময়, কর সুমঙ্গল দীনে হে।
কৃ-পা কর দয়াময় ব্যথিত জনে হে॥
"ষ্ণ-চ দয়া পরাৎপর সারাৎসার।"
প-রম ঈশ্বর তুমি ক'র ভব পার॥
দা-ও হে অভয় (ওহে, ভবভয়হারি।
শ্রি-ত জনারি, জগৎ-স্বামী তুমি (হরি॥)
ত-ব পদ বিনা,—জানি না হে অন্য জনা।
সে-বিতে ছিল হে (মম) মনেতে বাসনা॥
ব-সাইতে শ্রীমূরতি হৃদি সরোজে হে।
কা-মিনী কাঞ্চনে ল'য়ে, মন ভুলেছে হে॥
ধ-ন জন পরিজন সকলি অসার।
ম-জেছি মায়ায়; "রামকৃষ্ণ" কর পার॥

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

কার্ত্তিক, সন ১৩১৭ সাল।
চতুর্দ্দশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা।

বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ।

বৎসরান্তে জগজ্জননী আসিয়া, সন্তানের শোক, তাপ পাপ জ্বালা সমূহ ধৌত করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ, প্রেম ও নবজীবন প্রদান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। জীবনে নববল, নবশক্তি, নব আগ্রহ উদ্বোধিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। পাঠক পাঠিকা! আপনারা স্ব স্ব অন্তরে এ নববল, নবশক্তির উপলব্ধি করিয়া, সকলেই বিশ্বজননীর সন্তান সন্ততি, এই বিশ্বপ্রেম হৃদয়ে ধারণ করিয়া, স্বীয় স্বার্থ, মোহ, মায়া ভুলিয়া মায়ের নামে সকলকে এক বলিয়া ধারণা করিয়া, সর্ব্বভূতের মঙ্গলার্থে আপনাপন শক্তি, সামর্থ্য, অর্থ যথাসাধ্য নিয়োজিত করুন। আনন্দময়ীর আনন্দময় ক্রোড়ে সকলে লালিত পালিত হইয়া, এখন সকলে জগতে আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিতে বদ্ধপরিকর হউন। মায়ের রাজ্য হইতে দুঃখ কষ্ট, দারিদ্র্যতা অজ্ঞানতা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি সমস্ত দূর হইয়া যাক্। মায়ের আগমনের পর আমরা অদ্য আপনাদিগকে যথাযোগ্য প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া, আবার তাঁহার কথা লইয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত, এক্ষণে আপনাদিগের মিষ্টমুখ পাইলে কৃতার্থ হইব।

আত্ম-নিবেদন।

(১)

দিছি মন তাঁর চরণ চিন্তায়,
বাক্য দিছি তাঁর গুণ বরণনে,
দিছি তাঁর গুণ-শ্রবণে শ্রবণ,
দিছি কর তাঁর মন্দির মার্জ্জনে।

(২)

দুটী আঁখি মোর দিয়েছি তাঁহার,
চিদানন্দময় রূপ-দরশনে,
ক'রেছি নিযুক্ত এ অঙ্গ তাঁহার,
ভকতগণের অঙ্গ পরশনে।

(৩)

তাঁর পাদ-পদ্ম সৌরভ গ্রহণে,
নাসিকা নিযুক্ত র'য়েছে সদায়,
তাঁরে নিবেদিত প্রসাদ-গ্রহণে,
ক'রেছি অর্পণ মম রসনায়!'

(৪)

চরণ দুইটী দিয়েছি আমার,
পূত-ক্ষেত্রে তাঁর সদা বিচরণে,
দিয়েছি মস্তক লুণ্ঠনের তরে,
নাথের আমার ও রাঙ্গা-চরণে।

(৫)

যা' কিছু আমার দিয়াছেন তিনি,
সবি ত তাঁহারে ক'রেছি অর্পণ,
প্রাণ!—প্রাণ দিয়ে সকলের আগে,
ক'রেছি অর্চনা তাঁহার চরণ।

(৬)

প্রভু তিনি এই দেহ-সংসারের,
দাস তাঁর মম ইন্দ্রিয় নিচয়,
প্রভুর আমার "বৈঠক-খানাটী,"
দিয়াছি করিয়ে মম এ হৃদয়।

শ্রীভোলানাথ মজুমদার।

শ্রীরামকৃষ্ণের নবভাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২৯ পৃষ্ঠার পর)

রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম কেবল শিক্ষার বিষয় নহে, উহা সাধনের সামগ্রী। কিছু শিক্ষা করিতে হয় এবং কিছু সাধন করিতে হয়। কোন প্রকার উদ্দেশ্য-বস্তু প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে প্রক্রিয়া বা কার্য্যানুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে সাধন কহে। ঈশ্বর সাধনার উদ্দেশ্য ঈশ্বরই হওয়া [illegible]। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে হইলে যে কার্য্য করা যায়, তাহাকে সাধন বলে। সাধন প্রণালী দুই ভাগে বিভক্ত; যথা সগুণ বা ভক্তিসাধনা, এবং নির্গুণ বা জ্ঞানসাধনা। সগুণ সাধনায় সাধক গুণযুক্ত হইয়া গুণ-যুক্ত ভগবানের উপাসনা করেন, ইহা পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক মত; নির্গুণ সাধনা বৈদান্তিক নিয়মাধীন। সাধন না করিলে সাধ্যবস্তু লাভ হয় না। যাঁহার সাধনা নাই, তাঁহার ধারণাও নাই; সুতরাং কোন বস্তুর ধারণা না থাকিলে, সে বস্তুর কথনও স্মরণ হইতে পারে না। স্মরণ হইবে বলিয়া, নানাবিষয় আমরা ধারণা করিয়া রাখি। এ প্রকার ধারণা সাধনা ব্যতীত কখনও হয় না। ঈশ্বর সাধনা না করিলে, তাহা স্মরণ হইতে পারে না; এই জন্য ঈশ্বর সাধনা ব্যতীত ঈশ্বরের বিষয় কথনও মনের অধিকার ভুক্ত হইতে পারে না। এবং এই নিমিত্তই গৌরাঙ্গদেব নাম সাধনা দিয়াছেন। সাধন কার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত ত্রিগুণের মধ্যে সত্বই শ্রেষ্ঠ, এবং তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না হইলে, ঈশ্বরের সহিত কোন সম্বন্ধই হইতে পারে না। কারণ, সত্বের মাধুর্য্যভাব, রাজার ঐশ্বর্য্যভাব এবং তমোর তামসিক ভাব।

মাধুর্য্যভাব না আসিলে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করিবার পথ পাওয়া যায় না। সত্ত্বগুণ সুখপ্রদানের একমাত্র হেতু স্বরূপ। ইহার দ্বারা ছয়প্রকারে সুখী হওয়া যায়;—১ প্রসন্নতা, ২ সন্তোষ, ৩ প্রীতি, ৪ নিঃসংশয় বা নিশ্চিৎ-জ্ঞান, ৫ ধৃতি অর্থাৎ ধারণা এবং ৬ স্মৃতি অর্থাৎ অনুভূত বিষয় জ্ঞান। তন্মধ্যে প্রীতি অর্থাৎ তৃপ্তিলাভ করা, মনের পূর্ণভাবের লক্ষণ বিশেষ; যতক্ষণ অসম্পূর্ণ থাকে, মন ততক্ষণ কথনই নিশ্চিন্ত হয় না। যখন মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, তখনই তৃপ্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তৃপ্তি না জন্মিলে মনুষ্যের শান্তি আসিতে পারে না। শান্তিই সকলের মনের একমাত্র অভিলাষ। সাধনা সম্পূর্ণ মনের কার্য্য, নির্জ্জনের কার্য্য।

ঈশ্বর সাধনায় ধ্যান, নামজপ এবং বকলমা, তিনটী স্বতন্ত্র শব্দ হইলেও এবং তিনটী শব্দের স্বতন্ত্র কার্য্য হইলেও উহাদের উদ্দেশ্য একই প্রকার। ধ্যানের উদ্দেশ্য ভগবান, নামের উদ্দেশ্য ভগবান এবং বকলমারও উদ্দেশ্য ভগবান। মনের ভাবকে উদ্দেশ্য কহে। অতএব এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন সাধনার তাৎপর্য্য একভাবেই পর্য্যবসিত হইতেছে। এই ভাব মনের, সুতরাং উক্ত ত্রিবিধ কার্য্যে মনের সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ধ্যান অর্থে মনোমধ্যে কোন বস্তু বা বিষয় লইয়া ভাবনা করা। ঈশ্বর বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয় সম্বন্ধে মনের ঐরূপাবস্থার নাম চিন্তা এবং ঐ চিন্তা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রয়োগ হইলে ধ্যানপদবাচ্য। অতএব মনের ভিতরে ভগবান ভাবনা করিবার নাম ধ্যান। ধ্যানে মনের কার্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে, কারণ মুখে নাম করিলেও, নাম কেবল মৌখিক বিষয় হয় না, উহাতে মনের অধিকার সম্পূর্ণ থাকে; নাম করিবার পূর্ব্বে মনের ভিতরে নামের তাৎপর্য্য বোধ অবশ্যই হইয়া থাকে। মনের সহিত নামের সম্বন্ধ ব্যতীত যে নামোচ্চারণ করা যায়, তাহাকে নাম সাধনা বলা যায় না। ধ্যানের যোগ্যতা লাভ করিবার নিমিত্ত সাধক সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। জপে সিদ্ধ হইলে তিনি ধ্যানের অধিকারী হইতে পারেন। জপের উদ্দেশ্য ও কার্য্য যেরূপ, নামের উদ্দেশ্য ও কার্য্যও সেইরূপ। জপ এবং নাম একই প্রকার, কেবল সাধনায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়। জাপক সর্ব্বাগ্রে মুখে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে শিক্ষা করেন, মন্ত্র সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ হইলে ক্রমে তাহা মনে প্রবেশ করিয়া থাকে। সাধক যখন মনে মনে মন্ত্রজপ করিতে সক্ষম হন, তখন তিনি ধ্যান করিবার অধিকারী হইয়া থাকেন। অতএব ধ্যান বলিলে সাধকের সাধনার তৃতীয় অবস্থা

বুঝাইয়া থাকে; প্রথম মুখে মন্ত্র জপ বা নাম করা, দ্বিতীয়াবস্থায় উহা মনে মনে জপ করা এবং তৃতীয়াবস্থায় মন্ত্র বা নাম, অথবা মন্ত্র এবং রূপ মনের সহিত একাকার হইয়া যাওয়া, এই অবস্থাকে ধ্যান কহা যায়। নাম সাধনায় ভগবানের নাম লইয়া উপর্য্যুপরি উচ্চারণ করিতে হয়, এ কার্য্যটী ঠিক জপের ন্যায়। নাম বলিতে বলিতে ক্রমে উহা মনোময় হইয়া যায়, তখন নাম সাধকের অবস্থার সহিত ধ্যানীর বিশেষ কোন প্রভেদ থাকে না। ধ্যানীর মনে ভগবানের রূপ বা নাম, নাম সাধকের মনেও নাম এবং রূপ। অতএব এই দুই সাধকের ভাব এক প্রকার।

ধ্যান, নাম ও বকলমা এই তিনটির কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, নাম এবং বকলমা ধ্যানের হেতু বিশেষ। কারণ, ধ্যান করা সাধকের প্রথম সাধনা নহে। বকলমায় আত্মনিবেদনের ভাব আছে। বকলমায়ও রূপ এবং নাম। এই সাধনাও সম্পূর্ণ মানসিক। কারণ ভগবানে আত্মোৎসর্গ করিতে হইলে, প্রথমে ভগবান্ বলিয়া ধারণা হওয়া চাই; এরূপ বিচার মুখের কার্য্য নয়, তাহা মনের দ্বারা সাধিত হয়। মন যখন এই প্রকার বিচারে লিপ্ত থাকে, তখন তাহাকে ধ্যান কহা যায়। বিচার অবসান হইলে, আত্মোৎসর্গ করিবার পর মুখে ভগবানের নাম এবং মনে তাঁহার রূপ বিরাজিত থাকে। এই নিমিত্ত তাহা মনের কার্য্য বলিয়া সে অবস্থাকেও ধ্যান বলা কর্ত্তব্য। বকলমায় আত্মনিবেদনের ভাব আছে। যাঁহাদের সাধনাদি করিবার শক্তি নাই, তাঁহাদের পক্ষে বকলমার বিধি বিধায় তথায় মানসিক কার্য্য নাই বলিয়া সাব্যস্ত করা বিধেয় নহে। বকলমায় যদিও সাধনা বলিয়া কোন বিশেষ প্রকার মানসিক কার্য্য করিতে হয় না, কিন্তু যাঁহাতে আত্মনিবেদন করিতে হয়, বা বকলমা দেওয়া যায়, তাঁহাতে সর্ব্বক্ষণ মন লিপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তথায় মনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। ধ্যানেই হউক, নামেই হউক, এবং বকলমায় হউক, মনের সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্যই হইবার সম্ভাবনা নাই। ধ্যান, নাম এবং বকলমা, এই তিনটী মনের কার্য্য বলিলেও সাধনায় তাহাদের সম্পূর্ণ পার্থক্যভাব লক্ষিত হয়। এইজন্য সাধক মাত্রেরই ধ্যান করা অনিবার্য্য।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক ভক্ত উপদেশ দিয়াছেন যে "বকলমা অর্থে আত্ম-সমর্পণ। ভগবানের প্রতি নির্ভর করা। অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আত্মবিক্রয় করা। যদ্যপি এইটী বোধ হয় যে, আমি তাঁহাতে মন প্রাণ অর্পণ করিলাম, তিনি যাহা করিবার করিবেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই উদ্ধার

করিবেন। আমি যদি আমার জীবন মন প্রাণ আপনাতে সমর্পণ করি, আপনার সাধ্যমত আপনি আমার উপায় করিবেন না? ইহা তো সৎ মনুষ্যে করিয়াই থাকে। আর ঠাকুর রামকৃষ্ণের উদ্ধার করিবার শক্তি আছে, একথা যিনি বিশ্বাস করিয়া তাঁহাতে মন প্রাণ সমর্পণ করিবেন, তাহার উপায় (উদ্ধার) তিনি করিবেনই করিবেন। মন প্রাণ সমর্পণ করা কাহাকে বলে? সতী স্ত্রী যেমন স্বামীতে মন প্রাণ দেয়, সেইরূপ।"

রামকৃষ্ণদেব উপদেশে বলিয়াছেন যে "যে যেরূপেই উপাসনা করুক না কেন, তাহার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির বিঘ্ন হইবে না। অর্থাৎ যে যেরূপে, যে ভাবে যেমন করিয়া উপাসনা বা সাধনা করিবে, সেইরূপে, সেই ভাবে এবং তেমনই কার্য্যের দ্বারা ভগবানকে লাভ করিবে। এইজন্য অধিকারী, অনধিকারী বিবেচনায়, তিনি যুগধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। যুগধর্ম্ম বলিলে, যে ধর্ম্ম সর্ব্ব সাধারণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকে বুঝায়। সত্যকালের সাধনার সহিত পর-বর্ত্তী যুগত্রয়ের সাধনার তুলনা হয় না। তাহার কারণ, কলিকালে অন্নগত প্রাণ, আহার করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, অসুস্থতা রাখিবার স্থান থাকে না। এ অবস্থায় কি কখন আয়াসসাধ্য সাধন সম্ভবে? কেমন করিয়া একপ্রকার সাধন সত্য এবং কলিযুগের নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে? এই নিমিত্ত যুগ-চতুষ্টয়ের ভিন্ন ভিন্ন যুগধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এবং এই নিমিত্তই সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে সেবা এবং কলিতে নাম সাধনার দ্বারা জীবের পরিত্রাণ পাইবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। দেশ কাল, পাত্র এবং উদ্দেশ্য অনুসারে ঈশ্বর সাধনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং এইজন্যই কলির অন্নগত প্রাণ দুর্ব্বল জীবের জন্য কেবলই নামযজ্ঞ নির্দ্ধারিত।

"হরেনাম হরেনাম, হরেনামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

তাই সাধক গাইয়াছেন :—

"নামে কত সুধা, কত মধু, কতই আরাম।
কতই আরাম নামে, কতই আরাম॥
যার আছে নামে ভক্তি, সে জেনেছে নামের শক্তি,
ভক্তিভরে নিলে নাম, কভু নহে বাম।
কার দুঃখ যায় নাই ঘুচে, কার অশ্রু যায় নাই মুছে,
কার প্রাণে যায় নাই থলে, পাপের সংগ্রাম।

হরিনামের গুণ সুধাও তাঁরে, ভাসে যে অশ্রুধারে,
কেন তাঁর অশ্রুধার, বহে অবিরাম।
নামের গুণ বলব কত, নামে মত্ত সাধু ভক্ত যত,
আহা কি আনন্দ রস পানে, তাঁরা পূর্ণকাম॥

রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম যে পর্য্যন্ত কোনপ্রকার সঙ্কল্প বা ইচ্ছা না করেন, সে পর্য্যন্ত তিনি এক অদ্বিতীয় ভাবে অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ভাবে। তখন সৃষ্টি বলিয়া কিছুই থাকে না। যখন পরমাত্মা সঙ্কল্প করেন, সেই সময় তিনিই ভিন্ন ভিন্ন রূপে আপনি প্রকটিত হইয়া থাকেন। সঙ্কল্পযুক্ত পরমাত্মাকে জীব কহে, এবং সঙ্কল্পবিহীন জীবই পরমাত্মা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। প্রভু বলিয়া গিয়াছেন, যেমন কুলমহিলারা চিক্ আশ্রয় করিয়া বিষয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করেন, তেমনই আত্মা এই পাঞ্চভৌতিক দেহরূপ চিক আশ্রয় করিয়া পৃথিবীতে বিহার করিতেছেন। যতক্ষণ কুলবধূ চিকের পার্শ্বে উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণ চিকের অপরদিকে মনুষ্যের কথা শুনা যায়। কিন্তু তিনি যখন তথা হইতে প্রস্থান করেন, তখন শত সহস্রবার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার প্রত্যুত্তর আসিতে পারে না। সেই প্রকার দেহ ছেড়ে আত্মা চলিয়া গেলে সেই দেহের কার্য্য তখনই স্থগিত হইয়া যায়। আত্মা এবং দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ। যেমন জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া নববস্ত্র পরিধান করা যায়, অথবা এক গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্য গৃহে প্রবেশ করা যায়, তেমনই এক দেহ হইতে আত্মা দেহান্তরে গমন করিয়া থাকেন।

পরমাত্মা সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া জীবরূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। যতদিন সঙ্কল্প থাকে, ততদিন জীবলীলায় অভিভূত হইয়া থাকেন। জীব বলিলে সঙ্কল্পযুক্ত পরমাত্মাকেই বুঝায়। এই অবস্থায় পরমাত্মার সঙ্কল্প প্রবল থাকে। তন্নিমিত্ত জীবের ভিতরে যে পরমাত্মা বসতি করেন, তাঁহাকে জীবাত্মা কহা যায়। যেমন কার্য্য বিভিন্নতায় উপাধি লাভ হয়। পরমাত্মাও উপাধিগ্রস্থ হইলে, উপাধি হিসাবে জীবাত্মা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সঙ্কল্পের দ্বারা প্রত্যেক নরনারীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সঙ্কল্পের দ্বারা নরনারী সাধু হয়, সঙ্কল্পের দ্বারা নরনারী খুনী হয়, লম্পট ও বেশ্যা হয়। সঙ্কল্পই যাবতীয় পরিবর্ত্তনের নিদান। সঙ্কল্পের আশ্রয় লইয়াই ব্রহ্মের সাময়িক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যেমন জালারূপ সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া দিলে, জালাস্থিত বায়ু ভূবায়ুর সহিত একাকার হইয়া যায়, সেইরূপ জীব দেহ হইতে আত্মা আত্মবুদ্ধি অপসৃত হইলে অর্থাৎ জীব

সঙ্কল্প বিহীন হইলে, জীবাত্মা আশ্রয়চ্যুত হইয়া পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যান। জীবের দেহ লইয়া সঙ্কল্পের সঞ্চার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এই দেহ জ্ঞানকে অহঙ্কার বলে। অহঙ্কার দুইরূপে কার্য্য করে। দেহ লইয়া এবং দেহ ছাড়িয়া। দেহ লইয়া যে অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়, তাহারই নাম সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্পযুক্ত নর নারী জীবশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।

উপরি উক্ত বিচার দ্বারা এই বুঝা গেল যে, পরমাত্মা সঙ্কল্পাবদ্ধ হইলে তাঁহাকে আত্মা কহে। প্রত্যেক জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গম, পরমাত্মার সঙ্কল্প প্রসূত পদার্থ। প্রত্যেক বস্তুই আত্মা। অতএব পরমাত্মা এবং আত্মা বলিলে সঙ্কল্পবিহীন এবং সঙ্কল্পযুক্ত পরমাত্মাকেই বুঝায়। যে সময়ে তাঁহার সঙ্কল্প না থাকে সে সময়ে তিনি পরমাত্মা, সঙ্কল্প যুক্ত হইলেই তাঁহাকে আত্মা কহা যায়। যাঁহারা আত্মা বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা পরজন্ম মানেন না; সুতরাং তাঁহাদের আত্মার উন্নতি অবনতির দিকে দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যকতা থাকেনা। যাঁহাদের এইপ্রকার ধারণা ও বিশ্বাস, তাঁহারা সংসারের পক্ষে অতি ভয়ানক জিনীস। তাঁহাদের নিকট সম্বন্ধ বিচার থাকেনা, তাঁহারা অবাধে যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়া যাইতে পারেন। হিন্দুমতে আত্মা বিশ্বাস করিবার কথাও আছে, আবার বিশ্বাস না করিবার কথাও আছে। এক পক্ষ বলেন যে, কর্ম্মফলের দ্বারা আত্মার উন্নতি অবনতি হইয়া থাকে। যিনি যেমন কর্ম্ম করেন পরজন্মে তিনি তেমনই অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই কর্ম্মকাণ্ডের বহুল ব্যবস্থা আছে। জ্ঞানকাণ্ডের মতে বাহ্য জগৎ মায়া বিশেষ, সুতরাং তাহার কার্য্যকলাপ সমুদয় অলীক। যেমন যাদুকর সত্য, কিন্তু তাহার ক্রিয়া ভেল্কী বিশেষ। এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই সত্য, তিনি যাদুকর বিশেষ, ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার রঙ্গস্থল। প্রত্যেক পদার্থ সেই পরমাত্মার পরিচয়। আত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া যে ভ্রম হয়, তাহা বাস্তবিক ভ্রমেরই কথা। এই নিমিত্ত জ্ঞানবাদীরা 'সোহং' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। জ্ঞানমতে সকলই "আমি এবং আমার"; লীলা বা ভক্তিমতে "তুমি এবং তোমার" অর্থাৎ হে ঈশ্বর, এই সৃষ্টির কর্ত্তা তুমি এবং ইহা তোমারই সৃজিত। সুতরাং এই শেষোক্ত মতে সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃজিতভাব আছে। উভয়ই সত্য, কারণ স্থূলে বহু এবং মহাকারণে এক। মহাকারণ অর্থাৎ পরমাত্মায় বহুভাব থাকেনা, জ্ঞানবাদীরা সেইজন্য সর্ব্বত্রে পরমাত্মাকে অনুভব করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআনন্দগোপাল সেন, বি, এ।

অমৃত আলয়।

(১)

দগ্ধ ত্রিতাপতাপী হে সংসারি, এস এ অমৃত আলয়ে,
(হেথা) রাজে শান্তি তৃপ্তি, সুখ, প্রেমানন্দ, ভক্তি (ও) বৈরাগ্য—ছয়ে।
যথা ব্রজধাম শ্যামমূর্ত্তি বুকে, বহিছে যমুনা কলধ্বনি মুখে,
ব্রজবাসীগণ আছে মন সুখে,—রাধাকৃষ্ণ জয় জয়ে,
(হেথা) "তারিণী" "গঙ্গে" "রামকৃষ্ণপ্রভু" উজলিয়া আছে ত্রয়ে।

(২)

বিমলা জাহ্নবী তুলিয়া উজান, মধুর বহিয়ে যায়,
চুম্বিয়া চারু অমৃত-আলয়, জলধির পানে ধায়।
গোলাপ মল্লিকা করবী টগর, জবা বেলা যুঁই কুসুমের থর,
রাজ্ঞী প্রকৃতি সাজায়ে বাসর, বিহ্বল সাধনায়—
বিশ্বরাজন্ চৌদিকে ভাসি (যেন) ধরা দেন আপনায়।

(৩)

প্রকৃতির কোলে রতন প্রদীপ, মন্দির মনোহর,
কৌমুদীপ্লাবিত নভোমধ্যভাগে, শোভে যথা শশধর:,
তটচুম্বিত জাহ্নবীর নীর, চুম্বিত তট মোহন-মন্দির,
দ্বাদশ মহেশ লিঙ্গশরীর সারি সারি শোভাকর,
অমৃত-আলয় কালীকার বাড়ী, নমি সে দক্ষিণেশ্বর।

(৪)

বিস্তৃত প্রাঙ্গন চারিভিতে ঘেরি, মাঝে রাজে শ্রীমন্দির,
মন্দির মাঝারে নীলকাদম্বিনী, মধুরূপ তারিণীর।
রক্তউৎপল চরণ কমল, রসনা ওষ্ঠ বান্ধুলীর দল,
অলঙ্কারে দেবী মধুর উজ্জ্বল, মুকুটে শোভিত শিব ;
লেখনিরে, তুই নারিবি ফোটাতে, মধুরূপ জননীর।

(৫)

প্রস্তর-বেদী রজত পদ্মে রজগিরি সংজ্ঞাহারা,
উরসে নাচিছে ভ্রুকুটিহাসিনী মুক্তকুন্তলা তারা।
নরশিরে শিরে কণ্ঠে মালিকা, অসিকরে শ্যামা ক্ষুদ্র বালিকা,

বসনা চাপিয়া দশনে কালিকা, উন্মাদী উল্লাসী পারা ;
উর্দ্ধমুখী শিবা দুভাগে লুলুপা, পিযায রুধিব ধাবা।

(৬)

কোমলা কঠিন, মধুময়ী ভীমা, মূবতি কি মনোহব,
ত্রিনয়ন দীপ্তি দানিতেছে তৃপ্তি, মবি কি মধুবতর ,
(পদে) মবেনি মহেশ মৃত্যুঞ্জয তাই,
শৈলজে! পবাণে বড ব্যথা পাই,
পুনঃ মুখ হেবি সব ভুলে যাই,
পদ শোভা দুঃখকব,
(বুঝি) মুগ্ধধ্যেযানে ভোলানাথ মবি, (ধবি) চবণ উবস পর।

(৭)

প্রাঙ্গন মাঝাবে হেথা হোথা মধু,—অমৃত আলয় মবি,
অনন্ত মাধুবী "শ্রীবাধামাধব" বাজিছে শ্রীরূপ ধরি।
গলে বনমালা তিলক শোভন, নবঘন শ্যাম মুবলীবদন,
ত্রিভঙ্গিমঠাম গোপিনী-বঞ্জন, আঁকা বাঁকা পদতবী—
হে ভবনাবিক! ভবসিন্ধুপাবে, পদতরী দিও হবি!

(৮)

প্রাঙ্গণ-বুকে শান্তিময় গেহে "বামকৃষ্ণ প্রাণাবাম"
দুভাগেতে দুটি সমযোগ্য-মণি "শ্রীরাম" "নরেন্দ্র" ঠাম।
উপাধানে মধু মুগ্ধকরি রূপ, প্রাণাবাম প্রভু ধ্যানমগ্ন চুপ,
দীনবেশী নাথ ভক্তপ্রাণভূপ, জপে ভক্ত মধু নাম।
মধুময় নাথ, মধুময় প্রাণে, রাজিলেন মধু ধাম।

(৯)

ভকত-চাতক তৃপ্তি সাধন, বামকৃষ্ণ প্রেমার্ণব,
মধুময় স্থানে মধুময় প্রাণে, মধুময় হোলো সব।
(যবে) জাহ্নবীর ঘাটে আকুল ক্রন্দন,
(তবে) মন্দির মাঝারে তারার পূজন,
পঞ্চবটীবনে শ্যামার সাধন, মুখে মা তারিণী রব,
(তুমি) প্রেম অবতার দয়ার্ণব নাথ, গোলোকের শ্রীমাধব।

(১০)

মধু পঞ্চবটী শান্তির আলয়,
　　পল্লবে অনিল বয়,
মুখরিত কভু বিহগের গীতে,
(কভু) নিঝুম মধুময়।
শ্যামল-সুন্দর কি শোভা তরুর,
শাখা প্রশাখায় মূলেতে প্রচুর,
ঢাকিয়া রেখেছে বেদীটি বিভুর,
　　ভাবে ভবি সদা রয়,
জয় মা তারিণী, জয় রামকৃষ্ণ,
　　রাণী রাসমণি জয়।

(১১)

বিল্বতরুতলে সাধনায় সিদ্ধি,
　　মহাতীর্থ শোভামান।
শান্তি পবিত্রতা আবাহন ছায়ে,
　　তোষে তরু তৃষি প্রাণ।
নিঝুম ঘোঁরা রজনীর কোলে,
সাধনায় প্রভু মধু 'মা' 'মা' বোলে,
বিশ্বজননীর প্রাণ গেল গোলে,
　　মহাতীর্থ দেবোদ্যান,
মহালীলা-স্থল নীরবে গাহিছে—
　　অতীত মধুর গান।

(১২)

শৈশব উষা হারায়েছে কবি,
　　বাল্য প্রভাত গিয়েছে,
প্রখর মধ্যাহ্ন যৌবন দিবা,
　　গ্রাসিয়া বদন খেয়েছে,

প্রবল প্রতাপী ছয়টি কুলোক,
আছে দেহে মোর ছ'টি ছিনে-জোক,
মায়া বাসনায় ঢাকা দুটি চোক,
অলসতা মোরে পেয়েছে,
মন বীণে মোর চির তরে বুঝি,
বিষাদ রাগিণী গেয়েছে।

(১১)

অলসতা দাও ছোটায়ে আমার,
দীপ্তি দাও মোর চোকে,
ধৈর্য্যশক্তি দাও, হৃদয়ে আমার,
খসাই ছয়টি জোকে,
সহি কত জ্বালা ভস্মীভূত প্রাণ,
জ্বলিতেছি নাথ পড়িয়া কুস্থান,
এ সংসার গৃহ বিষের সমান,
ভেঙ্গেছে হৃদয় শোকে—
জ্বলে পুড়ে নাথ, হয়েছি উদাস,
শ্রীচরণে রাখ মোকে।

শ্রীসুশীলমালতী সরকার।

মাতৃমূর্ত্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১৫ পৃষ্ঠার পর)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

উন্মাদিনী প্রবল ঝড়ের ন্যায়, সহসা কুটীরে প্রত্যাগত হইলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে অবাক হইলেন! তিনি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন,—এক সন্ন্যাসী তাঁহার কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন, আর অতি ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু করিয়া তাহাকে দুগ্ধ পান করাইতেছেন।

রুক্মিনীর পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। এক গভীর দীর্ঘশ্বাস তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিল! যেমন গুহাবদ্ধ

বায়ু সহসা উন্মুক্ত হইলে, গম্ভীর শব্দ হয় এবং সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই গুহার ভারও লাঘব হয়, এই দুঃখিনীর দুর্ব্বিসহ যাতনাজড়িত দীর্ঘশ্বাসও তেমনি সকলকে চমকিত করিল, কিন্তু সেই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কি এক চিন্তা-ভারও অন্তর্হিত হইল। তিনি কিছুই বলিলেন না, কিছুই বলিতে পারিলেন না, বুঝি সে শক্তি তাঁহার ছিল না। তিনি কন্যাকে সুস্থ দেখিয়া, ধীর পদক্ষেপে তাঁহার ঠাকুর ঘরে গেলেন।

দেখিলেন, মৃণ্ময় দীপ হইতে যে আলোক-রশ্মি সে গৃহ আলোকিত করিতেছিল, সে আলোক অতি বিচিত্র, বুঝি শারদ-কৌমুদীও তাহার নিকট ম্লান হয়! তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি আরও দেখিলেন, সেই শুভ্র স্নিগ্ধ আলোকে, তাঁহার গৃহদেবতা সেই শালগ্রামশিলা কি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছেন। তুলসীচন্দনে কে তাঁহার পূজা করিয়াছে, ধূপ ধূনা ও বিচিত্র কুসুম-সৌরভ তিনি স্পষ্ট অনুভব করিলেন! তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, হস্ত বদ্ধাঞ্জলি হইল, অন্তরেও যেন সেই শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন! তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে যাইয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সে কি মূর্চ্ছা? না অন্তরের যোগ! তিনি উঠিয়া বসিলেন, বর্ষার বারি-ধারার ন্যায় তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ঠাকুর তুমিই সত্য! দয়াময়, তুমি না রাখিলে, এ অকূলে কে আমায় রক্ষা করিত! আমি ধৈর্য্যহীনা, অবলা রমণী, তোমার শক্তিতে বিশ্বাস করি নাই! সেই বিরাট কৌরব-সভায়, বিবসনা দ্রুপদ-তনয়ার লজ্জা তুমিই রক্ষা করিয়াছিলে! আমি কীটানুকীট, তুমি মহান, আমি তোমার পরীক্ষা চাহিয়াছিলাম। আমি পাপিষ্ঠা, আমার পাপের সীমা নাই, কিন্তু তুমি পতিত-পাবন, পাপিষ্ঠাকে তুমি চরণে স্থান না দিলে পাপীর গতি নাই!"

সন্ন্যাসী সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সুমধুর উপদেশে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—মা, আর একবার যখন তুমি অতিথিরূপে আমায় দেখেছিলে, তোমায় ত বলেছিলাম—দুঃখের ভার যখন বড় বেশী হয়, শক্তিতে আর কুলায় না, ভগবান নিজে সে ভার গ্রহণ করেন। তোমার সময় আসিয়াছে, তুমি বিধাতার দয়া পাইয়াছ। তিনিই দয়া করিয়া, এই সময়ে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।

দুঃখিনী কাঁদিতেছিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতেই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, পদ-ধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"বাবা, এ সময় তুমি না আসিলে আমার কি হইত!"

সন্ন্যাসী। মা, তাও কি হয়? বিধিলিপি নিতান্তই অখণ্ডনীয়। তুমি পুণ্য-প্রতিমা, সতীকুললক্ষ্মী, অন্নপূর্ণারূপে অন্নদানে, স্নেহদানে, প্রাণবিসর্জ্জনে জগতে অশেষ কল্যাণ করিবে, তোমার পরিণাম এমন হইবে কেন মা! ভগবানের যে মঙ্গলময় ইচ্ছা, তার কাছে তোমার আমার প্রাণপণ সংগ্রাম অতি তুচ্ছ! তুমি আমি ইচ্ছা করিলেই পাপের অনুষ্ঠান করিতে পারি না; পুণ্যের পথ অতি সরল, প্রাণের স্বাভাবিক গতি সেই পথেই ধাবিত; অথচ কত কষ্ট করিয়া, বুঝি প্রাণ বিনিময়েও পাপের পথে অগ্রসর হইতে হয়!—সে দুর্লক্ষ্য কর্ম্মফল বৈ আর কি! ভগবানের যদি সেই অভিপ্রায় থাকিত, তবে আজ, এমন সময়, এখানে আসিবার আমাদের এত আগ্রহ হইত না। গোপাল বহুকাল পরে প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া, তাহার প্রাসাদে না গিয়া, আজ তোমার কুটীরে আসিবে কেন? মা—মা—কেঁদোনা, সময় না হইলে কেহ তাঁহাকে পায় না! তুমি ভাগ্যবতী, তাঁহাকে পেয়েছ! তুমি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ, ধর্ম্মও তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, যে ধর্ম্মনাশ করে, ধর্ম্মও তাহাকে নাশ করেন।

"না না বাবা, আমি দুঃখিনী, আমি কি করিতে পারি।"

"দুঃখীই জগতের কল্যাণসাধন করিবে। রত্নসিংহাসনে বসিয়া, ভোগ বিলাসের মধ্যে থাকিয়া কেহ জগতের কল্যাণ চিন্তা করে নাই। যে রত্নসিংহাসনে বসিয়া পৃথিবীর সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, মঙ্গল অমঙ্গলের কথা ভাবিয়াছে, সে বাহ্যচক্ষে রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট, কিন্তু অন্তরের অন্তরে তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী! আত্ম-চিন্তা হইতে তিনি বিরত, বিরাট বিশ্বই তাঁহার আপনার! কেবল একার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ নহে, বিরাট বিশ্বের সুখ দুঃখে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ! মা, ধর্ম্মের উপদেশ আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা বুঝাইবার পরে বুঝাইব, এখন আসিয়া তোমার কন্যাকে কোলে কর।"

দুঃখিনী ঠাকুর প্রণাম করিয়া উঠিলেন। কন্যাকে কোলে লইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখিনীর কন্যা অতি অল্পেই সুস্থ হইল। বস্তুতঃ আহারের অভাবই তাহার রোগের প্রধান কারণ। কিন্তু আমার মনে হয়, বিধাতার আশীর্ব্বাদ সে বিশুষ্ক কুসুমকলি সঞ্জীবিত করিয়াছিল। তাঁহার করুণায় দুঃখিনীর সে বিক্ষিপ্তচিত্ত আবার শান্ত হইল, বুঝি মুহূর্ত্তের জন্য তিনি ভাবিয়াছিলেন—এ জগতে করুণার

লেশ নাই—দানবের নির্ম্মমতাই সংসারের একমাত্র উপাদান! কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব তিরোহিত হইল, তাঁহার বিশাল হৃদয়ে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল, মুহূর্ত্তের চিত্তবিভ্রম মুহূর্ত্তেই বিলুপ্ত হইল!

সে রাত্রে তাঁহার নিদ্রা আসিল না। আকাশে তখনও অন্ধকার। কন্যাকে বক্ষে রাখিয়া, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক এক করিয়া নানা কথা মনে জাগিল। স্বামীর মৃত্যু হইতে আজ পর্য্যন্ত এক দিনের একটী কথাও তিনি ভুলিতে পারেন নাই। দুটী অন্নের জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছেন, অনশন উপবাস সে সকলই সহিয়াছিল, অনশনে দুধের বাছা, সংসারের একমাত্র বন্ধন, জীবনের শেষ অবলম্বন, মৃত্যুমুখে পতিত, সংসার একবার দেখিল না, একবার কেহ করুণানেত্রে চাহিল না, এ দুঃখও তিনি সহিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু লোকে অযথা গালি দিয়াছে, কুলটা বলিয়া ঘৃণা করিয়াছে, ভিক্ষায় বাহির হইলে তাঁহার রূপের কথা তুলিয়া উপহাস করিয়াছে—এ দুঃখ, এ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা তিনি সহিতে পারিলেন না। "রূপ! ছাই রূপ! এ মানুষ-পতঙ্গকে দগ্ধ করিতে, তাহার দেবত্ব বিসর্জ্জন কবিতে, এ রূপের শিখা কেন জ্বালিয়াছ, প্রভু! হৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি, প্রেম, শান্তি সর্ব্বস্ব দলিত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের এ প্রবল রাজত্ব কেন, প্রভু! মানুষ ব্যথার ব্যথী না হইয়া, মরমের দুঃখ না বুঝিয়া, এ নিষ্ঠুর উপহাসে আনন্দ পায় কেন, নাথ! মহান আদর্শ দূরে ফেলিয়া, এ নিকৃষ্ট আনন্দে তাহার এত সাগ্রহ ব্যাকুলতা কেন, দেব! আমার এ নশ্বর দেহে এমন কি রূপের মোহ আছে যে, এত দুঃখে পড়িয়াও মানবপ্রাণে করুণার সঞ্চার করাইতে পারিলাম না?—কি মহা পাপের অনুষ্ঠানে নিজের সর্ব্বস্ব বলি দিতেছিলাম! কোথায় তুমি—স্বামিন্! আমার ইহপরকালের দেবতা, আমার জ্ঞান-প্রেম-মুক্তির শিক্ষাগুরু! এতদিন কি শিখাইলে, নাথ! চরণাশ্রিতা লতিকা ভূমিতে লুণ্ঠিত করিয়া গিয়াছ, একদিনের জন্য চক্ষের অন্তরাল কর নাই, সহস্র দুঃখে পড়িয়াও একদিনের জন্য পাপের চিন্তা কর নাই—তোমার সে শিক্ষা কি আমি বিসর্জ্জন দিয়াছি? আমার সহস্র সহস্র অপরাধ তুমি মার্জ্জনা করিয়াছ, আমি আজিও তোমার দয়ার ভিখারী! তুমি দয়া কর, তুমি মার্জ্জনা কর, আমি না বুঝিয়া যে মহাপাপ করিয়াছি, তুমি নিজগুণে তাহার মার্জ্জনা না করিলে আমার পরিত্রাণ নাই! তুমি চরণে স্থান না দিলে, আমি ভগবানেরও কৃপা পাইব না, আমি শরণাগত—আমাকে অভয় দাও!"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুঃখিনীর হৃদয়ের ভার অনেক লাঘব হইল। প্রায় রাত্রি শেষে তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন হইলেন।

তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার কাতর আহ্বানে তাঁহার স্বামী স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিলেন, তাঁহার অপরূপ রূপ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। সে রুগ্ন দেহ নাই, সে চিন্তাক্লিষ্ট বদন নাই, সে মলিন রূপ নাই—সে যেন এক সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, সেই স্থানে একটা অপূর্ব্ব আলোক প্রকাশিত হইল, সেই অপূর্ব্ব আলোকে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি।

তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, তাঁহার স্বামী যেন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের চরণে প্রণত হইলেন, পরে তাঁহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, স্ত্রীকে বলিয়া দিলেন,—"ইঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ কর, সকল সন্তাপ দূর হইবে।"

দুঃখিনী ভক্তিভরে সেই দেবতার চরণে যেন প্রণতা হইলেন, তাঁহার অভয় বাণী দুঃখিনীর কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। তিনি শান্তি পাইলেন, পতির চরণধূলি লইতে হস্ত প্রসারণ করিলেন, হস্ত কঠিন মৃত্তিকায় পড়িয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিল।

তখন নির্ম্মল ঊষার শীতল বায়ু তাঁহার উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করিতেছিল। দূরে কেহ গাহিতেছিল, সে সুমধুর গীতধ্বনি তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিতেছিল। তেমন সুখস্বপ্নের অন্তর্ধানে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া যে গভীর নিশ্বাস পড়িতেছিল এবং আকুল ক্রন্দন জমাট বাঁধিয়া চক্ষের দ্বারে আসিয়াছিল—সহসা সেই গীতধ্বনিতে তাহা মিলাইয়া গেল। তিনি শুনিতে লাগিলেন, সেই নির্ম্মল ঊষায়, প্রাণ খুলিয়া, সুমধুর কণ্ঠে কেহ গাহিতেছে—

"আমি অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি,
আর কি শমন ভয় রেখেছি!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

আমার বাসনা।

(১)

আমি সারাটী জীবনে,
যেন তোমার চরণে,
মতি স্থির করি, রাখিবারে পারি,
প্রভু হে—আমার বাসনা।

(২)

তোমার ধর্ম্মে ও কর্ম্মে,
রহে গাঁথা মর্ম্মে মর্ম্মে,
যেন গো বিশেষ, তব উপদেশ,
প্রভু হে—আমার বাসনা॥

(৩)

তোমার চরণ পদ্মে,
দুঃখে বা সুখ সম্পদে,
অটল অচল, মতি অবিরল,
রহে গো—আমার বাসনা।

(৪)

সংসার মাঝারে পশি,
যেন দেব দিবানিশি,
মায়াজালে মুগ্ধ হয়ে, আমি দগ্ধ,
হইনা—আমার বাসনা॥

(৫)

যেন তুচ্ছ ধন রত্নে,
কিম্বা বিলাস বসনে,
ছলনা কুহকে, পড়িবা বিপাকে,
মজিনা—আমার বাসনা।

(৬)

সতত তোমার আজ্ঞা,
পালিয়া লভি গো সংজ্ঞা,
দীনহীন মূর্খে, প্রভু ক'র রক্ষে,
বিপদে—আমার বাসনা॥

৭)

আমি জীবনে মরণে,
প্রভু তোমার কারণে,
দুখ-জালা বহি, যাতনাই সহি,
তাহাই—আমার বাসনা।

(৮)

জনমে জনমে যেন
পাই প্রভু তোমা হেন,
রামকৃষ্ণ ভজি, তোমারেই পূজি,
ইহাই—আমার বাসনা॥

সেবক—শ্রীমনোহরচন্দ্র বসু।

তীর্থ ভ্রমণ।

আজকাল আমাদের দেশের ধনী, নিধনী, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোককেই তীর্থ পর্য্যটনের নিমিত্ত উদগ্রীব দেখিতে পাই। আমরা, অপরের সর্ব্বনাশ করা অপেক্ষা এই পুণ্যকার্য্যে লোকের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়া থাকি। এ সংসারে এমন মূঢ় কে আছে যে, লোককে সদাচরণে প্রবৃত্তি দেখিয়া আনন্দলাভ না করিয়া থাকে? তীর্থ পর্য্যটন যদিও পুণ্যকার্য্য, যদিও উত্তম ধর্ম্ম, তথাপি আমরা সত্যের অনুরোধে এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, যাহার দ্বারা লোক এই মোহান্ধকারপূর্ণ সংসারকূপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে সেই তীর্থ, অর্থাৎ গুরু—গুরুই জ্ঞান জ্যোতি বিকীরণ করিয়া অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করেন। মানুষের অজ্ঞানতাপাশ ছিন্ন হইয়া গেলেই ভগবৎ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাই হিন্দুধর্ম্মের আচার্য্যেরা গুরুকেই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন—এই মনে করিয়া যে, তীর্থশব্দের অর্থ যদি গুরুই হয়, তাহা হইলে লোকে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, শ্রীক্ষেত্র, চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা প্রভৃতি পুণ্যস্থানকে তীর্থ বিশেষণে বিশেষিত করে কেন? ইহার উত্তর ইহাই যে, তীর্থ শব্দের অর্থ যেমন গুরু হয়, তেমন এই সমস্ত পুণ্যক্ষেত্রও হয়। গুরু যেমন শিষ্যকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের দ্বারা সৎপথে আনয়ন করিয়া তাহার আত্মোন্নতির পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার করিয়া দেন, সেইরূপ এই সমস্ত পুণ্যভূমিও মনুষ্যের হৃদয়ে ভগবদ্ভাব জাগ্রত করিয়া দেয়। মনুষ্যের হৃদয়াকাশে ভগবদ্ভাবনাভানুর উদয় হইলেই সে মুক্তির পথ দেখিয়া ক্রমে ক্রমে সে পথে অগ্রসর হইতে থাকে। যে মুক্তিদান করিতে সমর্থ সেই গুরু, সুতরাং তীর্থ গুরু।

পুরাকালের লোক তীর্থকে বাস্তবিকই গুরু বলিয়া সম্মান করিতেন, তাঁহারা তীর্থ-ভূমিকে সত্যসত্যই মুক্তিদাত্রী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা তীর্থক্ষেত্রকে কেবল ভ্রমণের স্থান কিম্বা হাওয়া পরিবর্ত্তনের জায়গা বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহারা যথন যে তীর্থে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেন, তখন হইতেই সেই তীর্থের অধীশ্বর দেবতাকে সদা সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করিতেন। দিবারাত্রি তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতেন। গমনের সময় প্রতি পদবিক্ষেপে তাঁহার স্মরণ করিতেন। এইরূপে দীর্ঘকাল অন্তে বাঞ্ছিত তীর্থে উপস্থিত হইতেন। সেখানে পূজা, অর্চ্চনা, স্নান, তর্পণ যাহা কিছু করিবার সমস্তই দীনভাবে ভক্তিপূর্ব্বক সমাধা করিয়া, তীর্থেশ্বরকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। আর এখনকার লোক আমরা, আমাদের মনে যথনই ইচ্ছা হইল যে, অমুক তীর্থে গমন করিব, তথনই রেলগাড়ীতে উঠিয়া সেই তীর্থে গমন করি, এবং দম্ভ দর্পের সহিত তথাকার সমুদয় কর্ম্মশেষ করিয়া, অবশেষে সেথানকার যে সমস্ত উৎকৃষ্ট জিনিষ তাহাই ক্রয় করিয়া এটা কারে দিব, ওটা কারে দিব, সেটা কারে দিব ইহাই ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করি। কাজে কাজেই আমরা তীর্থ ভ্রমণজনিত পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারিনা।

শাস্ত্রে তীর্থ-পর্য্যটন উত্তম তপশ্চরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। তীর্থ পর্য্যটনরূপ তপশ্চরণের দ্বারা উপপাতক, অতিপাতক, এমন কি ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, পিতৃমাতৃহত্যা, সুরাপান প্রভৃতি মহাপাতক পর্য্যন্তও ক্ষয় হইয়া যায়। তাই শাস্ত্রে দেখিতে পাই, ভৃগুনন্দন পরশুরাম মাতৃহত্যারূপ মহাপাপ আচরণ করিয়া; পরে সেই পাপ অপনোদনের জন্য ভারতমাতার বক্ষস্থিত যাবতীয় তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। আবার দ্বাপরযুগে বসুদেবের প্রাণারাম বলরামও ব্রহ্মহত্যা করিয়া তীর্থ পর্য্যটনরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপশ্চরণপূর্ব্বক পাপক্ষয় করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে তীর্থের মাহাত্ম্যসূচক এইরূপ আরও যথেষ্ট উপাখ্যান বর্ণিত আছে, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় ইহাই যে, আমরা এই সমস্ত উদাহরণ দেখিয়া শুনিয়াও তীর্থের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করি না, করি কেবল তীর্থক্ষেত্রের বাহ্যিক দৃশ্য ভাল, জল ভাল, বায়ু ভাল, কিছুদিন বাস করিলে শরীর ভাল হয়। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা তীর্থে গমন করি, ফলও প্রায় এইরূপই লাভ করিয়া থাকি। শরীর ভাল হইলেই আবার আসিয়া যে কার্য্যের দ্বারা দেহের অবনতি ঘটিয়াছিল, সেই কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করি। কিন্তু এইটুকু চিন্তা করিনা যে, ভগবান তীর্থক্ষেত্রকে কেন শরীরহিতকারিণী

শক্তি প্রদান করিয়াছেন ? আমাদের মনে হয় যে, শরীরে বলাধান হইলেই [illegible] শক্তি হয়, মানসিক বল বর্দ্ধিত হইলেই ভগবানকে ধরিতে পারা যায়, তাই বোধ হয় ভগবান তীর্থক্ষেত্রকে লোকের শরীর হিতকারিণীশক্তি প্রদান করিয়া নিজেই লোকের জন্য নিজের ধরা দিবার উপায় সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। আহা! তিনি যদি দয়া করিয়া এইরূপে নিজে নিজেই আমাদিগকে ধরা না দেন, তাহা হইলে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কাহার সাধ্য যে, তাঁহাকে ধরে ?

সে কালের লোকেরা ইহকালের জন্য লালায়িত হইতেন না। তাঁহারা এমন ভঙ্গুর স্থূলদেহের উৎকর্ষসাধনের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তাঁহারা পারলৌকিক মঙ্গল বাসনায়, অবিনশ্বর আত্মার উন্নতির আশায়, তীর্থ ভ্রমণ করিতেন। আশানুরূপ ফলও প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা বুঝিতেন যে, ধর্ম্মকার্য্যের দ্বারা অবিরত ক্ষয়শীল শরীর কৃশ হইলেও মনের বল, উদ্যম, উৎসাহ প্রভৃতি কিছুই বিনষ্ট হয়না, বরং সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর সেই কৃশাঙ্গের মধ্যে এমন একটী মহান তেজ উৎপন্ন হয় যে, সে তেজ দর্শন করিয়া অতি বড় মূঢ় ব্যক্তিও শান্তি ও আনন্দলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু ভাই! যাহারা মাদক দ্রব্য সেবন ও স্ত্রীসম্ভোগাদির দ্বারা কেবল পশুর ন্যায় সংসারে বিচরণ করে—"জ্ঞানহীন পশু প্রিয়ে" তাহাদের দ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি সম্ভবে না। আজকাল নানারূপ অত্যাচারবশতঃ আমরা শারীরিক ও মানসিক বলহীন হইয়াছি। শরীর সুস্থ বোধ না হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই ভাল বলিয়া বিবেচিত হয় না। ধর্ম্মাচরণ কথাটী যত সহজ, কার্য্যে তত সহজ নহে, সহজ নয় বলিয়াই ধর্ম্মাচরণে আমাদের প্রবৃত্তি অতি অল্প, এমন কি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্ত্তমানকালে বায়ু পরিবর্ত্তনেচ্ছুক বাবু ব্যতীতও আর এক প্রকারের তীর্থযাত্রী গোচরীভূত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে দেখিয়া যাহারা ধর্ম্মান্ধ, যাহারা কেবল বাহ্য ধর্ম্মভাব বিমুগ্ধ, তাহারা মনে করিয়া থাকে যে, আহা! এই লোকটীর কি সুন্দর ধর্ম্ম প্রবৃত্তি। ভগবানে ইহার কি প্রগাঢ় ভক্তি। সংসারে ইনিই প্রকৃত ভাগ্যবান, তাই সপরিবারে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। ভাই পাঠক! আমরা কিন্তু এই শ্রেণীর তীর্থ পর্য্যটকদিগকে এইরূপ প্রশংসা মালিকায় বিভূষিত করিতে বাধ্য নই, কারণ আমরা অনেক তীর্থযাত্রীর ভিতরকার ভাব অবগত হইয়া বুঝিয়াছি যে, আজকাল অধিকাংশ লোকই অনিচ্ছাসত্ত্বে স্ত্রীর অনুরোধে তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন। ধর্ম্মকার্য্যে ঐকান্তিক ইচ্ছা না জন্মিলে কখনই ফল পাওয়া যায় না। ভক্তিহীনতা প্রযুক্তই [illegible]-

কালকার লোক পুণ্যকর্ম্ম-প্রসূত ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। পুরাকালের লোক, জীবনে একবার মাত্র মুক্তিপ্রদায়িনী ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে অবগাহন করিয়া স্বর্গলাভের যোগ্য হইত, আর আজ আমরা জীবনে শত সহস্রবার নানাবিধ কামনাসূচক বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক স্নান করিয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারিনা। এই সমস্ত দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, সেকালের লোক ধার্ম্মিক ছিলেন মনে মনে,—আর আমরা কেবল বাহিরে।

সংসারে সমুদয় সৎকর্ম্মই ভক্তিপূর্ব্বক বিনয়নম্র সহকারে মন, বাক্য, শরীর এক করিয়া আচরণ করা উচিত। এরূপ করিলে নিশ্চয়ই পুণ্যকর্ম্মজনিত সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভক্তি বিশ্বাসসহ অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম কখনই অফলপ্রসূ হয় না। আমরা যখন সুফল পাই না, আমাদের পক্ষে যখন সমস্ত সৎকর্ম্মই বন্ধ্যার ন্যায় অফলপ্রসূ, তখন বুঝিতে হইবে যে, আমাদের কৃত সমুদয় সৎকর্ম্মই লোক দেখানর জন্য তামসিক ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তামসিক কার্য্যের দ্বারা আত্মার উন্নতি হওয়া অসম্ভব বরং সমধিক অবনতির আশঙ্কাই অধিক। "জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ" আত্মার উন্নতিই স্বর্গ, আর আত্মার অবনতিই নরক। আত্মার উন্নতি হইলে সুখ শান্তি সমস্তই লাভ করা যায়। আত্মার অবনতি হইলে দুঃখ, শোক, ব্যাধি প্রভৃতি আসিয়া মানবকে আক্রমণ করে। প্রণিধানপূর্ব্বক এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয় যে, আমাদের যাবতীয় সৎকর্ম্মই দম্ভ, দর্প, অভিমানের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের মনে হয় যে, আমাদের কৃত কোন সৎকর্ম্মই যথার্থরূপে হয় না। তাই দিন দিন আমাদের আত্মার অবনতিই ঘটিতেছে। তাই আজ হিন্দুর সংসারে, যাহা কোনকালে ছিল না, সেই সমস্ত অশ্রুতপূর্ব্ব প্লেগ, বেরিবেরি প্রভৃতি আশু মৃত্যু-সঙ্ঘটক ব্যাধির আবির্ভাব হইয়াছে। বলিতে পারিনা, কালে আবার ইহা অপেক্ষা আরও কি ভয়ানক ব্যাধির অভ্যুদয় হইবে।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, তীর্থ গুরু। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে, তীর্থ কোন শ্রেণীর লোকের গুরু। অনেকে হয়ত একথার উত্তরে বলিতে পারেন যে, তীর্থ আপামর সাধারণ সকলেরই গুরু। কিন্তু আমরা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য নয়। আমরা এস্থলে ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে, তীর্থ কেবল সাধুপ্রকৃতি সম্পন্ন লোকেরই গুরু। যেহেতু তীর্থ সাধুলোক ভিন্ন অন্য লোকের মোহ নাশ করিতে সমর্থ নয়। তাই আজ আমরা অবিমুক্ত বারাণসী ক্ষেত্রে বেশ্যা তস্করের পৈশাচিক লীলার দিন দিন বৃদ্ধি দেখিতে পাই-

তেছি। তাই পাঠক! তীর্থ ক্ষেত্রকে যদি সর্ব্বসাধারণে গুরু বলিয়া ভয় ভক্তি করিত, তাহা হইলে কি আর গুরুর ক্রোড়ে আজ পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য পরিদৃষ্ট হইত? গুরুর নিকটে কি কেহ কোনরূপ দুষ্কার্য্য করিতে পারে? না। আমরা যখন তাহাই করিতেছি, তখন আবার তীর্থ আমাদের কি রকম গুরু? এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়াই আমরা বলিতেছি যে, তীর্থ সর্ব্বসাধারণের গুরু নয়—কেবল সাধু সজ্জনেরই গুরু।

তীর্থ আমাদিগকে মানুষ গুরুর ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিয়া উপদেশ প্রদান করে না। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করায়। তীর্থক্ষেত্র দেখিয়া, আমাদের ইহাই মনে হয় যে, ভগবান যেন তীর্থকে নানাবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া আমাদের শিক্ষার জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি ভাবুক, তিনিই ভাব গ্রহণ করিয়া সেই অসীম সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা যে ভগবান, তাঁহাকে মনে মনে চিন্তা করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও পরম সুখশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। অথবা তীর্থক্ষেত্রকে একখানি প্রকৃতি গ্রন্থ বলিলেও বলা যাইতে পারে। এ গ্রন্থ যিনি অধ্যয়ন করিতে পারেন তিনিই মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। কিন্তু এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা সকলের নাই। তাই আজকালকার অনেক তীর্থভ্রমণকারী লোকের মুখে শুনিতে পাই যে, "তীর্থে গিয়া কোনই সুখ নাই, গৃহে সর্ব্বদার জন্য যেরূপ অশান্তি তীর্থেও তাহাই, তীর্থ পর্য্যটনের দ্বারা মনের অশান্তিপূর্ণ ভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না" কি ভয়ানক কথা! কোথায় তীর্থ ভ্রমণের দ্বারা মনের সুখ আনয়ন করিবে; হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিবে; হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি দূরীভূত হইয়া যাইবে, না, সে সমস্ত যেমন তেমনই থাকে। ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, কাহারই রীতিমত তীর্থ ভ্রমণ হয় না। তীর্থ আমাদের ন্যায় ইন্দ্রিয় প্রবল বিষয়াসক্ত লোকদিগকে পরিত্রাণ করিতে অসমর্থ। যে, যাহাকে ভবসমুদ্র হইতে তীরে উত্তীর্ণ করিতে না পারে, সে তাহার গুরুর আসনে উপবেশন করিবার যোগ্য নয়। সুতরাং তীর্থ আমাদের ন্যায় অজ্ঞ পাপীষ্ঠ লোকের গুরু নয়, সাধুলোকেরই গুরু। একথায় কেহ ক্রুদ্ধ হইবেন না। মুখে গুরু বলিলে গুরু হয় না, কার্য্যে দেখান আবশ্যক। আমরা তীর্থকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিনা, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

সংসারী লোকের পক্ষে সর্ব্বসাধারণের প্রতি সমান প্রদর্শন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাহারা যাহার গুণে আকৃষ্ট হয়, তাহাকেই [illegible] [illegible]

করিয়া থাকে। তবে এরূপও দেখা যায় যে, একজনের গুণে কোন লোক মুগ্ধ না হইলেও দশজনের দেখাদেখি তাহাকে সম্মান করিয়া থাকে। আমরাও তীর্থকে ঠিক এইরূপ ভাবেই ভক্তি শ্রদ্ধা করি। আমরা তীর্থের কোনও গুণই উপলব্ধি করিতে পারিনা। সাধুলোকে তীর্থের মহিমা সর্ব্বদার তরে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাই তাঁহারা অন্তরের সহিত তীর্থকে ভক্তি করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদেরই দেখাদেখি তীর্থকে সম্মান করিয়া থাকি। তাঁহাদের কার্য্য আন্তরিক, আমাদের বাহ্যিক, সুতরাং আমরা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া মোক্ষ ফললাভ করিতে পারিনা। এ সংসারে যে কোন কার্য্যই হউক না কেন, তাহাতে আন্তরিকতা না থাকিলে, তাহার মর্ম্ম না বুঝিলে, কখনই সে কর্ম্মজনিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আজকাল ইংরাজের কৃপায়, রেলগাড়ীর সাহায্যে তীর্থভ্রমণ আমাদের খুব সহজসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তীর্থজনিত মোক্ষফল যদি ততদূর সহজ লভ্য হইত তাহা হইলে জগদীশ্বরের প্রাচীনকালে আবার রাজ্য বিস্তারের চিন্তায় ব্যাকুল হইতে হইত। আমাদের বোধ হয়, সেই ভয়েই তিনি মোক্ষ ফল অতি সংগোপনে রাখিয়াছেন। সে ফল লাভ করা ভাই! তোমার আমার মত রেলগাড়ী বিহারী তীর্থ পর্য্যটকের কর্ম্ম নয়। যিনি সে ফল পিপাসু, তিনি যদি পরশুরাম বা বলরামের মত পদব্রজে একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে তীর্থপর্য্যটন করিতে পারেন, তাহা হইলে নারদাদি ঋষিবাঞ্ছিত উত্তম ফললাভ করিয়া মৃত্যু ভয় হইতে আত্মাকে রক্ষা করিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রেও এইরূপ উপদেশই দেখিতে পাই—

"পদ্ভ্যাং গচ্ছতি ন যানে যদীচ্ছেৎকার্য্য মুত্তমম্।"

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নবীন কর্ণধার।

কাণ্ডারী বিহীন তরী ভারত মাঝারে
কেহে তুমি বল কর্ণধার রূপ ধরি—
সঙ্গীত-তরঙ্গ সঙ্গে তরীর উপরে
উঠিয়াছ? লীলাখেলা দিবা বিভাবরী!

কহ কেন যাত্রীদের অশ্রুবিন্দু গলে,
হেরি সেই রূপ রাশি অতি মনোহর?
তুমি কি ফুটন্ত পদ্ম সদা ভক্তিজলে?—
অলির মতন তারা তোমাতে বিভোর?
কেহ সেই রূপ হেরি বলে বজ্রঘোষে,
"জীবে সেবা করি আমি সেবিব তোমায়।"
কেহ বলে "শুদ্ধজ্ঞানে যাব তব পাশে।"
পুনঃ কেহ "শুদ্ধাভক্তি ঢালি দিব পায়।"
এতদিনে প্রভাতিল শোক-বিভাবরী।
"জয় রামকৃষ্ণ" নামে উঠেছে লহরী!

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত।

সমালোচনা।

ব্রহ্মদেশ—রেঙ্গুন হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় "কার্য্যকরী শিল্প প্রস্তুত প্রণালী" নামক একখানি পুস্তক দুই ভাগে প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তক দুইখানি দেখিয়া, উহার নামকরণ যথাযথ সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিতে পারি। ইহাতে সংসারের নিত্য আবশ্যকীয় যাবতীয় শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী বেশ সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত দেখিলাম। এমন কি বালক বালিকারা এবং মহিলাগণও এই পুস্তক দৃষ্টে উক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিবেন। যাহারা সামান্য মূলধনে ব্যবসা করিবার প্রয়াসী এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই পুস্তকখানি যত্নের সহিত পাঠ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করি। পুস্তকের প্রথম ভাগ, মূল্য ।৹ চারি আনা; ২য় ভাগ, মূল্য ১৲ এক টাকা; ৩য় ভাগ যন্ত্রস্থ; মূল্য ১।৹ পাঁচ সিকা। প্রাপ্তিস্থান, গ্রন্থকারের নিকট ২০ নং স্পার্ক ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন, বর্ম্মা।

নিবেদন।

তত্ত্বমঞ্জরীর সম্পাদক শ্বাসরোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন, সেই জন্য পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিল, এবং ভবিষ্যতেও ঘটিবার সম্ভাবনা। সদাশয় গ্রাহকবর্গ দয়া প্রকাশে এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন, এই নিবেদন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।
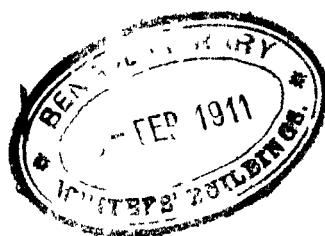
অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৭ সাল।

চতুর্দ্দশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা।

সান্ত্বনা।

(গান)

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

দিন কি ফুরাল হরি, ভাবি মাঝে মাঝে তাই।
জন্ম গেছে বৃথা কাজে, আর কি উপায় নাই॥
আছে কৃপা, আছে নাম, রামকৃষ্ণ প্রাণারাম,
গুরু রূপে পরিত্রাণ, করেন জগৎ-গোঁসাই॥
পতিতেরে দেন কোল, নিজে দিয়ে হরিবোল,
মা-নামে ভাবে বিভোল, জীব-দুঃখে কাঁদেন সদাই॥
থাক্‌তে এমন দয়াল ঠাকুর, ভয় কি রে তোর এ ভবপুর,
নেরে শরণ, সেই অভয় চরণ,
ধোরে নামের ভেলা ভেসে যাই॥

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

জাগ্রত-জীবন।

জগতের সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে, কত দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ, সময়ের অনন্ত ক্রোড়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে জগতে কত নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অসার ধূলি-খেলায় অমূল্য মানব জনমের পর্য্যবসান করিয়া, জীবন-সন্ধ্যায় অশ্রুপূর্ণলোচনে কাঁদিতে কাঁদিতে অস্তমিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মানব মনে কত চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, কত ভাবের লহরী উঠিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে সুবিস্তীর্ণ দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মহাসাগর সদৃশ মানব সমাজের মধ্যে কত ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনাবলী বারিবুদ্বুদের ন্যায় ভাসিয়া আবার পর মুহূর্ত্তেই অনন্তের ক্রোড়শায়ী হইয়াছে। যখন জগতের বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হই বা চিন্তা করিয়া দেখি, তখন জ্ঞান থাকে না; কে যেন অবাক করিয়া তুলে। প্রত্যেক কার্য্যাবলীর মধ্যে মানবের সঙ্কীর্ণ মন ও ক্ষীণ-বুদ্ধি এবং ভগবানের অনন্তজ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের পরিচয় দেয়। যখন অতীতের এই ধারণাগম্য দিনের অসংখ্য ঘটনাবলী অন্তরে স্থান দেই—তখন এক গভীর উপদেশ লাভ করিয়া বর্ত্তমানের ক্রোড়ে পড়িয়া যাই,—আবার যখন অতীতের দিকে তাকাই তখন ভবিষ্যৎ মনে পড়ে। আমি মনে করিলাম সকলেই বুঝি আমার মত নয়! আমার ধারণা বুঝি একটু অপর রকম! কিন্তু আমার সে ধারণা মিথ্যা ভ্রমব্যঞ্জক! যাহার নিকট যাই, সকলেই আমার মতন। শুধু আমি একা নয়, দেখি কত নরনারীর জীবন সংসারিকতায় ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আবার দেখি, কত নরনারী জীবনের পথে হাঁটিতে গিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আবার দেখি, কত নরনারী হাসিতে হাসিতে জীবনপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, অতীত জীবন-কাহিনী সমালোচনা করিলে; "ভবিষ্যতে কি করিব এবং জগতে কি করা কর্ত্তব্য" যে বিষয় অনেক অবগত হই! অনেক বিষয়ে সাবধান হইতে এবং অনেক বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারি।

আমাদের ইতিহাসের প্রত্যেক পংক্তিতে অবগত করাইতেছে—"যদি প্রকৃত জীবন লাভ করিতে যাও, তবে হে মানব! স্বার্থ-রজ্জু ছিন্ন কর! পর-সেবায় মন প্রাণ অর্পণ কর।" বেদান্তমতে পূর্ণব্রহ্মের অপূর্ণ অংশেই এই

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। সেই অপূর্ণ অংশ প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করিতে সক্ষম, এবং সেই অপূর্ণ অংশসমূহ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাহায্য ব্যতিরেকে কখনই পূর্ণত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এই পূর্ণত্ব লাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। ভগবানের অভিপ্রায়;—মানব জগতে গিয়া স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধন করুক। আর যদি মানব উদ্দেশ্যচ্যুত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য হইতে শত হস্ত দূরে অবস্থান করেন এবং উদ্দেশ্যের বিপরীতভাবে কার্য্য করেন; তাহার সে জীবন বৃথা ব্যয়জনিত, ভগবানের নিকট কর্ত্তব্য পালন না করার দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

এই জীবন লাভের উপায় অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, "সেবাই আমাদের উদ্দেশ্য। সেবাই আমাদের সাধনা! কারণ মানব সেবাদ্বারা নিজের এবং সার্ব্বজনীন অপূর্ণতাকে ক্রমে অপসারিত করিতে সক্ষম হয় এবং ক্রমে জীবনের দিকে অগ্রসর হইয়া স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্যসাধন করিয়া ভগবানাশীষ মস্তকে ধারণ করিয়া জীবন সংগ্রামে অনায়াসেই জয়ী হইতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা বলিতে পারি সেবার ন্যায় ধর্ম্মজগতে দুর্লভ। হে মানব! যদি সুখী হইতে চাও, যদি শান্তি পাইতে চাও, যদি অপরকে সুখী করিতে চাও, যদি দেশে শান্তিসুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে চাও, তবে সেবাধর্ম্ম অবলম্বন কর। ফলে দেখিতে পাইবে, তোমার সকল আশাই পূর্ণ হইয়াছে, নিজে সুখী হইয়াছ এবং দশকে সুখী করিতে পারিয়াছ। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—"মানুষ ভগবানের অংশ, মানুষকে সেবা করাও যা, ভগবানের সেবাও তাই!"

জীব সেবায় মনে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়, তাহা অমূল্য! স্বার্থান্ধ, আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত, চিন্তাদ্বারাও অনুভব করিতে সক্ষম হয় না যে, সে আনন্দ বাস্তবিক স্বর্গীয়! যিনি সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, যিনি সেবাকার্য্যে মনকে ডুবাইয়া দিয়াছেন, সেবাকে জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য মনে স্থান দিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন, এ অমৃতে কত সুধা! কত মন প্রাণ বিমুগ্ধকারিণী-শক্তি! কেমন হৃদয়ভরা মাধুরী! আর উহার নিকট স্বার্থ কত হীন, কত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র! মানুষের মনুষ্যত্ব বজায় রাখিবার যদি কোন জিনিষ থাকে তবে সে জীবন! যাহার যতটুকু নিঃস্বার্থ জীবন, তাহার ততটুকু মনুষ্য নামের অধিকারী। জীবনের নিঃস্বার্থভাব দেখিয়াই মানুষের মনুষ্যত্বের পরিমাণ করা যায়।

নিঃস্বার্থ জীবন কাহাকে বলে? আমরা প্রতিদিন আহার করি, বেড়াই, নিদ্রা যাই, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করি, পরিশ্রম করি, কথা বলি, গল্প

করি, ইহাই কি নিঃস্বার্থ জীবন? জগত ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশ লোকেরই প্রতিদিন এইরূপ ঘটিতেছে যে, চক্ষুদ্বারা দর্শন করে, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করে, নাসিকাদ্বারা ঘ্রাণ লয়, রসনায় আস্বাদ গ্রহণ করে এবং ত্বকে স্পর্শ অনুভব করে! হাতে কাজ করে, পায় হাঁটিয়া বেড়ায়, মুখে কথা বলে, অথচ তাহাদের জীবনের অভাব! আগে দেখা যাউক যদি ইহাদের জীবনেরই অভাব, তবে ইহারা কোথা থেকে আসিলো? শরীরখানিই বা কি? শরীরখানি একটা জড়পিণ্ড, পঞ্চভূত হইতে আসিয়াছে আবার পঞ্চভূতে লয় পাইবে। শরীরের সহিত প্রকৃত জীবন (আত্মা) স্বতন্ত্র বস্তু।

"কৃমি বিড়্ ভস্মনিষ্ঠান্তং কেদং তুচ্ছং কলেবরম্।
ক্বতদীয় রতি ভার্য্যা ক্বায়মাত্মা নভশ্চ্ছদিঃ॥"

এই তুচ্ছদেহ যাহা কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে পরিণত হইবে, উহা কোথায়! উহার স্ত্রীসম্ভোগ কোথায়? আর নভোমণ্ডলাচ্ছাদী আত্মাই বা কোথায়? অর্থাৎ দেহ ও জাগতিক সুখ অনিত্য, আত্মা নিত্য।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসান্নিত্যগন্ধবচ্চযৎ।
অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে॥"

তিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কিছুই নহেন, তিনি অব্যয়, তিনি অনাদি, তিনি মহৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও ধ্রুব; সাধক তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন।

যাহার জীবন নিষ্কাম নিঃস্বার্থ তাহার সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই জাগ্রত। তাহার চিন্তা জাগ্রত, মনের ভাব ও কার্য্যাবলী সমস্তই জাগ্রতভাবে পরিপূর্ণ। যাহার জীবন মৃতজীবন অর্থাৎ যাহার জীবন আপনা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত সে ব্যক্তি মৃত! তাহার ভাব মৃত, তাহার কার্য্যাবলীও জীবনহীন। জীবন ও কার্য্য! জীবন ভিতরের জিনিষ, কার্য্য বাহিরের। তাই বলিয়া উভয়টাই একাত্মা, প্রভেদ নয়। উভয়ের সহিত উভয়েই ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ। জীবনকার্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা! জীবন চন্দ্রের ন্যায়, কার্য্য মহাসমুদ্রের ন্যায়। জীবন চন্দ্র যে পরিমাণে আকর্ষণ করিবেন কার্য্যসমুদ্রও সেই পরিমাণে উথলিয়া উঠিবে। জীবন কায়া, কার্য্য ছায়া। যদি কারণ নষ্ট হইয়া যায় বা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে তবে ছায়ারও তদ্রূপ ঘটিবে। কায়া চলিয়া গেলে ছায়া থাকিবে না। এখন দেখা গেল, জীবন কায়া, কার্য্য ছায়া, সুতরাং জীবনই কার্য্যের পরিচালক।

মানুষের এক প্রকার বৃত্তি আছে, যাহার নাম অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি। ইহা

মানুষের এক অতি স্বাভাবিক বৃত্তি—ইহা ভগবান প্রদত্ত। কেহ কোন কিছু বলিল বা কোন ঘটনা ঘটিল; অমনি মানব মনে এক চিন্তা লহরী ভাসমান হইল—"কেন এ কথা বলিল, কেন এ ঘটনা ঘটিল?" এইরূপ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিতে করিতে মানুষ যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম স্থানে গিয়া দাঁড়াইতে পারে, সে তত উন্নত হয়। তাহার জীবন ততই জাগ্রত হয়। স্যর আইজাক নিউটন বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইল দেখিয়া অতি সূক্ষ্মতম চিন্তায় মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন, তখন তাহার মনোবাঞ্ছা পরিপূরণ হইল। তাঁহার জীবন প্রবাহ জাগ্রত-জীবন স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। জাগ্রত চিন্তায় সাধক নিউটন আত্মসমর্পণ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম চিন্তায় মন সংযোগ করিতে পারিলেন, তাই তিনি জগতের মধ্যে বড় লোকদিগের স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন।

আর এক কথা—মানুষের চিত্ত কখনই নিশ্চিন্ত থাকে না, সে সর্ব্বদাই চিন্তায় নিযুক্ত। মানুষ যখন নিদ্রা যায়, তখনও চুপ করিয়া থাকিতে পারে না; তখনও মানুষিক বৃত্তিগুলি চিন্তাগুলি স্বপ্নাকারে দেখা দিয়া থাকে। মানুষের স্বভাব কি? মানুষ কেন, প্রত্যেক জীব জন্তু কীট পতঙ্গাদিই সুন্দর পদার্থে আসক্ত হওয়া স্বভাব-ভাব। মানুষ সুন্দর বস্তুর আদর চিরকালই করিয়া আসিতেছে এবং করিবে। কারণ সৌন্দর্য্যের গ্রহণ-শক্তি মানুষের স্বভাব। কাহাকেও সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব, সৌন্দর্য্যের কথা বা কাহিনী ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয় না। মানুষ স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্য-মধু পান করিবার জন্য লালায়িত। মধুকরের ন্যায় মানুষের মানসিক প্রবৃত্তি অবিরাম "কোথায় সৌন্দর্য্যমধু, কোথায় সৌন্দর্য্যমধু" বলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ প্রকৃতির দাস। মানুষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়াই পাগল। প্রকৃতির রত্নময় ভাণ্ডারে হউক, আর মানবের হৃদয়-কাননেই হউক, যেখানে সৌন্দর্য্যপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে—মানুষ সেখান হইতে আর উঠিয়া যাইতে চায় না। সৌন্দর্য্যের প্রতিমা-খানি, ভালবাসার সেই সামগ্রীটী দৃষ্টিপথে রাখিয়া মানুষ কত কত ভাবে ডাকে, কত ভাবে আদর করে, কত ভাবে সোহাগ করে। আর তার সৌন্দর্য্য চিন্তায় মানুষ গদগদ—তার সৌন্দর্য্য চিন্তায় আপনাকে ভুলিয়া যায়। আপনাকে ভুলিয়া তাহারই হইয়া যায়, তখন তার আর অন্য চিন্তা থাকে না, বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া যায়। তখন পঞ্চভূতের ক্রিয়া উপলব্ধি হয় না—তখন ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়, তখন সে একমাত্র তাহারই সৌন্দর্য্য পানে [illegible] সুতরাং তখন তাহার জীবন স্রোত জাগ্রত জীবনের দিকে ধাবমান হইয়াছে।

আপনারা হয় মায়ের কোলের শিশুকে আপন মনে হাসিতে, আপন মনে কাঁদিতে, আবার আপন মনে পা দোলাইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু সে শিশু; তাহার সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই; সে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব জানেনা, তবু আকাশের চাঁদ দেখিলে প্রেমাপ্লুতনয়নে তাহার দিকে নয়ন রাখিয়া, হস্তদ্বারা ডাকিতে থাকে; আকাশের চাঁদখানি খসাইয়া লইতে চায়। আবার দেখুন ঐ অষ্টমবর্ষীয় শিশু মধ্যাহ্ন প্রখর মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া সৌন্দর্য্য পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য বাগানের প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে আপন মনপ্রাণ ডুবাইয়া দিয়াছে। আবার ঐ দেখুন আর একটী শিশু প্রজাপতি ধরিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছে, কত উদ্যম করিতেছে। বার বার চেষ্টা করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হয় তাহার পশ্চাদানুসরণ করিতেছে, তবু লক্ষ্য ছাড়িতেছে না। প্রজাপতি এক ফুল হইতে অন্য ফুলে গমন করিতেছে, এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, তবু বালক তাহার পাছে পাছে আঠার মত লাগিয়া আছেই। ইহা দেখিলে কি মনে হয় না, যে ভগবান জাগ্রত-জীবনে এক প্রবল সৌন্দর্য্য পিপাসা রাখিয়া দিয়াছেন? মানুষের অন্তর্জ্জগতের বিষয় চিন্তা করিলে ইহাই কি প্রতীতি হয় না যে, এই সকল ভাব ভগবানের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা হইতে প্রসূত? ইহাই কি অনুভূতি হয় না যে, বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পিপাসা দিন দিন বর্দ্ধিত হয় এবং মানুষকে দেবতা করিয়া তুলে? কিন্তু হায়! অবোধ মানব, অমূল্য ধনরত্ন ফেলিয়া যদি কাচখণ্ড গ্রহণ না করিত, সংসারের অসার সুখের আশায় এই সৌন্দর্য্য পিপাসাকে যদি ম্লান করিয়া না দিত ইহ জগতের কঠোরতা স্বার্থপরতা এবং পাপ প্রলোভনের ভীষণ পঙ্কে পড়িয়া যদি এই সৌন্দর্য্য প্রবৃত্তি নিশ্চেষ্ট অসাড় ও মৃতপ্রায় হইয়া না যাইত, তবে এতদিনে পৃথিবী স্বর্গধাম হইত; এতদিন জীব জগৎ জাগ্রত-জীবন লাভ করিয়া দেবতায় পরিণত হইত। সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যে মানবগণের স্বভাবসিদ্ধ তাহা আর আপনাদিগকে বলিতে হইবে না। মানুষ সাংসারিক আসক্তি সমূহের সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও কঠোরতা ও স্বার্থপরতা বিপাকে পড়িয়া কোমলতা হারাইলেও, পাপ প্রলোভনের ক্রীতদাস হইলেও, অনেকস্থলে দেখা যায়, ভগবানের করুণাবল এমনই আশ্চর্য্য যে, এই সৌন্দর্য্য পিপাসা মানবজীবনে প্রবলভাবে জাগিয়া উঠে। সংসারাসক্ত ব্যক্তির হৃদয় স্বার্থপরতার ন্যায় প্রবাহিত থাকিলেও আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যশক্তি গ্রহণ করিবার জন্য কখন তাহার চিত্তকে চন্দ্রের পানে লইয়া যায়, কখন সমুদ্রের লহরীমালার মধ্যে ডুবাইয়া দেয়, কখন শিশুর

আধো আধো অস্ফুটন্ত স্বরে ও হাসিতে বিমুগ্ধ করে; কখন বা কোকিলকলকণ্ঠ বিনিস্থত সুধামাখা সঙ্গীত শুনাইয়া আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়। মানব মনে সৌন্দর্য্যপিপাসা ভরপুর—কিন্তু এই পিপাসা নিবারণ হয় কিসে? সুন্দর পদার্থকে গ্রহণ ও সুন্দর পদার্থের সহবাসে থাকায়। তখনই আমাদের সৌন্দর্য্য পিপাসা মিটিবে যখন আমরা সুন্দর পদার্থকে গ্রহণ করিতে পারিব। তখনই আমাদের আত্মসংযোগ হইবে, তখনই প্রকৃত জীবনলাভ হইবে যখন আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইব।

জগৎপতি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় জীবশ্রেণীকে আপনার সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বিকাশ করিয়া মানবকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার যাবতীয় প্রেমসৌন্দর্য্য শোভা আকৃতি বিকাশ করিয়া সাধকের চক্ষে প্রতিভাত করাইতেছেন। এই জন্যই জাগতিক সৌন্দর্য্যের এত গৌরব—এত মুগ্ধতা—এত প্রেম। নচেৎ সৌন্দর্য্য যদি প্রাণহীন জড়পদার্থের আবরণ হইত—সৌন্দর্য্য যদি কেবল মনের ভাব হইত, তবে কি সৌন্দর্য্য জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু বলিয়া অনুভূতি হইত, না অকৃত্রিম মনোমুগ্ধকর চিত্তবিনোদক হইত, না মানব মনকে আকুল করিয়া রাখিতে পারিত। তাই বলিতেছি—এই ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্য মানুষকে অনন্তের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মানুষ আদিম বর্ব্বর জাতিয়তাকে অতিক্রম করিয়া মনুষ্যত্বে আসিয়া পৌছিয়াছে এবং ইহারই শক্তি প্রভাবে প্রকৃত জীবনপথে ধাবিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু হায়! মানবের এমনই দুর্ভাগ্য যে, মানুষ সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যময়কে না দেখিয়া আপনার সুখস্পৃহা পরিতৃপ্তির উপকরণ খুঁজিয়া বেড়ায়। প্রেমের আকর্ষণ জাগ্রত-জীবন-স্রোতে আকৃষ্ট না করিয়া বাসনার মোহ কুহকেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বয়ক্রমানুসারে এই সৌন্দর্য্যের আকর্ষণই নানা ভাব ধারণ করে। একটী বালকের হাতে একটী লাল লাটিম বা একটী লাল রঙ্গিণ পুতুল কিম্বা অন্য কোন প্রকারের সুন্দর খেলনা দাও, দেখিবে বালকের মুখে হাসি ধরে না। তাহার হৃদয়ে যেন আনন্দ-উৎস উথলিয়া উঠিয়াছে। সেইগুলি লইয়া বালকের কত আনন্দ—কখন কোলে, কখন হাতে, কখন বুকে ধরিয়া রাখিতেছে, কখন বা চুম্বন করিতেছে। কিন্তু বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পন করিলে আর সে ভাব থাকেনা। শৈশবের চক্ষে এতদিন যাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যতরঙ্গ দেখিয়াছিল, যৌবনে আর তাহার প্রতি আকর্ষণ থাকে না। যৌবনের চক্ষে মানুষ—ধন সম্পত্তির মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখে—ঘর বাড়ীর মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখে—মানসম্ভ্রমের মধ্যে ও স্ত্রী পরিবারের মধ্যে

সৌন্দর্য্য দেখে। আবার যখন বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়—যখন ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইয়া পড়ে—সংসার আসক্তি যখন কমিয়া যায়—তখন মনে আবার অন্য এক নবভাবের আভা হৃদয়াকাশে নৃত্য করিতে থাকে। এ জগতে প্রতিক্ষণ দেখিতে পাইতেছি—বাল্যকালে যাহা সুন্দর,—যৌবনে তাহা ছেলেখেলা—যৌবনে যাহা আদরের—বার্দ্ধক্যে তাহার প্রতি আবার বৈরাগ্য।

এই পরিদৃশ্যমান জাগতিক সৌন্দর্য্যই আমাদিগের প্রকৃত জীবনক্ষেত্র। ধরাতলস্থিত একটী ক্ষুদ্র তৃণ হইতে গগণস্পর্শী মহীধর পর্য্যন্ত পরিদৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই জ্ঞান উদ্দীপক, শ্যামল বিটপীশির ও পবিভ্রমণকারী খদ্যোৎ হইতে অনন্তাকাশগরস্থ শশধর পর্য্যন্ত সকলই সৃষ্টির অতুল বিভবের পরিচায়ক। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা এই বাহ্য জগতের জাগতিক সৌন্দর্য্যের সহিত যতই পরিচিত হইতে থাকি এবং তদভ্যন্তরে কি এক অনির্ব্বচনীয় সত্বাব অনুভব করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হই;—ততই আমাদেব জীবন জাগ্রতপথে অগ্রসর হইয়া সৃষ্টি কৌশলের তাৎপর্য্য অবগতি হওয়াতে জগৎপতির নিকটবর্ত্তী হইতে পারি। সৃষ্টি হইতেই স্রষ্টার ধারণা, বাহ্যজগৎ হইতেই অন্তর্জ্জগতের উন্মেষ ও উন্নতি। অন্তরেন্দ্রিয়গণ বহিরিন্দ্রিয়ের সহযোগে বাহ্য-জগতের সহিত পরিচিত হইয়া অনন্তরাজ্যে তাহার সূক্ষ্মছায়া গ্রহণ করিয়া থাকে। স্থূল বা জড়জগতের ন্যায় বাহ্যজগৎ ক্ষণস্থায়ী নয়। যে জড় পদার্থের ছায়া মনে একবার গ্রহণ করিয়াছে—সেই জড় পদার্থ ধ্বংস হইলেও মনোগৃহীত তদীয় ছায়ার বিধ্বস্ত হয়না। এইরূপ ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে উপনীত হইতে থাকিলে—জাগ্রতজীবন ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত হইয়া একমাত্র নিত্য সূক্ষ্মতম বস্তু পরব্রহ্মের—সেই সচ্চিদানন্দের আভাসমাত্রও প্রতিফলিত হইয়াছে—তিনিই বিমল নিত্যসুখানুভব করিয়া পরমানন্দে জাগ্রতজীবন প্রাপ্ত হইবার উপযোগী। তাঁহার নিকট এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই আনন্দ-জনক। তিনি সর্ব্বত্রই সেই পরমাত্মার ছায়া অনুভব করিয়া শিবময় দেখিতে থাকেন। কারণ সততই তাঁহার অন্তরে বিমল প্রীতিপ্রবাহ ভাসমান থাকে। যাঁহার চিত্তে এই আনন্দপ্রবাহ, তাঁহার অন্তর সতত সেই আনন্দবারিবিধৌত হইয়া অতীব নির্ম্মল ও স্বচ্ছ—অতএব বিকাররাহিত্য। চিত্ত শুদ্ধ থাকিলে—অবিকৃত থাকিলে, দুঃখ বা অশান্তি স্পর্শ করিতে পারে না—কেন না মনের বিকারই দুঃখের জন্য। মন বিকৃত হইলেই আমিত্বের সঙ্কোচ হয়—আর আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ি। আমার স্থূল অতি সংকীর্ণ হয়—আমি এই আমার

ব্রহ্মাণ্ডের জীব হইয়া অতি সংকীর্ণ স্থানে স্বার্থরজ্জুতে আবদ্ধ থাকাতে জীবনে জাগতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে ভগবানের বিকাশ পরিলক্ষিত করিতে পারি না; সুতরাং জাগ্রতজীবন পাইবার যোগ্য হইতে পারি না। অতএব জাগতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহার প্রেম ও তাঁহার সৌন্দর্য্য না দেখিতে পারিলে, বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলে কখনই জাগ্রতজীবন পাইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জাগতিক সৌন্দর্য্যে ভগবানের সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত। এই জ্ঞান না থাকিলে মনের বিকার ঘুচে না। মনের বিকার না ঘুচিলে প্রকৃত জাগ্রতজীবন লাভ হয় না। জাগ্রতজীবন শান্তিময়। তাহাতে অশান্তি বা দুঃখ শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রণার অনুভূতি নাই।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!

ব্রহ্মচারী দেবব্রত।

শ্রীরামকৃষ্ণের নবভাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৫২ পৃষ্ঠার পর)

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে লাভ করিবার আবশ্যকতা জ্ঞান না হইলে, কখন লাভ করা যায় না। ঈশ্বর লাভের প্রয়োজন বোধ হইলে, সুতরাং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইবে এবং সেই অবস্থায় বিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হইবে। বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী হওয়া বা না হওয়া, প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। ঈশ্বরলাভের প্রয়োজন হইলে তবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ প্রয়োজন বৃদ্ধি হইলে তাহাকে অনুরাগ কহে। অনুরাগ বলিলে—কোন বস্তুর অতি-প্রয়োজন ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে, তাহা সম্পূরণ করিবার নিমিত্ত যে আগ্রহ জন্মায়, তাহাই অনুরাগ। ভগবানকে লাভ করিবার নিমিত্ত যাহার অতি প্রয়োজন হইবে, তাহার ভিতরে অনুরাগ উপস্থিত হইবে। এইরূপ অনুরাগ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবনে লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রেমের ব্যাপার, প্রেমহীন আমরা, ঈশ্বরের স্বরূপ তত্ত্বেই বিশ্বাস নাই, তাঁহাকে প্রেমানুরাগে লাভ করিয়া প্রেমময়ের সহিত প্রেমের খেলায় জীবন সার্থক করা আমাদের স্বপ্নের অতীত কথা। আমরা তাহা বিশ্বাস করি বা নাই করি, কিন্তু যে প্রেমিক প্রেমের সহিত তাঁহাকে আহ্বান করেন, প্রেমময় তাঁহারই হইয়া থাকেন। প্রেমের হরি, প্রেমের ভগবান; যিনি

প্রেম দিতে শিখিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন। প্রেমময় প্রেমেই বাঁধা দেন। প্রেম রজ্জুর স্বরূপ। প্রেম হলে, ভক্তের কাছে ভগবান বাঁধা পড়েন, আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্য্যন্ত হয়; ঈশ্বরকোটী না হইলে, মহাভাব বা প্রেম হয় না। প্রেমের অভিনয়ে কামের গন্ধ থাকিতে পারে না, এবং কামের অভিনয়ে প্রেম থাকিতে পারে না। প্রেম হৃদয়ের সামগ্রী, প্রেমময়ীর ভাব হৃদয়ে উদয় হইলেই তাঁহার উপস্থিতি উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাই যুগলের উপাসনা। শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করিতে করিতে এক ভগবানই দ্বিধা হইয়া সাধকের সমক্ষে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে দেখা দেন এবং ইহাই সাধনার চরম অবস্থা।

গুহ্যতম প্রেমের রহস্য ভেদ করাই ব্রজলীলার অভিপ্রায়। সংসারে শান্ত দাস্য ভাবাদি লইয়া নরনারীগণ অবস্থিত। সেই ভাব তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ। যাহার যে ভাব প্রবল, তাঁহার সেই ভাবই উত্তম। জীব যেমন আপনারা প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক সংসার সংগঠন করিয়া থাকে, এবং তাহা অতি অপূর্ব্ব, অতিশয় প্রীতিকর বলিয়া বুঝিয়া থাকে, ভগবানের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ হইলে ঐ প্রেমের যে কি অত্যাশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব মধুরতা জন্মিয়া থাকে, তাহা প্রেমিকেরাই সম্ভোগ করিয়া আপনাপনি বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। পঞ্চবিধ প্রেমের মধ্যে মধুর প্রেমেতেই মধুরতা অধিক। শ্রীরাধাঠাকুরাণী মধুর প্রেমশিক্ষার আদর্শস্বরূপা, এবং শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমই সম্ভোগ করিবার জন্য অধিক যত্ন করিতেন। গোপিকা প্রধানা বৃকভানুসুতা প্রেমময়ী শ্রীরাধাঠাকুরাণী যে প্রেমে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অস্থির করিয়াছিলেন, সেই প্রেমই বাস্তবিক ভগবান লাভের চূড়ান্ত কৌশল এবং উপায়। সংসারের ভিতরে কিরূপে ভগবানকে লাভ করা যায়, এই প্রেমে তাহারই নিদান প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সংসারে স্বার্থযুক্ত প্রেম বা কামের ক্রীড়ার বস্তু হইয়া কেমন করিয়া প্রেমময়কে লাভ করা যায়, তাহাই কৃষ্ণাবতারে লীলা করিয়া গিয়াছেন। যে নর নারী ভগবান লাভ করিয়া প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিবে, তাহাকে শ্রীমতীর ন্যায় অনুরাগিণী হইতে হইবে। শ্রীমতী আয়ানকে পতি জানিয়াও তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত পতিভাবে মধুর প্রেমবিহার করিয়াছিলেন, জীবগণ তাহাই শিক্ষা করিবে। শ্রীমতীর পতিত্যাগ করায় ব্যভিচারিণীর ভাব প্রকাশ পায় নাই, কারণ জড়-পতি ত্যাগ করিয়া অন্য জড়পতির অনুরাগিণী হইলে ব্যভিচারের কার্য্য হইত। শ্রীমতীর জড়পতি সাধারণ মনুষ্য ছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য নহেন, তিনি

পূর্ণব্রহ্ম হরি। তাঁহার সহিত জড় সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। তাই রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে গোপিকা প্রধানা শ্রীমতীর অনুরাগ কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়; যেহেতু তিনিই বিধিমতে কৃষ্ণের সহিত সহবাস সুখলাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরানুরাগীর প্রত্যেক কার্য্যে জটিলা কুটিলা স্বভাবরূপ লোকেরা দোষারোপ করিয়া বেড়ায়।

শাস্ত্র অর্থে শাসন। যাহা বা যদ্দারা শাসন করে তাহাই শাস্ত্র। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে, কি বহিঃরাজ্য, কি মনোরাজ্য, সকল বিষয়েই আমাদের শাসন ছিল, যাহা এক্ষণে শিথিল হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা সকলেই সেই শাসনানুযায়ীই পরিচালিত হইতাম; কিন্তু এখন তদ্বিষয়ে স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচার আসিয়া শাস্ত্রের স্থানগ্রহণ করিয়াছে, এখন শাস্ত্রের শাসন শোনে কে, মানে কে?

আমাদের শাস্ত্র সকল তিনভাগে বিভক্ত, যথা—বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্র। অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করা বৈদিকশাস্ত্রের অভিপ্রায়। অদ্বৈত অর্থে এক ব্যতীত দুই বুঝায় না। এক ভগবানই বিশ্বাত্মন্—আত্মারূপে অদ্বিতীয়। এই বিশ্বস্থিত এবং বিশ্বের অতীত যাহা কিছু আছে, ছিল ও হইবে, সমুদয় সেই এক পরমাত্মার বিরাট ভাব। তিনিই এক অদ্বিতীয় সৎ, সকল পদার্থের উৎপত্তির কারণ, সকল পদার্থের স্থিতির কারণ, স্থূলগঠনের ও পরিবর্ত্তনের কারণ। তিনিই জগৎ, তিনিই জগদীশ্বর এবং তিনিই জগদাতীত ব্রহ্ম। ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান এবং ইহাই বেদাদিমতের চরমাবস্থা।

ভক্তিপথে পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র কথিত হয়। লীলারসময়ের লীলাবলম্বনপূর্ব্বক পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে। এই নিমিত্ত পুরাণকে ঐতিহাসও কহা যায়। পুরাণ শাস্ত্রমতে অদ্বৈত ব্রহ্মের লীলারূপের উপাসনার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইতেছে। অনন্তশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম চিৎশক্তির দ্বারা অনন্ত অবতারের অভ্যুদয় করিয়া থাকেন। এই অবতার বা দেবদেবী, কার্য্যবিশেষে প্রকটিত হইয়া সাধারণ জীবের কল্যাণসাধন করিয়া থাকেন। জীবগণ এই বিশেষ বিশেষ অবতারদিগের অর্চ্চনা করিয়া দিব্যগতি লাভ করে। পুরাণশাস্ত্রাদি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের সাকাররূপের শাস্ত্র বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে। বেদাদি শাস্ত্রে তিনি আকারবিবর্জ্জিত ব্রহ্ম, পুরাণে আকারবিশিষ্ট দেবতা। যেমন ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের লীলারূপ। বেদে অদ্বিতীয় সৎবস্তুর গুণগান করেন, পুরাণে সেই অদ্বিতীয় সৎবস্তুর লীলারূপের গুণগান করিয়া থাকেন। উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক অদ্বিতীয় সৎবস্তু, কিন্তু কার্য্যপদ্ধতি স্বতন্ত্র প্রকার। বেদের কঠোর সাধন, পুরাণে সাধনের কঠোরতা

সেরূপ নহে। পুরাণের ভক্তি বা সাধারণ কার্য্য, দেবার্চ্চনাদি ভাব থাকায় সাধারণ জীব বিনা সাধনে, সে ভাবের কার্য্য সম্পন্ন করিতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। এজন্য সাধারণ জীবের কল্যাণসাধানার্থই শ্রুতি ও পুরাণের উৎপত্তি। উভয় স্থলে উদ্দেশ্য একই প্রকার, এই জন্য বেদ এবং পুরাণের পার্থক্য নাই। বেদান্ত মতে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা, পুরাণ এবং তন্ত্রমতে সগুণ সাকার মূর্ত্তির উপাসনা। ভক্তি না থাকিলে রূপের সেবা কি প্রকারে হইবে, এজন্য ভক্তিই মূল এবং বিশ্বাসই ঈশ্বরলাভের একমাত্র উপায়। বিশ্বাস বিনা ভগবানকে লাভ করা যায় না। কি অবিশ্বাস করিবে? সর্ব্বশক্তিমানের রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নহে। Nothing is impossible in this world. যাঁহার কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতি লয় হয়, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির অসাধ্য কি আছে? তাঁহাতে বিশ্বাস থাকিলে, তাঁহার সৃষ্টিতে অবিশ্বাস থাকিবে কেন? কুতর্ক ছাড়িয়া, কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, সবল বিশ্বাসী হইতে পারিলে জানিবার বুঝিবার দেখিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। এইজন্য তাঁহাকে বিশ্বাস করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, তাঁহার ভাব অনন্ত। আলোক হইতে ছটা বহির্গত হয়; ছটা বহু, কিন্তু আলোক এক। কেন্দ্র হইতে অসংখ্য সরল রেখা বাহির হইয়া পরিধি সম্পূর্ণ করিয়া থাকে। পরিধির বিন্দু সংখ্যা বহু, কিন্তু কেন্দ্র এক অদ্বিতীয়। বাটীর কর্ত্তা একজন কিন্তু পরিজন বহু। এই সকল দৃষ্টান্তের মধ্যে যদ্যপি একটী দৃষ্টান্তের ধারণা হয়, তাহা হইলে তাহাই বেদান্তপাঠের ফললাভের তুল্য। অদ্বৈতজ্ঞানই বেদান্ত শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এইরূপে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক, কালী বলিয়া হউক, দুর্গা বলিয়া হউক, শিব বলিয়া হউক, রাম বলিয়া হউক, কৃষ্ণ বলিয়া হউক, গৌরাঙ্গ বলিয়া হউক, আল্লা বলিয়া হউক, অথবা যীশু বলিয়াই হউক, যে ব্যক্তি যে ভাবে ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন, তাঁহার সেইভাবেই মনোরথ পূর্ণ হইবে। ইহাই রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

প্রার্থনা।

ভগবান! তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই শক্তি, তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি, তুমিই বিরাট, তুমিই সরাট, তুমিই নিত্যলীলাময়, তুমিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। তুমিই ভর্ত্তা, তুমিই কর্ত্তা, তুমিই বিধাতা, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণও তুমি। হে ভগবান, আমি শরণাগত, আমাকে বিশ্বাস ভক্তি দাও, যেন তোমাকে

আত্মসমর্পণ করিতে পারি। হে প্রভু, তুমি প্রভু, আমি দাস, কিন্তু ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, কর্ম্মহীন, ভক্তিহীন। আমাকে বিশ্বাস ভক্তি দাও, যেন তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। হে দয়ার সিন্ধু! আমি তোমার শরণাগত। শরণাগতকে আশ্রয় দাও, যেন ইন্দ্রিয়সুখে আর মন না যায়, বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি দাও। অন্যায় কর্ম্ম যা করেছি আর যেন না করি, দুর্ম্মতি দূর কর, সুমতি দাও, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধ ভক্তি দাও, নিষ্কাম অমলা, অহেতুকী ভক্তি ও বিশ্বাস দাও, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। হে ঠাকুর, আমার কি ভালমন্দ তা বুঝি না, যা আমার কল্যাণকর, তাই তুমি বিধান কর, যাহা কল্যাণ, তাই আমার মধ্যে প্রেরণ কর। তুমি বাক্যমনের অগোচর, কিন্তু তুমি অন্তর্য্যামী, আমি প্রকাশ্য স্তবস্তুতি প্রার্থনা জানিনা, আমাকে মোহ পাপ হইতে রক্ষা কর, ভক্তিবিশ্বাস দাও, যেন তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি হরি ওঁ।

শ্রীআনন্দগোপাল সেন বি, এ।

নেশা।

আমাদের দেশের ছোট বড় সকলেরই ধারণা যে, মদ, গাঁজা প্রভৃতি দ্রব্যই নেশা। এই সমস্ত জিনিস সেবন করিলে মনুষ্য-চিত্ত বিকৃত হয়, তাই এ সমুদয় দ্রব্য নেশানামে অভিহিত। এই সমস্ত জিনিস যে সেবন করে, তাহাকে আমরা নেশাখোর বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি। আর যে সেবন না করে, তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া আদর করি। এরূপ ধারণা আমাদের ন্যায় লোকেরই শোভা পায়। যিনি বাস্তবিক জ্ঞানী, তিনি বোধ হয় এরূপ ধারণা হৃদয়ে পোষণ করেন না, তাঁহার ধারণা অন্যরূপ।

এ সংসারে আমাদের ন্যায় অজ্ঞলোকের কোন জিনিসে নেশা না হয়? আমরাত দেখি, আমাদের পক্ষে সমস্তই নেশা। আমরা সর্ব্বদা যে নেশা সেবন করি, তাহার কাছে মদ, গাঁজা প্রভৃতি নেশা অতি তুচ্ছ পদার্থ। মদ, গাঁজার নেশা অতি সামান্য সময় মানুষকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখে। সেবন করিবার কিছুক্ষণ পরেই তাহার নেশা ছাড়িয়া যায়। ছাড়িলেই মানুষ আবার প্রকৃতিস্থ হয়। কিন্তু সাংসারিক লোক আমরা, আমরা সর্ব্বদার জন্য যে নেশায় বিভোর হইয়া আছি, সে যে কি ভয়ঙ্কর নেশা, সে নেশার যে, কি সম্মোহিনীশক্তি তাহা

আমাদের উপলব্ধি করিবার সাধ্য নাই। যে নেশাখোর, সে কখনও নেশার অনুপকারিতা বুঝিতে পারে না। যিনি মদ, গাঁজা প্রভৃতি নেশা সেবন করেন না, তিনি যেমন নেশাখোরকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, সেইরূপ জ্ঞানীলোকও আমাদের ন্যায় নেশাখোরকে অবজ্ঞা করেন। যাহারা আমাদের মতে নেশাখোর, তাহারা সামান্য দুই চারিটীমাত্র নেশাই সেবন করে। আর আমরা যে, কত রকম নেশা সেবন করি, তাহা ভাবিলেও ভয়ে হৃদয় বিকম্পিত হইয়া উঠে।

জ্ঞানীলোক বলেন যে, "এ সংসার কেবল নেশাতেই পরিপূর্ণ। ছোট, বড়, ধনী, মানী সকলেই সংসার মদিরাপানে অচৈতন্য। লোকে বুঝিতে পারেনা, তাই প্রাণহন্তা নেশাকে আপনবোধে সমাদর করে। যদি বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে সকলেই অবজ্ঞাসহকারে সেই সমস্ত অনিষ্টকারী নেশা পরিহার করিত।" একদিন এক মহাত্মা সন্ন্যাসী বড় দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন যে, "একজন আত্মাভিমানী ধনীলোক, আমাকে নেশাখোর বলিয়া তিরস্কারপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সে নেশাখোর, সে সময়ে ইহা মনে করিল না যে, সে নিজে কি ভয়ঙ্কর নেশায় উন্মত্ত। আমি নিজে নেশা খাই সত্য, কিন্তু নেশা খাইয়া ঐ নেশাসেবনোন্মত্ত লোকের ন্যায় হতচৈতন্য হইনা। আমি নেশা সেবন করিয়া ভগবানের দিকে লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করি। আর ঐ অভাজন এমন কালকূট সেবন করে যে, তাহার গুণে উহার অন্তঃকরণে ভগবানের স্মৃতিও উদিত হয়না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমি যে, নেশা খাই তাহা অপেক্ষা ঐ ব্যক্তি যে নেশা সেবন করে, তাহা সমধিক মারত্মক।"

সত্য কথা! ঠিক কথা! আমরা যে নেশার সেবন করি, তাহা বাস্তবিকই মানবের অকল্যাণজনক। মদ, গাঁজা প্রভৃতি নেশাসেবনে লোক অজ্ঞান এবং কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হয় বলিয়াই, ভদ্রসমাজ সে সমুদয় দ্রব্যকে ঘৃণা করিয়া থাকে। আমরা বলি, যে জিনিসই লোকের কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত করে, সেই জিনিসই নেশা, সেই জিনিসই ঘৃণিত। যে জিনিস ঘৃণিত, যে জিনিস কুৎসিত, তাহা সকলেরই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এজগতের বৈচিত্র্যতাই এইটুকু যে, আমার কাছে যাহা ঘৃণিত, তোমার নিকটে তাহা আদৃত। আমার পক্ষে যাহা উপকারী, তোমার পক্ষে তাহা অনুপকারী। কোনও দ্রব্যকেই সংসারের সমুদয় লোক সমান চক্ষে দেখে না। এবং কোন দ্রব্যই সংসারের যাবতীয় লোক ব্যবহার করিয়া সমান ফল প্রাপ্ত হয় না। দুগ্ধ, ঘৃত যে এমন উৎকৃষ্ট জিনিস তাহাও সকলে সমানভাবে ভালবাসে না, এবং সে জিনিসও সকলকে সমান ফলপ্রদান

করে না। যাহার দুগ্ধ, ঘৃত ভোজনে কোন অসুখ না হয়, তাহার স্বচ্ছন্দচিত্তে খাওয়া উচিৎ। আর যাহাব খাইলে অসুখ হয়, তাহার পক্ষে না খাওয়াই মঙ্গল। এইরূপ গাঁজা, মদ সেবন করিয়া যে কর্ত্তব্যের পথ হইতে অপসৃত হয়, তাহার পক্ষে গাঁজা, মদ, ভাং প্রভৃতি কোন রকম নেশাই সেবন করা বিহিত নয়। আর যিনি এই সমস্ত মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া কর্ত্তব্যের পথে অটল, অচল হিমাদ্রির ন্যায় দণ্ডায়মান থাকেন, তাঁহার পক্ষে গাঁজা, মদ প্রভৃতি নেশা সেবন করা নিন্দনীয় কার্য্য নহে।

এ সংসারে মানব কোন অভিপ্রায়ে আসিয়া জন্মপরিগ্রহ কবিয়াছে? মনুষ্যের এসংসারে অবশ্য কর্ত্তব্য কোন কার্য্য? ধর্ম্মবক্ষা। ধর্ম্মের—লক্ষণ কি? শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"প্যাত্রে দানং মতি কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনং।
শ্রদ্ধা বলি গবাং গ্রাসং ষড়্‌বিধং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

ইহাই সনাতন ধর্ম্মের লক্ষণ। এই লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্মের দিকে যাহার লক্ষ্য থাকে তিনিই ধার্ম্মিক। ইহাই যিনি পালন করেন তিনিই কর্ত্তব্যপরায়ণ। যিনি গাঁজা, মদ প্রভৃতি নেশা সেবন কবিয়াও দানগ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তিকে দান কবেন, ভগবানেব শ্রীপাদপদ্মে মতি বাথেন, পার্থিবদেবতা পিতামাতাকে সেবাসুশ্রূষা কবেন, সাধুসজ্জনকে শ্রদ্ধা করেন, পরলোকগত পিতৃ পিতামহাদিব উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ করেন, এবং জগন্মাতা গোলক্ষ্মীকে যত্নপূর্ব্বক পানাহাবেব দ্বারা পরিতুষ্ট করেন তিনি চণ্ডাল হইলেও দ্বিজোত্তম, দরিদ্র হইলেও ধনী, ঘৃণ্য হইলেও পূজ্য। আর যিনি গাঁজা মদ সেবন না করিয়াও এই সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্যে বৈমুখ, তিনি নেশা না খাইলেও নেশাখোর, ধনী হইলেও দরিদ্র, ব্রাহ্মণ হইলেও চণ্ডাল।

যে জিনিস মনুষ্যচিত্ত বিকৃত করে তাহাই নেশা। আমাদের চিত্ত কি, কেবল গাঁজা, মদ প্রভৃতি সেবনেই বিকৃত হয়, না বিকৃত হইবার আরও কিছু আছে? আছে, সেগুলি এই পুত্র, কন্যা, কলত্র, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, বিষয়, সম্পত্তিসমূহ। ভাবুক! একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি যে, এই সমস্ত বিষয়ে মনুষ্যচিত্ত গাঁজা, মদের অপেক্ষা অধিকতর আসক্ত কিনা! নেশা অর্থে আসক্তি, যাহার যে জিনিসে আসক্তি জন্মে, সেই জিনিসই তাহার পক্ষে নেশা। বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রী এক রকমের নেশা, পুত্র এক রকমের নেশা, কন্যা এক রকমের নেশা, এইরূপ আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, বিষয়, সম্পত্তি প্রভৃতি এক একটী এক এক রকমের নেশা। আমরা এই নেশা

সেবনের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। আমরা এই নেশা সেবনে মোহিত হইয়া সদসৎ জ্ঞান হারাইয়া ব্যস্তসমস্তচিত্তে ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি করি, পরস্পর পরস্পরের সহিত ছল, প্রবঞ্চনা করি, ভাই ভাই মারামারি, গালাগালি করি, উভয়ে উভয়ের মস্তকে লগুড়াঘাত করিবার জন্য উদ্যত হই। এমন কি আজকাল স্ত্রীরূপ নেশায় আমরা এতই লুব্ধ হইয়াছি যে, যে পিতামাতার জন্য আমরা এই ভব সংসারের মুখ দেখিয়াছি, সেই শ্রদ্ধার পাত্র, পরম পূজার পাত্র, পিতা মাতাকেও নিপীড়ন করিতে পশ্চাৎপদ হইনা। হাঁ ভাই! বল দেখি, সংসারে ইহার অধিক আর কি পাপ আছে? এক্ষণে একবার তোমরাই বিচার করিয়া দেখ দেখি যে, গাঁজা, মদের নেশা লোককে পাপহ্রদে নিমগ্ন করে, না স্ত্রীপুত্রাদির নেশাই পাপে বিলিপ্ত করে।

আজকালকার অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ লইয়াই সংসার, নতুবা সংসার কিসের? আমরাও একথা অবনত মস্তকে স্বীকার করি। এ উক্তির প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই সত্য, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের আছে, আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ মর্ম্মভাগ এখানে প্রদান করিব। শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, যে লোক ভগবানের সেবা মুখ্য, আর সংসারের সেবা গৌণ জ্ঞান করেন, তিনিই প্রকৃত সংসারী। পূর্ব্বে ভগবানের সেবা করিয়া, যিনি পশ্চাৎ সংসারের সেবা করেন, তিনিই পুণ্যবান, তিনিই ভাগ্যবান, তিনিই অন্তিমে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিকটে গমন করেন। আর যিনি ভগবানের সেবা না করিয়া সংসার সেবাই জীবনের একমাত্র সার বোধ করেন, তিনি মানুষ নহেন, পশু। তাঁহার সংসারও মানুষের সংসার নহে, শৃগাল কুকুরের সংসার। ভগবান বৈমুখ ব্যক্তি পরলোকে দারুণভয়ে ভীত হইয়া হাহাকার করে। সেখানে, সে চিরজীবন ভরিয়া যাহাদের প্রাণ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়জ্ঞান করিয়া সেবা করিয়া যায়, সেই সমস্ত স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, কেহই তাহার সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত হয় না। এমন কি দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, পতিতের বন্ধু ভগবানও সেখানে তাহার সহায়তা করিবার নিমিত্ত গমন করেন না। যেহেতু তিনি কাহারও অনুগত ভৃত্য নহেন যে, সমস্ত জীবন তাঁহাকে বিস্মৃত থাকিলেও তিনি তোমার শেষদিনে, যেদিন কাল-বাহন মহিষের গলসংলগ্ন ঘণ্টার ধ্বনি ঘন ঘন তোমার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিবে, সেইদিন—তুমি তাঁহাকে আজীবন স্মরণ মনন না করিলেও তিনি আসিয়া ভীত ও সন্ত্রস্তজন—তোমাকে রক্ষা করিবেন। তাহা যদি হইত তাহা হইলে সাধনভজন

হইত না। তাই ভগবদ্ভক্ত স্বভাবকবি দাশরথি পূর্ব্বে সাবধান হইবার নিমিত্ত আমাদিগকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন—

"কিজন্য ভবরোগে ভোগরে অন্ধ মন।
ত্যজ উহাহার সংসার এখন,
তারা নাম মহৌষধি কর রে সেবন॥"

একথার ভাবার্থ এই যে, যিনি ভগবদ্ভজন না করিয়া কেবল সংসার সেবা করেন, তিনিই পুনঃ পুনঃ এই ভবধামে আসিয়া নানাবিধ যাতনাকর ব্যাধি ভোগ করেন। তাঁহার পক্ষে এসংসার ব্যাধিরই কারণ। তাই কবি বলিতেছেন যে, যদি এরোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সংসার সেবা না করিয়া অসারের অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদির নেশায় বিমোহিত না হইয়া ভবতারিণী, নিস্তারকারিণী তারা মায়ের নামামৃতরূপ মদিরা বদন ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া সেবন কর। আর সেই নেশা পানোন্মত্তাবস্থায় 'জয় কালী' 'জয় তারা' বলিয়া মহানন্দে নৃত্য কর।

এসংসারে ভগবানের উদ্দেশ্যে যে জিনিস ব্যবহৃত না হয়, সে জিনিস ব্যবহার বৃথা। শাস্ত্র বলিয়াছেন—অন্নং বিষ্ঠা পয়োমূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতং" অর্থাৎ অন্ন জল প্রভৃতি যে কোনও দ্রব্যই কেন না হউক, ভগবানকে অর্পণ না করিলে সে সমুদয় দ্রব্য মলমূত্রে পরিণত হয়। ভগবানকে উপলক্ষ করিয়া কেহ যদি কোনও প্রকার কুৎসিৎ জিনিসও ব্যবহার করেন, তাহা হইলে সে জিনিস ব্যবহার কখনই নিরর্থক হয় না। তাই মহাত্মা প্রহ্লাদ ভীষণ কালকুট ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন। গাঁজা, মদও যদি কেহ ভগবানকে উপলক্ষ করিয়া সেবন করে, তাহা হইলে সে জিনিস তাহার অভীষ্টসিদ্ধির কখনই অন্তরায় হয় না। একথা কলির মুক্তি শাস্ত্র তন্ত্র, গুরু গম্ভীরস্বরে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছে। কিন্তু যাহারা কেবল আমোদের জন্য ব্যবহার করে, তাহারাই অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। ব্যবহারের দোষেই জিনিস কুফল প্রসব করে। এইরূপ যিনি, ভগবানের সংসার—আমি তাঁহার দাস, আমি তাঁহার আদেশ প্রতিপালনের জন্যে এখানে আসিয়াছি, এই জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ধর্ম্মপথে থাকিয়া সংসার করেন, তিনিই সংসারপ্রসূত অমৃতময়ফল দর্শন করিয়া আনন্দিত হন। আর যিনি, আমিই কর্ত্তা—এই জ্ঞান প্রণোদিত হইয়া সংসার পালনে প্রবৃত্ত হন, তিনিই বিষময় ফল দেখিয়া বিষাদসাগরে ভাসমান হন। এই সমস্ত দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, জিনিসের কোনই দোষ নাই, দোষ

আমাদের ব্যবহারের ;—তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, মানব যেন কিছুরই প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করে "ন কঞ্চিদবজানিয়াৎ"।

যাঁহারা গাঁজা, মদ সেবন করেন না, কিন্তু স্ত্রী, পুত্র, বিষয়াদির নেশায় সম্মুগ্ধ, তাঁহাদিগকে দুই একটী কথা বলিব। তাঁহারা গাঁজা, মদ সেবন করেন না সত্য ;—গাঁজা, মদ সেবন করিলে লোকের পশুত্ব আনয়ন করে, তাই তাঁহারা সে সমস্ত দ্রব্য সেবনকরা দূরের কথা, তাহার নামও করেন না। কিন্তু তাঁহারা গাঁজা, মদের অপেক্ষাও যে, কি ভীষণ নেশা সেবন করেন, তাহা কি ভ্রমেও একবার ভাবিয়া দেখেন? গাঁজা মদ সেবনে লোকের যেমন জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ স্ত্রীপুত্রাদির নেশাতেও লোকের সংজ্ঞাবিনষ্ট হয়। জ্ঞানের অভাব হইলেই মানুষ পশুমধ্যে পরিগণিত হয় "জ্ঞানেনহীনাঃ পশুভিঃসমানাঃ" জ্ঞান চক্ষে দেখিলে বোধ হয়, লোকের সংসারে যেমন কুকুর থাকে, সেইরূপ বিষয়-নেশা সেবন রত লোকসমূহ স্বীয় স্বীয় স্ত্রীপুত্রাদির নিকটে অবস্থান করে। এরূপ অবস্থায় যাঁহারা গাঁজা, মদ সেবন করেন না, তাঁহাদের পৌরুষ কি? কেহ না হয় গাঁজা, মদ খাইয়া অজ্ঞান হয়, কেহ না হয় স্ত্রীপুত্রাদির নেশাতে অজ্ঞান হয়। তাই বলি, উভয়েই যখন সমান দোষে দোষী, তখন এক-জনের প্রতি আর একজনের ঘৃণা করা শোভা পায় না।

গাঁজাখোর যেমন গাঁজার অভাবপূর্ণ করিবার জন্য, মাতাল যেমন মদের অভাবপূর্ণ করিবার জন্য, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া একজনের মস্তকে প্রহারকরতঃ তাহার যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, সেইরূপ স্ত্রী, পুত্রাদির নেশাবিমুগ্ধ লোকও তাহাদের অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য অপরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় এই দ্বিবিধ নেশার কোনও প্রকার নেশাই লোকের মঙ্গলদায়ক নহে। তবে যিনি জ্ঞানী, যাঁহার ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে, তিনি স্বেচ্ছামত যে কোন নেশাই কেননা হউক ব্যবহার করিতে পারেন। যেহেতু নেশা তাঁহাকে প্রমুগ্ধ করিতে পারে না; তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, অজ্ঞান লোকের পক্ষে বিদ্যা, ধন, জন প্রভৃতি যে কোন দ্রব্যই কেননা হউক নেশা বলিয়া জানিবে অর্থাৎ অজ্ঞান লোক যদি ঐ সমস্ত জিনিস প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা ঐ সমস্ত জিনিসের নেশায় আত্মহারা হইয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করেন, এবং সাধু সজ্জনসমাজে অশান্তি উৎপাদন করেন। আর সাধুলোকে ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা তাহার নেশায় আত্মবিস্মৃত হন না।—

"বিদ্যামদ ধন মদ তথৈবাভিজনোমদ।
এতেমদাবলিপ্তানাং তয়েবচ সতাং দমঃ॥"

তাই আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে, মদ, গাঁজা প্রভৃতির নেশা ও স্ত্রীপুত্রাদির নেশা পরিহার করিয়া ভগবানে যাহাতে নেশা জন্মে সেইরূপ চেষ্টা করাই মানবের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ভগবানে আসক্তি জন্মিলে, অন্য কোন নেশাবই আবশ্যক হইবে না। গাঁজা মদের নেশায় ও স্ত্রীপুত্রাদির নেশায় আনন্দ হয় সত্য, কিন্তু সে নেশা ক্ষণস্থায়ী। তাই বলি ভাই! এ অনিত্য নেশা পরিত্যাগ করিয়া, যে নেশায় মহাদেব উন্মত্ত, যে নেশার প্রকোপে তাঁহার দিব্য চক্ষু আরক্ত ও ঢুলু ঢুলু, সেই নেশা, সেই ভগবানের নামামৃত নিত্য নেশায় উন্মত্ত হও। তাহা হইলে জন্ম ও জীবন সফল হইবে। সে নেশার পরিণাম ভয়াবহ নহে, আনন্দময় বলিয়া জানিবে।

শ্রীকান্তিবর ভট্টাচার্য্য।

গীত।

সুর—বেহাগ, কাওয়ালী।

এস হৃদয় আসনে মোহ বিনাশন, আমারি হৃদয়রঞ্জন।
এস পরমসুন্দর, সকল তাপহারী প্রলোভন ভয়ভঞ্জন॥
এস পরম নন্দন প্রীতির নিলয়,
স্নেহ নির্ঝর ভকতি আলয়,
শুদ্ধ পরশনে শুষ্ক মরুমাঝে করগো অমৃত সিঞ্চন॥
এস বিশ্বসার মম হৃদয় দেবতা,
পুত্র, সখা, গুরু, ইষ্ট, পিতা মাতা,
পরম ধন তুমি, তুমি হৃদয়স্বামী
অন্ধ আঁখি জ্যোতি অঞ্জন॥

শ্রীবলদেব রায়।

বিপন্ন উকীলের জন্য সাহায্য প্রার্থনা।

হে হৃদয়বান দানশীল পাঠকগণ! আজ আপনাদের সমক্ষ আমাদের প্রিয় সুহৃদ্ ও গুরুভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবারবর্গ বিপন্নাবস্থায় পতিত হওয়ায় ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলাম। দীন, দরিদ্র অসহায় ভদ্রসন্তানকে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অতিশয় কষ্ট পাইতে দেখিলে কোন ভারতবাসীর প্রাণে না করুণার সঞ্চার হয়? দেবেন্দ্রনাথ বল্লিষ্ট কায়স্থ-কুলোদ্ভব, কলিকাতায় পটলডাঙ্গায় ইঁহার আদি নিবাস, পিতার নাম ৺রমেশচন্দ্র ঘোষ। পিতা বর্ত্তমানে নিজ বসতবাটীতে সাদরে ও যত্নে পালিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ রিপণকলেজে পাঠ করিতেন। বুদ্ধিমান দেবেন্দ্রনাথ আপন অধ্যবসায়ে বিএ, বি, এল পাশ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা ঋণগ্রস্ত হওয়ায় নিজ বসতবাটী বিক্রয় করিয়া বাটীভাড়া করিয়া বাস করিতে থাকেন। কয়েকবৎসর পরেই তাঁহার পিতার দেহত্যাগ হয়। কলিকাতার পুলিশকোর্টে নিজ প্রতিভাবলে দেবেন্দ্রনাথ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতে থাকেন। কয়েক সহস্র টাকা সঞ্চিতও করিয়াছিলেন। সেই অর্থের কিয়দংশে তাঁহার ছোট ভগ্নীর বিবাহ দেন। তারপরই দেবেন্দ্রনাথ বাতরোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এই রোগের দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাকে কর্ম্মস্থলে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল। যে কিছু অর্থ সঞ্চিত ছিল, তাহা চিকিৎসায় ও ভরণপোষণে নিঃশেষে ফুরাইয়া যাইল। তখনও দেবেন্দ্রনাথ মনে করিতেছিলেন যে, শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরায় অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইবেন। সুতরাং ভগ্নীপতির বাসাবাড়ীতে গিয়া চিকিৎসার চেষ্টা করাইতে লাগিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার ভগ্নীর দেহত্যাগ হইল। ভগ্নীপতির নিকট হইতে যাহা সাহায্য পাইতেছিলেন, তাহাতে ক্রমে ক্রমে বঞ্চিত হইলেন। ভগ্নীপতি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া অন্যত্র বসতি করিলেন। বিপদের উপর কেবলই বিপদ বাড়িতে লাগিল। কয়েকবৎসর দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধুগণই অর্থ সাহায্য করিতেছিলেন, তাহাতেই কোনরূপে দিনাতিবাহিত করিতেছিলেন, কিন্তু কতদিন বন্ধুগণ প্রতিমাসে একটী পরিবারের ভরণপোষণের সমুদায় ভারগ্রহণ করিয়া মাসে মাসে অর্থসাহায্য করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে সক্ষম হয়েন? আজ আটবৎসর হইল, দেবেন্দ্রনাথ পীড়িত, এক্ষণে উঠিবারও শক্তি নাই। দেবেন্দ্রনাথের আপন ভ্রাতা নাই, আপন খুল্লতাত নাই। দেবেন্দ্রনাথের সংসারে তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও দুইটি পুত্র সন্তান ও

বাটীভাড়া ও এতগুলি লোকের ভরণপোষণে এই কলিকাতা সহরে যে অর্থের প্রযোজন, তাহার কিছুরই সংস্থান নাই। এক সময়ে দেবেন্দ্রের দুধে চিনি ছিল, এখন তাঁহার শাকান্ন মিলিবারও উপায় নাই। যাঁহারা বাল্যকালাবধি কষ্টে প্রতিপালিত, তাঁহাদেরই এইরূপ অবস্থায় যে ক্লেশের অবধি থাকে না, তাহা বলাই বাহুল্য। আর ভদ্রসন্তান, পিতামাতার মহা আদরে পালিত ও যশস্বী উকীল, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যিনি ওকালতী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কত দীন দরিদ্রগণকে সাহায্য করিয়াছেন, আজ তিনি ভিক্ষান্নে পালিত, ইহা দেখিয়া কোন্ পাষাণ প্রাণ না বিগলিত হয়। যাঁহার দেখিবার ইচ্ছা হইবে, তিনি একবার ২৮৮নং অপারসারকুলার রোডে দেবেন্দ্রনাথের বিপন্নাবস্থা দেখিয়া আসিবেন। দেবেন্দ্রনাথের ভালরূপে চিকিৎসা ও ভরণপোষণের জন্য আজ কাকুড়গাছী যোগোদ্যানের সেবকমণ্ডলী (দেবেন্দ্রনাথের গুরুভ্রাতাগণ) ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে, সাধারণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। যিনি যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু সাহায্য করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে এবং তত্ত্ব-মঞ্জরী ও বসুমতীতে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইলেই হইবে, অথবা দেবেন্দ্রনাথের নিকট দিয়া আসিলেও চলিবে।

স্বামী যোগবিনোদ, শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির,
কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান, কলিকাতা।

সাহায্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, নিম্নলিখিত সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে বিপন্ন উকীল দেবেন্দ্রনাথের জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ঘোষ, কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী গোলাপকামিনী বসু, সিলং	২।৹
শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র লাহিড়ী, পাবনা	২॥৹
,, হরিশচন্দ্র সেন গুপ্ত, বি, এ, কর্ণেলগঞ্জ, এলাহাবাদ ...	৫৲
জনৈক সহৃদয়া ভদ্র মহিলা, কলিকাতা	৪৲
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, সিমলা দরিদ্র-ভাণ্ডার, খোক্‌সা, নদীয়া	৫৲
জনৈক বন্ধু, মিলিটারি একাউণ্টস্ অফিস্, কলিকাতা ...	॥৹
মিষ্টার প্রহ্লাদের রুদ্রপা	॥৹
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সরকার, ...	১৲
মোট ...	২২৲

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে সংবাদপত্রে বিপন্ন দেবেন্দ্রনাথের বিষয় অবগত হইয়া ডাক্তার এ, ডি, মুখার্জ্জী, (nerve specialist, New york, U. S A) আমাদের পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা করিতে ইচ্ছুক। এই সময় আমদপুর, বেলের কবিরাজী চিকিৎসায় কোন উপকার না হওয়ায়, এবং দেবেন্দ্রনাথের যন্ত্রণা অত্যধিক হওয়ায়, আমরা উপরিউক্ত ডাক্তার বাবুর সহিত দেখা করিয়া, তাঁহারই চিকিৎসা করাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। তিনি ১৩ই জানুয়ারী হইতে ইলেকট্রিক চিকিৎসা করিতেছেন।

সাহায্যের খরচের হিসাব।

২রা জানুয়ারী	১৯১১,	দেবেন্দ্রনাথকে সংসার খরচের জন্য	৪৲
,,	,,	আমদপুর, বেলে হইতে কবিরাজের যাতায়াতের রেল ভাড়া	২৸/১০
,,	,,	ঐ কবিরাজের দর্শনী স্বরূপ	৫৷০
,,	,,	কবিরাজী তৈল /২	৫৲
১১ই জানুয়ারী	,,	দেবেন্দ্রের সংসার খরচের জন্য	২৲
১৪ই ,,	,,	অলিভ অয়েল	৷৷/১০
		মোট	১৯৸৴০

জমা	২২৲
খরচ	১৯৸৴০
বাকী	২/০

আঁখিজল।

কেন মম আঁখিজল, ঝুরিছে অবিরল ?
গুণমণি গেছে চলি' কাঁদিয়া কিবা ফল !
আর না আসিবে, প্রেম বিলাবে ভূতলে।
আঁধার ঘুচাতে, আলোকিতে মহীমণ্ডলে॥
আর না শুনিব ভাইরে সে মধুময় বাণী।
আর না হেরিব ভাইরে তাঁর শ্রীমুখখানি॥

আর কে শিখাবে ভাই, তত্ত্ব-নীতি-কাহিনী।
ডুবিয়ে গিয়াছে ভাই, জ্ঞান দিবাকর মণি॥
পৃথ্বীকোলে এসেছিল যেই সত্য অবতার।
চলে গেছে কাঁদাইয়া রামকৃষ্ণ গুণাধার॥
কীর্ত্তি যাঁর ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত ঐ ভারতে।
আদি অনাদি প্রভু তুমি, নমি গো পদেতে॥
বৃথা জন্ম, কর্ম্ম, তোমা ভিন্ন হেরি সব শূন্য।
ভুবনপালন, জনার্দ্দন তুমিই হে ধন্য॥
আঁখিবারি অনিবারি শোক পড়ে উছলি।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সদা ঝুরিতেছে কেবলি॥

সেবক—শ্রীমনোহরচন্দ্র বসু।

কল্পতরু উৎসব।

১লা জানুয়ারী, ঠাকুরের কল্পতরু উৎসব কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে, ইটালী রামকৃষ্ণ মিশনে এবং অন্যান্য নানাস্থানে সম্পন্ন হইয়াছে। কটকের ভক্তগণ বিশেষভাবে এই উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে রচিত 'প্রীতি-উপহার' নিম্নে মুদ্রিত হইল।

প্রীতি-উপহার।

কেহে তুমি পাখীবর সংসার কাননে—
উঠিয়া প্রভাতে আজ সুমধুর স্বরে—
গাহিছ স্বর্গীয় গান অতি হৃষ্টমনে?
শুনিলে পরাণ কাঁদে; অশ্রুধারা ঝরে!। ১।

'ভাঙ্গিব প্রেমের ভাণ্ড' শুনি গান হ'তে—
ছুটিছে ভকত লয়ে হৃদয়-পিঞ্জর;
কেমনে ধরিবে তারা জানিব কি মতে—
শুনিতে প্রেমের গান নিত্য নিরন্তর?। ২।

পাখী এক; কিন্তু তুমি পিঞ্জরে সবার;
তোমাতে কেহ বা কালী, কেহ কৃষ্ণ হেরে;

এ কি ঐ নূতন কথা শুনিনু আবার ?
কে কোথা শুনেছে বল দেশদেশান্তরে ! । ৩।

পাখিহে। তরুতে বসি গাও তুমি গান ;
কহ কেন থাকি থাকি তিতি চক্ষু জলে
মাতিয়ে উঠাও তব সঙ্গীগণ প্রাণ ?
অশ্রু কি গড়িয়া পড়ে প্রেমের বিহ্বলে ? । ৪।

তরু শাখে শাখে দোলে কত ফল হায়।
'জ্ঞান', 'ভক্তি', 'কর্ম্ম', 'মায়া', নাম দেয় তার,
যে ফলে বাসনা যার, সেই ফল পায়.
চিনিয়া লওয়াটী সুধু কঠিন ব্যাপার !! । ৫।

কেবা চেনাইয়া দেবে ? জানিব কেমনে ?
ওহে পাখি! বহুরূপ! গুরুরূপ ধরে—
আসিবে আমার কাছে ? পারিব যতনে,—
সুধু চেনাইতে শুদ্ধা-ভক্তি-ফল মোরে ? । ৬।

পাখিহে! তুমি কি কোন কৌশলের বশে
সবার মরমব্যথা জান ভবতলে ?
হেরিতে যে ধায় তোমা' আকুল পিয়াসে,
তারি হৃদি মাঝে তব সঙ্গীত উথলে !! । ৭।

এ ভব কাননরাজি, শোভে নানা ফুলে
ধন্য পুষ্প সেই, আছে রূপ-গুণ যার।
তোমারি কুসুমরাজি তেমতি ভূতলে,
মজিয়াছে,—হেরিয়াছে যেই একবার !! ৮।

এ হেন কুসুমদলে দর্শন কারণে—
যায় যেই,—হেরি তারে স্থিত যোড়করে !
বলতো বিহঙ্গ তারা কি ভাবিয়া মনে
কয় তব সাথে কথা বায়ুরূপ স্বরে ? ৯।

পুষ্পরাজি বুঝি সবে নিমন্ত্রণ করি—
আপন স্রষ্টারে তারা দেয় দেখাইয়া ?
চল চল সবে আজ ঋজু ভাব ধরি—
শুনিয়া বিহগ-গীতি আসিব মাতিয়া !! ১০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত,
সেবকবৃন্দ (কটক)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

পৌষ, সন ১৩১৭ সাল।

চতুর্দ্দশ বর্ষ, নবম সংখ্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসার।

এই পুস্তকখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুমধুর চরিতামৃত। শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মজুমদার কর্ত্তৃক অতি সহজ ও সরলভাষায় পদ্যে লিখিত। এমন কি সুকুমার মতি বালকবালিকা এবং রমণীগণও ইহা পাঠ করিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ১৩০৭ সালে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং পাঠক ও ভক্তজনের আগ্রহে উহা একবৎসরের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। দশবর্ষ পরে লীলাসারের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল। এবারে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মধুরতর ভাষায় ও বিশেষ বিশেষ ঘটনায় পরিপূর্ণ করিতে লেখক চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। আশা করি, প্রত্যেক গ্রাহক ও পাঠক এই পুস্তকের বিশেষ সমাদর করিবেন। মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র। তত্ত্ব-মঞ্জরী কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

কার্ত্তিক সংখ্যায় আমার পীড়ার সংবাদ অবগত হইয়া অনেক গ্রাহক ও পাঠক আন্তরিক সহানুভূতি ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহাদিগের এ কৃপা ও সমবেদনায় আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহাদিগের ও গ্রাহকবর্গের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আমি কিছু সুস্থতা লাভ করিয়াছি, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে পারিনাই, এখনও মাঝে মাঝে হাঁপানি দেখা দিতেছে। আশা হয়, এই শীত অপগত হইলে, এ পীড়ার হস্ত হইতে কিছুদিনের জন্য নিষ্কৃতি পাইব এবং তখন আবার যথাসময়ে আপনাদের নিকট পত্রিকাও প্রেরণ করিতে পারিব। উপস্থিত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। (সম্পাদক)

ভিক্ষা ও ভিক্ষুক।

আমরা শাস্ত্রকারদিগের গ্রন্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই এবং লোকের মুখে শুনি "ভিক্ষান্নং নৈব নৈবচ।" আমরা বলিতেছি—"কে বলে ভিক্ষার মান্য নাই। জগতে কে না ভিক্ষুক, কে না ভিক্ষা করে। আমরা দেখিতে পাই, জগতে সকলেই ভিক্ষার দাস। যাঁহারা ধনবান, ঐশ্বর্য্যবান, সম্পত্তিবান তাঁহাদেরই কথা মানব-সমাজে আলোড়িত হয়। কিন্তু দীন, দুঃখী, জগতের এক কোণে পড়িয়া থাকে, তাহাদের কথা লইয়া কেহই আলোচনা করে না। আমরা নিজে দীন, নিজে দুঃখী, তাই আজ আপনাদিগকে দীনদুঃখীর কথা শুনাইব। আজ দেখাইব, ভিক্ষুকের ভিক্ষালব্ধ জিনিস আছে কি না। আরো কিছু দেখাইব, ভিক্ষালব্ধ জিনিসে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারা যায় কি না? জগতের নিকট চিরদিনই ভিক্ষুক শ্রেণী উপেক্ষিত, পদদলিত ও ঘৃণিত, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার যে সম্পত্তি, যে ঐশ্বর্য্য, যে ধনরাশি আছে—সেই সম্পত্তির, সেই ঐশ্বর্য্যের, সেই ধনরাশির ধনে ধনী হইতে পারিলে কুবেরের ধনভাণ্ডারকে অতি তুচ্ছ, অতি হেয় ও অতি কদর্য্য বলিয়া শত দূরে নিক্ষেপ করিবে। আপনারা মনে করিতে পারেন "ভিক্ষা কদর্য্য কার্য্য। ভিক্ষা কেবল অলসতাপূর্ণ। সেই ভিখারী, যে উদর পরিপূরণ করিবার জন্য—'মা চারিটী ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও' বলিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছে—কোথাও গালি, কোথাও বা ঘুস্‌মুটি খাইতেছে। যে সম্প্রদায় অলসতাপূর্ণ দেহভার লইয়া সমাজকে কলুষিত করিতেছে, সেই

ভিখারীর আবার সম্পত্তি কি ?" এক আশ্চর্য্যের কথা বটে, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ভিক্ষুকেব ভিক্ষালব্ধ ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। ধনী, মহাজন, ঐশ্বর্য্যবান, ধনবান, রাজা, মহারাজ সম্রাটমহোদয়গণ। বৃথা কেন ধনমদে মত্ত হইয়া ভিক্ষুকের ভিক্ষালব্ধ বস্তু এবং ভিক্ষুককে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছ? তোমরা কি ভিক্ষুক নও? তোমরা কি কোন দিন ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হও না? আমরা বলিতেছি, তোমরাও ভিক্ষুক, তোমরাও ভিক্ষা করিয়া থাক। জগতে সকলেই ভিক্ষালব্ধ ঐশ্বর্য্যভোগী ভিক্ষুক। সামান্য ভিক্ষুক দু'টী অন্নের ভিক্ষুক, আর তোমরা মহা ভিক্ষুক।

আমি এই প্রসঙ্গে আপনাদিগকে একটী গল্প বলিব। এ গল্পটী প্রকৃত সত্য গল্প। যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নড়াইলের জমীদার নাবালক বাবু খুব ধার্ম্মিক ও দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কাসেমআলি নামক এক ফকির, তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিতে যায়; যাইয়া শুনিল, বাবু পূজা আহ্নিক করিতেছেন। বাবুর আহ্নিক ঘরের নিকটে গিয়া কাসেমআলি দেখিল, বাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া করজোড়ে কাহার নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া বলিতেছেন—মা, আমায় ভক্তি দাও, মা যা কিছু শিক্ষার দরকার খুব পেয়েছি। আর কেন মা? আর এ কারাগারে কতদিন কয়েদ রাখবি মা। আমার এই ভিক্ষা, যেন বেড়ী কেটে যায়। তা হ'লে চিরদিন তোমার দাস হতে পারবো, নইলে শত বাধা, শত বিঘ্ন মা।" বাবুর প্রার্থনা দেখিয়া, ভিক্ষুক ভিক্ষার কথা ভুলিয়া গিয়াছে, তখন তাহার ভিক্ষা লইবার প্রবৃত্তি চলিয়া গিয়াছে, সে তখন এক পায় দুই পায় চলিয়া যাইতেছে। প্রার্থনা শেষ হইলে বাবু দেখিলেন, ফকির চলিয়া যাইতেছে. তখন বাবু ফকিরকে ডাকিয়া ভিক্ষা দিতে গেলেন—ফকির লইল না। ভিক্ষা না লইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি জন্য আসিয়াছ এবং কেনই বা চলিয়া যাইতেছ?"

"রাজন। আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমার ভিক্ষা করা হইল না। পূর্ব্বে জানিতাম—বড়লোকের কাছে, রাজা, মহারাজা, ধনী মহাজনের কাছে ভিক্ষা করিতে হয়, আর ভাবিতাম, তাঁরা বুঝি ভিক্ষা করে না। কিন্তু এইমাত্র আমার সে ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল, এইমাত্র দেখিলাম, আপনিও কাহার কাছে হাত-যোড় করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। এখন বুঝিলাম, দুনিয়ার সকলেই ভিক্ষুক; আর কাহার কাছে ভিক্ষা করিতে হয়, তাহাও বুঝিয়াছি।

এ জগতে সকলেই ভিখারী, সকলেরই উপজীবিকা ভিক্ষা। কেহ পেটের ভিক্ষা, কেহ অর্থের ভিক্ষা, কেহ ভালবাসার ভিক্ষা, কেহ ভগবৎপ্রেমভিক্ষা।

কেহ স্বার্থসিদ্ধির ভিক্ষা, কেহ পরার্থ পরায়ণতার ভিক্ষা প্রভৃতি ভিক্ষাভেদে নানা লোকে নানা প্রকার ভিক্ষায় প্রবৃত্ত। কি ধনী, কি নির্ধন, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি রাজা, কি মহারাজা, কি জমীদার, কি সম্রাট, আচণ্ডাল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া জগতে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। কেহ বা ধনীর দ্বারে, কেহ বা বারাঙ্গনার পদতলে আপন আপন অভিষ্ট ভিক্ষা চাহিয়া লইতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষাপ্রবৃত্তি। যে নিরন্ন সে অন্ন চায়; যার অন্ন আছে—সে স্ত্রীর ভাল কাপড় কি গহনা চায়। যাহার ঘরে ধন দৌলত উভয়ই আছে, সে উপাধি চায়। রায়বাহাদুর রাজা হইতে,—রাজা মহারাজা হইতে,—মহারাজা পৃথিবীপতি হইতে, পৃথিবীপতি ইন্দ্রত্ব পাইতে—ইন্দ্র ব্রহ্মপদ পাইতে—ব্রহ্মা বিষ্ণুপদ পাইতে ভিক্ষা করেন। অভাবগ্রস্ত সকলেই—সকলেই অভাব পরিপূরণে ভিক্ষুক। ভিক্ষাভেদে কেবল ভিক্ষুকের তারতম্য ইতরবিশেষ। জগতে ভিক্ষুক না কে? যিনি অভাবগ্রস্ত তিনিই ভিক্ষুক। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সামান্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকলেই অভাবগ্রস্ত, সকলেই ভিক্ষুক। একজন অপরের কাছে চাহিতেছে। আর সে হয় ত অন্যের নিকট চাহিয়া থাকে।

সকলেই যখন ভিক্ষুক হইলাম, যদি ভিক্ষা করিতে হয়, ত যাহা পাইলে চিরদিনের জন্য মনপ্রাণ শান্তিসাগরের অতলজলে ডুবিবে, যাঁহাকে পাইলে এ ভব-বন্ধন মুক্ত হইবে, এস ভাই, তবে যিনি একমাত্র ভিক্ষাদানের কর্ত্তা, তাঁহার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করি। যেমন ভগবান রামকৃষ্ণ চাহিয়াছিলেন "মা এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।"

কবে এরূপ ভিক্ষুক হয়ে তাঁহার কাছে এরূপ আবদার করবো। কবে তাঁহার পদে আশা ভরসা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, সুখদুঃখ, শান্তি অশান্তি, শুচি অশুচি অর্পণ করে প্রাণ মন শীতল করবো। কবেই বা তাঁহাকে আপনার করিয়া হৃদয় পদ্মাসনে মন-প্রাণ ভরিয়া দেখিব। কবেই বা তাঁহাকে পাইয়া ভব ভিক্ষুকের ভিক্ষা সাঙ্গ হবে।

যে যে ভাবে তাঁহার প্রেম ভিক্ষা করে তিনি সেইভাবেই তাহার কামনা পরিপূরণ করেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈবভজামাহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" গীতা ৪র্থ অঃ ১২ শ্লোক।

"হে পার্থ! যাহারা যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্য যে ভাবেই ভজনা করুক না কেন, সকলেই আমারই ভজনামার্গ অবলম্বন করিয়া থাকে।"

সাধে কি তাঁর নাম দয়াময়। যদি ভক্তের প্রতি এরূপ দয়া না থাকিবে, তবে তাঁহাকে লোকে ভগবান বলিবে কেন?

কেহ বা ধনরূপে, কেহ বা পুত্ররূপে, কেহ বা সুন্দরীরূপে, কেহ বা বিদ্যা-রূপে, কেহ বা যশঃরূপে, কেহ বা গুণরূপে, কেহ বা উপাধিরূপে তাঁহাকে চায়। যে যে ভাবেই তাঁহাকে চাক না কেন, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করেন। যিনি প্রকৃত ভিক্ষুক, তিনি কি চান—তিনি কেবল তাঁহাকেই চান—কেবল নিশিদিন তাঁহার প্রেমেই মজিয়া থাকিতে ভালবাসেন। যেমন ধ্রুব চাহিয়াছিলেন—যেমন প্রহ্লাদ চাহিয়াছিলেন, যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব চাহিয়াছিলেন।

ভগবান যখন ধ্রুবকে বর দিতে গিয়াছিলেন, তখন ধ্রুব কি চাহিয়াছিলেন—"কেবল তোমাকেই চাই, ধন, ঐশ্বর্য্য কিছুই চাই না—যখন ইচ্ছা করি যেন তোমাকেই দেখিতে পাই।" প্রহ্লাদকে বর দিতে গেলে প্রহ্লাদ কি বলিয়াছিলেন—"প্রভু! আমি বণিক নই যে, তপস্যার বিনিময়ে তোমার নিকট বর চাহিব। বাহিরের সুখ দুঃখ তোমার নিকট কিছুই চাই না, সিদ্ধি চাই না, শুদ্ধি চাই না, কোন উত্তম লোকে বাস করিতে চাই না। তবে যদি দয়া করিয়া কিছু দিতে চাও, তবে তোমার গুপ্তভাণ্ডারের যাহা অমূল্য, তাহাই দাও। এমন বস্তু দাও, যা' পাইলে জীবন জুড়াইয়া যায়। এ দীনহীন কাঙ্গাল যাহা পাইলে কৃতার্থ হইয়া যায়, তাহাই দাও। তুমি স্বহস্তে যাহা দিবে তাহা পাইলেই চরিতার্থ হইব। আমি আর কি চাহিব?"

প্রহ্লাদ চাইতে শিখিয়াছিলেন, চাহিবার ক্ষমতা তাহার জন্মিয়াছিল, তাই চাহিবার বস্তু ভিক্ষার বস্তু তাঁহার উপর অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাতেই প্রহ্লাদের জীবন মধুময় হইয়া গিয়াছে। আর আমাদের মত ভিক্ষুককে যদি বর দিতে আইসেন, আমরা কি চাই—আমরা চাই, খানকতক ঢাকাই কি

সিমলাই কাপড়, খানকতক নভেল, আর খানকতক মহারাজ, কি বকুন, কি পারিজাত সাবান, আর কিছু সুগন্ধি আতর, ও ঐ সঙ্গে একখানি ভাল রং বিরং করা রেশমী রুমাল। আমাদের মনে কি ধ্রুবের ভিক্ষা, প্রহ্লাদের ভিক্ষা, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভিক্ষা আসিবে। আপনাদের হয়ত অন্নদামঙ্গলের পাটনীর কথা মনে থাকিতে পারে—পাটনী জগন্মাতা ঈশ্বরীর নিকট কি চাহিয়াছিল—

"আহ্লাদে পাটনী তবে বলে যোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥"

দুধ ভাত চাহিয়া বসিল, কারণ তাহার দৌড় ঐ পর্য্যন্তই। তাহা যেন না হয়। এস কমলকমলে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া লই—জনমের মত ভিক্ষা চাহিয়া লই। আমাদের জীবন কমণ্ডলু অমৃতরাশিতে পূর্ণ করিয়া লই। মা মা, বলিয়া প্রাণসখা বলিয়া, জগৎপ্রভু বলিয়া, প্রাণমন ভরিয়া স্নেহ, অনুরাগ দিয়া জীবনের সাধ মিটাইয়া লই। জগৎপবিত্রা জগন্ময়ীর প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া, মায়ের ভুবনমোহিনী রূপমাধবী জ্যোতিতারা, নয়নতারা দেখিয়া সাধ মিটাইয়া লই। বাহিরের দর্শনীয় ভিতরে লইয়া পদ্মাসনে তাঁহারই রূপরাশি প্রস্ফুটিত করি। এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ থাকিতে থাকিতেই, এই দেহতে দেহী থাকিতে থাকিতেই ভিক্ষা চাহিয়া লই। পশুদেহে গিয়া যেন ভিক্ষা না করিতে হয়, তাহা হইলেই পশুর খাদ্যই জুটিবে। এস ভাই, এখনও দিন আছে—এই দিন থাকিতে সাবধান হই। ছোট বেলা হইতে বড় হইতেছি, আর ভাবিতেছি, এখনও সময় হয় নাই কিন্তু সময় যে ক্রমশ সংক্ষেপ হইতেছে, তাহা কি ভাবিতেছি? এস, পবিত্র প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ে প্রেমময়ীর কাছে চিরদিনের জন্য সাধের সামগ্রী ভিক্ষা করিয়া লই।

তাঁহার প্রেমভিক্ষা যে কি গৌরবের, কি সোহাগের, কি আনন্দের তাহা যিনি ভিক্ষা করিয়াছেন তিনিই তাহার মধুময় স্বাদ আস্বাদন করিতে পারিয়াছেন। ভিক্ষুকের দিকেই ভগবানের কৃপাকটাক্ষ পতিত হয়, হীনতা-দীনতাতেই ভগবানের কৃপা আকর্ষণ করে। ভিখারী হওয়া এবং তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাওয়া বহু সৌভাগ্যের কথা, বহু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধনার কথা। দুর্দ্দশার কথা, কি ঘৃণার কথা নয়। প্রকৃত ভিক্ষুক হওয়াই দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রকৃত ভিক্ষুকের অভিমান কোথায় কোন গিরিগুহায় লুকাইয়াছে—অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে—অভিমান মানসম্ভ্রম লইয়া ব্যস্ত জীব কি কখন প্রকৃত অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক হইতে পারে? যেখানে অভিমান ভরপুর, সেখানে কি দীনতা হীনতা স্থান পাইবে?

তৃণ অপেক্ষা অবনত হইয়া বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়া ভগবানের সেবা করিতে হয়। যখন জীব বলে "হে জগৎপতে! আমি কিছুই না—আমি কর্ত্তা নই। হে প্রভু! তুমি কর্ত্তা, তুমি ভর্ত্তা, আমি দাস" তখন নিস্তার, তখন তাহার অহংকার চলিয়া গিয়াছে। তখন সে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবার উপযোগী। পাঠক, সিদ্ধার্থের ভিক্ষা দেখুন—রাজ্যসুখৈশ্বর্য, পরমাসুন্দরী রূপবতী স্ত্রী ও সুকুমার শিশু পুত্র ত্যাগ করিয়া কাঙ্গালের বেশে দীন ভিখারীর বেশে তাঁহার নামে ভিক্ষুক সাজিতে পারিয়াছিলেন। তবে তুমি পারিবে না কেন? পারিবে না অহং পরিপূর্ণ বলিয়া। অহং নাশের উপায় ঠাকুর বলিয়াছেন—"যে আমিতে সংসার করে, কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত করে, সে আমিই খারাপ। জীব ও আমার প্রভেদ হইয়াছে এই আমি মাঝখানে থেকে। জলের উপর যদি একখানি লাটি ফেলিয়া দেওয়া হয়, তা' হলে দু'ভাগ দেখায়, বস্তুতঃ এক জল, লাঠির দরুণ দুটো দেখাচ্ছে। অহং এই লাঠি, তুলিয়া লও, সেই এক জলই থাকবে।" আরো বলিয়াছেন, যদি আমি একেবারেই না যাবে, তবে থাক্ শালা "দাস আমি" হয়ে। হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস। আমি দাস, আমি ভক্ত, এরূপ আমিতে দোষ নাই। এরূপ আমিতে ভিক্ষা করা যাইতে পারে, এরূপ আমিতে ভিক্ষুক সাজিয়া ভিক্ষালব্ধ ধনকে ধন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

পাঠক আপনাদিগকে আবার ত্যক্ত করিতেছি, আবার একবার ভগবান শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে পাষাণমানবী অহল্যার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। অহল্যা শাপমোচনের পর শ্রীশ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বল্লেন, তুমি বর প্রার্থনা কর? অহল্যা কি বলেছিলেন, "রাম যদি বর দিবে, তবে এই বর দাও, আমার যদি শূকরযোনিতেও জন্ম হয়, তাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু হে রাম, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে।"

আবার ভক্ত হনুমানের ভিক্ষা দেখুন, সে ধন, মান, দেহসুখ কিছুই চায় না, কেবল ভগবানের কর্ম্ম করিতে চায়। যখন লঙ্কা হইতে ব্রহ্মাস্ত্র লইয়া পলাইতেছে—তখন রাবণমহিষী মন্দাদরী অনেক রকম ফল দিয়ে লোভ দেখাতে লাগলেন। ফলের লোভে যাহাতে অস্ত্র ফেলিয়া যায়। কিন্তু হনুমান ভুলিবার ছেলে নয়, সে বল্লে—

আমার কি ফলের অভাব,
পেয়েছি এলি বিফল ফল যে মনে।

পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,
মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে॥
শ্রীরামকল্পতরু মূলে রই,
(যখন) যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই ;
ফলের কথা কই, ও ফল গ্রাহক নই,
যাবো তোদের প্রতিফল যে দিয়ে॥

যে ফলমূল তাহার বংশগত আহার, তাহা লইল না। সে সেই কল্পতরুর অমৃতময় প্রাণ মন বিমুগ্ধকারী সুস্বাদুফল পাইয়াছে বলিয়া।

এখন ত দেখিলে ভাই, আমরা সকলেই ভিক্ষুক, এখন এস ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া পড়ি। আমরা সকলেই ভিক্ষুক, এজগতে আমরা ভিক্ষা করিতেই আসিয়াছি। এস, এমন ভিক্ষা করি, যাহাতে কোনদিন আর অভাব অনুভব না হয়। ভিক্ষার অমৃতময় ধারাপ্রবাহে যাহাতে চিরদিন প্রাণ মন শীতল হয়, সেই পথ ধরি। এস ভিক্ষুকগণ, যাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, স্বস্বরূপ বুঝিতে পারি, ভাবভক্তি ও প্রেমের উদয় হয়, ভগবানের রূপ হৃদয়পটে সদাসর্ব্বদা জাগরূক হয়, সেইপথে যাই। যখন সকলেই ভিক্ষুক তখন "আত্মাভিমান ডুবায়ে সলিলে" প্রকৃত ভিক্ষুকের পথ অবলম্বন কর। দেখিবে সেই দণ্ডেই ঝুলি পূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন হৃদয়াকাশে চিদানন্দের পূর্ণজ্যোতি পূর্ণরূপে অনন্ত শান্তিসাগরের অমৃতময় শীতলজলে সাঁতার খেলিতে থাকিবে। তোমার অভাব, ব্যাকুলতা, সুখদুঃখ, মান অভিমান, সকলই তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারিবে। তখন তোমার ভিক্ষুক নাম সার্থক হইবে।

ব্রহ্মচারী দেবব্রত।

মদনমোহন।

"রাধাসঙ্গে যদা ভাতি, তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি, স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥" (গোবিন্দ-লীলামৃত)

(১)

সুরহীন যেমন সঙ্গীত,
ভাবহীন কবিতা যেমন,
তেমনি ত মহাভাব-রূপা,
রাধাহীন ব্রজেন্দ্র-নন্দন।

(২)

মধুশূন্য মধুচক্র যথা,
সুধাহীন সুধাংশু যেমন,
বিনে রাই সুধা-তরঙ্গিণী,
তেমি হরি সুধার ভবন।

(৩)

যথাভাণ্ড কর্পূর বিহীন,
বাসহীন কুসুম যেমন,
তেম্নি রাইরঙ্গিণী বিহনে,
আমার সে শ্রীমধুসূদন !

(৪)

জ্যোতিহীন হীরক যেমন,
প্রভাশূন্য যথা প্রভাকর,
তেমনিত রাধিকা বিহনে,
আমার সে ! নব নটবর !

(৫)

প্রাণহীন যেমন গো দেহ,
জলহীন যেমন তটিনী,
একমাত্র কিশোরী বিহীন,
তেম্নি মোর নীলকান্তমণি !"

(৬)

আহা ! লক্ষ্মী-নারায়ণ শূন্য,
যেমন গো শ্রীগোলোকপুরী,
যথা ব্রজ রাধাকৃষ্ণহীন,
প্যারীহীন তেমনি সে হরি !

(৭)

শস্যহীন শস্যক্ষেত্র যথা,
পত্রশূন্য পাদপ নিকর,
তেমনি সে রাধা-লতাহীন,—
আমার সে নীল তরুবর !

(৮)

তারাহীন নৈশনভ যথা,
ফুলহীন কুসুমকানন,
তেমনি সে শ্রীমতীবিহীন—
অপ্রাকৃত নবীন মদন !

(৯)

কভু যদি সে শ্যামসুন্দর,
হয় ওগো ! রাধা-বিরহিত,
হইয়াও বিশ্ব-বিমোহন,
হয় কৃষ্ণ মদন-মোহিত !

(১০)

যতক্ষণ রাধা-পরিবৃত,
ততক্ষণ শ্যাম অনুপাম,
ততক্ষণ মদনমোহন,
রূপে তাঁর বিমোহিত কাম !

শ্রীভোলানাথ মজুমদার।

জীবন ও মৃত্যু।

জীবন দিবা, মৃত্যু রাত্রি—চন্দ্র-তারকাশূন্য ঘোর অমানিশি ; জীবন সুখজনক, মৃত্যু ভীতিবিধায়ক ; জীবন সম্মুখে, মৃত্যু দূরে ; জীবন দীপশোভিত আবাসস্থান, মৃত্যু অন্ধকার অতল পর্ব্বতকন্দর ; জীবনের আমি প্রভু, মৃত্যু আমার প্রভু ; জীবন আমার দাস ; আমি মৃত্যুর দাস ; জীবন তরুপল্লব সলিল সুশোভিত লোকালয়, মৃত্যু বিভীবিকাময়ী মরীচিকা ; জীবন আমার সেবা করে, মৃত্যু আমায় গ্রাস করে ; জীবন সুন্দর, মৃত্যু ভয়ানক !

ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন আশ্চর্য্য কি? মহারাজা যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন,

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"

প্রাণীগণ প্রতিদিন শমনসদনে গমন করিতেছে দেখিয়াও অবশিষ্ট লোকে যে চিরজীবন ইচ্ছা করে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে। আমরা যে মরিব, একথা আমরা কখন ধারণা করিতে পারি না, ভাবিতে পারি না, বুঝিতে পারি না। অপূর্ব্ব মায়া! কি মন্ত্রেই আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! কেহ যেন না বলে যে আমি মৃত্যুকে চিনিয়াছি, মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। একে ত আমরা মন্ত্রমূঢ়, তাহার উপর আরও মূঢ় হই কেন? এমন যে আমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তবু আমরা মৃত্যুর আগমন দেখিতে পাইনা। মুখে হাজার বলি, মৃত্যুর ভাবনা আমরা কখনই ভাবি না। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের জীবন। মরিব যদি জানিতাম ত আমাদের চিরশত্রু কেহ থাকিত না, কাহাকেও চিরশত্রু থাকিতে দিতাম না। ছোট ছোট সুখ দুঃখ লইয়া এত কোলাহল করিতাম না, যাহা করিতেছি, তাহা চিরকালের জন্য করিতেছি, এমন কখন মনে করিতাম না, যে সব তুচ্ছ সামগ্রীকে এত বড় করিতেছি, তাহাদের এত বড় করিতাম না, যে ভাবে জীবন কাটাইতেছি, এ ভাবে জীবন কাটাইতাম না।

মৃত্যুকে আমরা বড় ভয় করি, এত ভয় আর কাহাকেও করি না। সাধে কি বাঙ্গালীর মেয়েরা মৃত্যুর নাম করে না, কাহাকেও করিতে দেয় না, ছেলেপুলে মরণের কথা বলিলে তাহাদের মুখে হাত দেয়, মৃত্যুর নাম শুনিলে আতঙ্কে আকুল হয়? সহজ মানুষের স্বভাবই এই। মৃত্যুর ভয়াল মূর্ত্তি কেমন তাহা কেহ দেখিতে জানে না, কেহ দেখিতে চাহেনা, দেখিলে হৃৎকম্প হয়। জীবিত আছ, জীবিত থাক, চিরজীবি হও, সহস্রবৎসর পরমায়ু হউক। সহস্রবৎসর সেই কি চিরজীবন হইল? শতবয়জীবী মনুষ্যের পক্ষ সহস্রবর্ষ প্রায় অনন্ত জীবন।

যে আশীর্ব্বাদ অশিক্ষিত স্ত্রীলোক করে, সেই আশীর্ব্বাদের আশায় প্রাচীনকালে মুনি ঋষিরা, রাজা প্রজা, কত দীর্ঘ তপস্যা, কত কঠোর সাধনা করিতেন। আরাধ্য দেবতার নিকট শ্রেষ্ঠ বর অমরত্ব। ইহার অধিক আর কিছু দান করিবার ছিল না, ইহার অধিক আর কিছু প্রার্থনীয় ছিল না। অনন্তক্ষমতাশালী মহাপুরুষগণ একমাত্র অমরত্বের আশায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতেন, শরীর মনকে পীড়িত করিতেন, অসংখ্য ক্লেশ স্বীকার করিতেন।

নিষ্কাম তপস্যা কয়জন করিত? কেহ ইন্দ্রত্বের আশায়, কেহ ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইবার আশায়, কেহ শত্রুর বিনাশ জন্য, কেহ বা অমরত্বের জন্য তপস্যা করিত। অমরত্বই তপস্যার চরম ফল। বহুযুগব্যাপিনী তপস্যা, ষষ্ঠি সহস্র বৎসর পরিমিত আরাধনা, সম্ভাবনার অতীত কিনা, সে কথা বিচার করিবার আবশ্যক নাই, মূলে সেই একই কারণ দেখিতে পাইতেছি—মৃত্যুভীতি। দীর্ঘজীবনের অর্থ আর কিছু নহে, কেবল মৃত্যুকে সাধ্যমত দূরে রাখা।

আত্মা নিত্য, একথা প্রাচীন তপস্বীরাও মানিতেন। আত্মা যদি নিত্য, তাহা হইলে যাহা আছে তাহাই পাইবার জন্য এত যত্ন কেন? এর উত্তর যে, আত্মার মুক্তির জন্য তপশ্চরণ কর্ত্তব্য। জীবন অতি দুশ্ছেদ্য মোহবন্ধন। তপস্যা সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায়। শুদ্ধ আত্মা জীবনের অশুদ্ধ কুজঝটিকায় আচ্ছন্ন, সেই কুজঝটিকাকে অপসারিত করার নামই তপস্যা। আত্মার বিনাশ নাই সত্য, কিন্তু আত্মার অবনতি আছে। শুদ্ধ আত্মা নহিলে শুদ্ধব্রহ্মে লীন হইবে না। জীবন মৃত্যুর অশেষ দুঃখ ক্রমাগত ভোগ করিতে হইবে। নানা জীবযোনি পরিগ্রহ করিতে হইবে। ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ অমর আত্মা ব্রহ্ম হইতে দূর পরিভ্রষ্ট হইবে। যাহা তাঁহার অংশ, তাহা তাঁহাকে পুনঃ সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। আমরা আত্মার রক্ষক মাত্র, যিনি আত্মার প্রভু তাঁহাকে যথাসময়ে তাঁহার সামগ্রী প্রত্যার্পণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। নিষ্কাম তপস্যা এইরূপে আচরিত হইতে পারে। মনুষ্যের প্রধান ও শেষ গতি তপস্যা। সংসার কলঙ্কিত আত্মাকে বিশুদ্ধ করিবার অন্য উপায় নাই, শ্রেষ্ঠমানব তপশ্চরণ ব্যতীত আর কিছু করিতে না, এইজন্য সে তপস্যা করিবে।

এ ভাবের তপস্যা অত্যন্ত বিরল। অধিক সংখ্যক তপস্বীরা অমরত্বলাভের জন্যই তপস্যা করিত, আত্মার অমরত্ব নহে, এই নশ্বর শরীরের অমরত্ব। শরীর অর্থ কেবল এবম্প্রকারের অবয়ব নহে। যাহাকে আমরা 'আমি' বলি, প্রকৃত অর্থে সেই আমার শরীর। তপস্বীরা ইহারই চিরজীবন প্রার্থনা করিতেন। আত্মা অমর হইলেও আমাদের আয়ত্ত নহে। চেতনা আমাদের আয়ত্ত। চির-চেতনাই অমরত্বের বর। বিস্মৃতির বিনাশই এই অর্থে অমরত্ব। আমাকে আমি চিরকাল জানিব, যখন যেমন ইচ্ছা অস্থি মাংসের শরীর পরিগ্রহ করিব, যখন ইচ্ছা ত্যাগ করিব, কিন্তু স্মৃতি আমাকে কখন পরিত্যাগ করিবে না। মৃত্যুনামক যে ভয়ঙ্কর বিস্মৃতি, আমি যেন কখন তাহার অধীন না হই। সরস্বতীর তীরে দাঁড়াইয়া আমি বেদ উচ্চারণ করিয়াছি, সামগান

করিয়াছি, সে যেন কালিকার কথা। বিশ্বামিত্র, পরাশর, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণের শরীরের পুণ্যজ্যোতিঃ আমি দেখিয়াছি, তাঁহাদের মুখে বেদমন্ত্র প্রথম শ্রবণ করিয়াছি। বাল্মীকি বনে বনে বেড়াইতেন, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সীতাদেবীর চরণ দর্শন করিয়াছি, অশোকবনে তাঁহার অশ্রুসিক্ত মলিনমুখ দেখিয়াছি, রামচন্দ্রের কমলনয়ন বিভাসিত প্রশান্ত মুখমণ্ডল, হনুমানের বীর্য্য, লক্ষ্মণের ভক্তি, দশাননের বিকটমূর্ত্তি সব দেখিয়াছি। বেদব্যাসের প্রতিভাদীপ্ত মুখ হইতে মহাভারতের অপূর্ব্ব কাব্যস্রোত যখন জলন্ত অগ্নিস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইত, তখন সেই কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমার শরীর কণ্টকিত হইত। মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ আসন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে অতি গভীরার্থপূর্ণ যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমি সেই সময়েই শ্রবণ করিয়াছিলাম। বোধি বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। মহাপুরুষ খৃষ্টের মৃত্যু সময় আমি সেইস্থলে উপস্থিত ছিলাম। মহম্মদের আবির্ভাবকালে আমি আরবদেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম, চৈতন্যের অশ্রুপূর্ণ মত্ততায় আমার চক্ষে নদী বহিত। মহাকবি হোমর দ্বারে দ্বারে গান করিয়া বেড়াইতেছেন, আমি কতবার পথে দাঁড়াইয়া তাঁহার গান শুনিতাম। দান্তের দুঃখ দেখিয়া আমি কাতর হইতাম, সেক্ষপীয়র নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত থাকিয়া এমন অপূর্ব্ব নাটকাবলী রচনা করিতেন, দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। মিল্টন অন্ধ হইলেও তাঁহার মনের শান্তি কত বর্দ্ধিত হইয়াছিল! কালিদাসের দ্রুত রচনায় এবং অসাধারণ কবিত্বশক্তিতে সভাশুদ্ধ লোক বিমোহিত হইতেন, আমি রাজসভায় অনেক সময় উপস্থিত থাকিতাম।

আমি সব দেখিয়াছি, সব দেখিব। মানুষ আসিতেছে, যাইতেছে, সেই অবিশ্রাম যাতায়াত দেখিতেছি। দেখি নাই কেবল মৃত্যু। কখনও যে দেখিতে হইবে সে ভয়ও নাই। আমি অমর, চক্রাকার এই পৃথিবী, এই বিশ্বমণ্ডল নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে, আমি তাহার উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। কালের তরঙ্গ, বিস্মৃতির তরঙ্গ, পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ, প্রতিনিয়ত জগতে আসিয়া লাগিতেছে, কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছু তীরে ফেলিয়া যাইতেছে। কেবল আমায় স্পর্শ করিতে পারে না। মৃত্যু আমার চারি পার্শ্বে, কিন্তু আমি অমর; বিস্মৃতি আমাকে বেষ্টন করিয়াছে কিন্তু আমাকে বন্ধন করিতে পারে নাই। মানুষ যাহাকে অত্যন্ত ভয় করে, অথচ কোনমতে যাহার হাত এড়াইতে পারে না, তাহাকেই পরাভূত করিয়াছি। আমি অমর।

মানুষ মৃত্যুর হাত এড়াইয়া কোনমতে অমর হইতে পারে। এই বিশ্বাস চিরকালই জগতের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের তপস্বীগণই শ্রেষ্ঠ উপায় অবলম্বন করিতেন। তপস্যা করিলে কেহ অমর না হউক, তাহার জীবন ত পবিত্র হইবেই। দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইবে, সংসার ভোগের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইবে, চিত্তশুদ্ধি জন্মিবে, আত্মাব্রহ্মে অর্পিত হইবে, দীর্ঘ অথবা অনন্তজীবনের জন্য বহুবিধ উপায় লোকপরম্পরায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দ্রব্যগুণে জীবন দীর্ঘ হয়, এ বিশ্বাস সাধারণ লোকের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। পক্ক হরিতকীর সন্ধানে এখনও অনেকে ভ্রমণ করে। পৃথিবীর অন্য খণ্ডেও এইরূপ দ্রব্যগুণে অমর হয়, এ বিশ্বাস আপামর সাধারণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও সময় শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও এই বিশ্বাস বলবান হয়। অমৃত, সোমরস পান করিলে তাহাকে মৃত্যু স্পর্শ করিতে পারে না, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেও এইরূপ প্রবাদ ছিল। সম্প্রতি আবার অমর হইবার ইচ্ছার বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তিব্বতকে অমরাশ্রম সিদ্ধান্ত করিয়া, এখন অনেকে তদভিমুখে যাত্রা করিবার মানস করিয়াছেন। এমন চিরকালই হইয়া আসিতেছে, কখন কম, কখন বেশী। কখনও লোকে মৃত্যুর কাছে হার মানিয়া জীবনকে লইয়া ব্যস্ত থাকে, কখনও জীবনের ধ্বজা তুলিয়া মৃত্যুকে সংহার করিতে অগ্রসর হয়। অমর হইবার আশায় কখনও সোমরস, কখনও অমৃতপান করে, কখনও বনে যায়, কখনও তিব্বত প্রস্থান করিতে উদ্যত হয়। কিছুদিন লোকে ক্ষান্ত হয়, আবার কিছুদিন পরে অমর হইবার চেষ্টায় ফেরে। একটু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এচেষ্টা শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট উভয়বিধ মনুষ্যের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভাবশালী আর্য্য ঋষিগণ অমরত্বের অন্বেষণ করিতেন, অশিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিরাও সেই চেষ্টা করে।

আত্মার অমরত্ব আর এ অমরত্বে প্রভেদ আছে, সহজেই বুঝা যাইতেছে। আত্মা অমর, একথা সহজে স্বীকার করিলেও মৃত্যুর ভয় অথবা পরলোকের অনিশ্চিততা হ্রাস হয় না। স্বর্গ, নরক, অথবা পরলোকের অন্য কোনও প্রকার কল্পনা গ্রহণ করা না করা স্বেচ্ছাধীন। স্বর্গ, নরকের জন্য যে কেহ চিরজীবী হইতে চায়, এমন বোধ হয় না। যে অমরত্ব মনুষ্য আত্মার প্রাপ্য, তাহার জন্য কামনা করিতে হয় না। এই পৃথিবীর সঙ্গে, নিত্য সম্বন্ধ রাখিবার জন্যই, অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা।

সেবাশ্রমের সেবকগণের প্রতি।

(১)

কাশীধাম পুণ্যক্ষেত্রে ব্রহ্মচারীগণ !
কে, তোমরা দেহ পরিচয়,
পরিহরি ধ্যান জপ দেবতাদর্শন,
কি কাজে করিছ কালক্ষয়,
গৈরিক বসন পরি, ভিক্ষান্নে জীবন ধরি,
ভোগতৃষা করেছ বর্জ্জন,
কেন তবে নাহি কর দেবতা অর্চ্চন।

(২)

বিশ্বনাথ সাক্ষাৎ আছেন কাশীধামে,
যে ভজে সে পায় মুক্তিধন,
ভবের বন্ধন খসে যাঁর পুণ্য নামে,
তায় উদাসীন কি কারণ,
বুঝিতে নারিনু ভাব, বোঝনাকি লাভালাভ,
ভক্তিমুক্তি চাহ নাকি ভাই,
অদ্ভুত রহস্য তাই পরিচয় চাই।

(৩)

পুনঃ এ কে চারুমর্ত্তি তোমাদের মাঝে,
নাহেরি গৈরিক বস্ত্রধারী,
ব্রহ্মচারী সনে কেন সংসারীর সাজে,
মর্ম্ম কিছু বুঝিতে না পারি—
সংশয় করিয়া নাশ, পূর্ণ কর অভিলাষ,
তোমা সবে এই নিবেদন,
বিস্ময় তরঙ্গে মম আন্দোলিত মন।

(৪)

বুঝেছি বুঝেছি হায় বুঝেছি সম্প্রতি,
কে তোমরা নর নারায়ণ,
জরাজীর্ণ মুমুর্ষের হরিতে দুর্গতি,
সেবাধর্ম্ম করেছ গ্রহণ,

ভক্তি মুক্তি নাহি চাও, বিপন্নে যথায় পাও,
বক্ষে করি আনি সযতনে,
সেবাশ্রমে সেবা কর অতি সন্তর্পণে।

(৫)

পরহিতে সর্ব্বস্বার্থে করি বলিদান,
সেবাব্রত করেছ গ্রহণ,
নিয়ত সাধিতে যত্ন পরের কল্যাণ,
জপ তপ সব বিসর্জ্জন,
শাস্ত্রে আছে উপদেশ, সর্ব্ব ঘটে পরমেশ,
কিন্তু হায় বুঝে কয়জন,
অনুভব বিনা, মাত্র মুখের বচন।

(৬)

সর্ব্বঘটে নারায়ণ না হলে দর্শন,
হেন সেবা কে করিতে পাবে,
সংক্রামক-রোগী, বৈদ্য করেনা স্পর্শন—
তুমি যত্নে সেবা কর তারে,
মলমূত্র মাখা কায়, অচেতন মৃতপ্রায়,
দুর্গন্ধে নিকটে কেবা যায়,
কুড়াইয়া আনি ব্যস্ত তার শুশ্রূষায়।

(৭)

কাশীবাসী দরিদ্র গৃহস্থ অর্থহীন,
পীড়িত কে আছে কোনখানে,
ঘরে ঘরে তত্ত্ব লয়ে ফের প্রতিদিন,
বাঁচাও ঔষধ পথ্য দানে,
যে ভাবে বিপন্ন যেবা, সাহায্য বা চায় সেবা,
বিমুখ তাহে না কভু হায়,
হেন স্নেহ কেবা কোথা দেখেছে ধরায়।

(৮)

কেহ বলে মাতার সমান স্নেহ নাই,
মাতৃস্নেহ অতুল এ ভবে—

সন্তানের প্রতি বটে দেখিবারে পাই,
অন্যে কি তা কখন সম্ভবে !
নিজ পুত্রে যে যতন, করে মাতা অনুক্ষণ,
পর পুত্রে না হয় তেমন,
তাই বলি মাতৃস্নেহ স্বভাববন্ধন।

(৯)

আত্মার স্বাধীনভাব প্রেম নাম তার,
আত্মপর থাকেনা বিচার,
জাতি নির্ব্বিশেষে খোলা সে প্রেমভাণ্ডার—
প্রবেশে সবার অধিকার,
ঘৃণা ভয় পরিহরি, এই প্রেম হৃদে ধরি,
অকাতরে বিলাও ধরায়,
স্বার্থপর নর ব্যস্ত নিজের চিন্তায়।

(১০)

এ হেন পবিত্র প্রেম রস আস্বাদন,
এ জীবনে ঘটিল না হায়,
বৃদ্ধের অবশ তনু, দুর্ব্বল জীবন,
অল্পদিন জরাগ্রস্ত তায়,
পরসেবা কেবা করে, ব্যস্ত নিজ সেবা তরে,
কর্ম্মফল যাহার যেমন,
তাই বলি, ধন্য হে তোমরা মহাজন।

(১১)

সেবাশ্রমে সেবাকার্য্যে যে আছে যেথানে
সবাকারে করি নমস্কার,
বিপন্নে করিছ রক্ষা বিবিধ বিধানে,
দেবপূজ্য প্রেম অবতার,
পরহিত ব্রত ধরি, অবনীতে অবতরি,
পবিত্র করিলে ধরাধাম,
নিলে নাম স্বার্থ যায় পূর্ণ হয় কাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

গুরু পূজা।

কৈলাস শিখর দেশে নাচে ভোলা মহোল্লাসে,
নাচে অগণিত ভূতগণ।
কিছু নাহি দেখা যায়, বিশ্ব ঘন-জ্যোতি ছায়,
শ্রুত মাত্র বিষাণ গর্জ্জন।
'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' চমকিত সূর্য্য সোম,
কাঁপে বিশ্ব হেরি নব ভাব।
গরজে জীমূত মন্দ্র, ত্রাসে ভাষে দেব ইন্দ্র,
উঠে উঠে উঠে সে আরাব।
ধরা যায় রসাতল, হেরি হাসে সে পাগল,
খসে জটা মাথা হ'তে তাঁর।
পড়ে আসি ধরাপরে, বীরেশ্বর দেহ ধ'রে,
শিব অংশে জন্মিল কুমার।
শান্ত হল বিশ্ব-ভূমি, অপূর্ব্ব সে রূপ চুমি,
প্রলয়ের হল যেন লয়।
আনন্দে অধীরা ধরা, প্রেমোল্লাসে মাতোয়ারা,
চারিদিকে শব্দ "জয় জয়"।
এ দিকে নিভৃত কোণে, বসে ছিল সঙ্গোপনে,
জগতের আচার্য্য মহান্।
কারে দিবে মহাতত্ত্ব, 'সমন্বয়' মহাসত্য,
লতে ছিল তাহার সন্ধান।
কি অজ্ঞাত মহা টানে, ভক্ত মিলে ভগবানে,
সমে হয় সম সম্মিলন।
মিলে কেন হরি হরে, বুঝে সেই ভাগ্যধরে,
মুক্ত যাঁর তৃতীয় নয়ন।
'গদাধরে' 'বীরেশ্বরে' চেনাচিনি পরস্পরে,
গুরু শিষ্যে অপূর্ব্ব মিলন।
গুরুদত্ত মহাসত্য, লভিয়া প্রচারে ব্যস্ত,
ধরা'পরে অমৃত সিঞ্চন।

দেব কণ্ঠে দেব ভাষা, অজ্ঞানতা তমোনাশা,
ওই শুন আগ্নেয় উচ্ছ্বাস।
"জ্ঞান' 'ভক্তি' 'কর্ম্ম' মত, আছে যত ভিন্ন পথ,
ভিন্ন নামে একের(ই) প্রকাশ।
"ভিন্ন ভিন্ন স্রোতস্বতী, কা'র(ও) নহে ভিন্ন গতি,
সবে গিয়া সমুদ্রে মিলিত।
"ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম মতে, ভাবি লও এক পথে,
দ্বন্দ্ব ত্যজি সাধ জীব-হিত।
"বৃথা দ্বেষ, বৃথা দন্দ্ব, লভ লভ মহানন্দ,
'সমন্বয়ে' হও সবে ভোব।
"উঠ, জাগ, তত্ত্বমসি" হুঙ্কাবে নবীন ঋষি,—
"ভাঙ্গ ভাঙ্গ বৃথা ঘুম ঘোব।
"পবিত্রতা, মহাত্যাগে, লভ প্রেম অনুবাগে,
হবে মিল আত্মায় আত্মায়।
"প্রেম প্রেম মাত্র পথ, নাহি আর অন্য মত,
প্রেমে বাধা এ বিশ্ব সংসার।"
আর কি বুঝিতে চাও, বিশ্ব-গুরু চিনে লও
ঢাল অর্ঘ্য চবণে তাঁহাব।
বিবেক-আনন্দ নামে, উদিত এ.বঙ্গ-ভূমে,
জাগে ধবা কৃপায় যাঁহার।

সেবক—শ্রীকিবণচন্দ্র দত্ত।

বিভু।

তুমি প্রভু দয়াময় নিখিল আধাব,
মন-বুদ্ধি অগোচর তুমি সর্ব্বেশ্বব।
তুমিই ভকতি মুক্তি, তুমি জ্ঞানময়,
অন্তরে বাহিরে তুমি·নিরাশে আশ্রয়।
"কোথা তুমি" ব'লে সদা অবোধ আমরা,
ইতস্তত খুঁজে মরি হ'য়ে দিশেহারা।

কিন্তু সদা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তুমি,
বিরাজ করিছ নিত্য ধ্রুব অন্তর্যামী।
অজ্ঞান আমরা তাই না খুঁজি অন্তরে,
বাহিরে অকাশমার্গে খুঁজিগো তোমারে।
বল প্রভু, কতদিনে নাশি অন্ধকার,
আলোকিত করিবেগো হৃদয় আমার!
কতদিনে সংসারের শত্রুমিত্র ভেদ,
ঘুচে যাবে চিরতরে থাকিবে না ভেদ।
হেরিব তোমারে সদা আমার অন্তরে,
যে দিকে ফিরাব আঁখি দেখিব তোমারে।

কুষ্টিয়া বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের—"জনৈক সেবক।"

পথহারা।

আশাহত আমি পথহারা আজ—
বিশাল বিশ্ব মাঝারে;—
অন্তহারা এই দিগন্ত ব্যাপিত
সফেনোর্ম্মি পাথারে;—
আপনারে লয়ে আপনার গানে,
গেয়ে চলেছিনু অচিন্ত্যের পানে,
কাণ্ডারীর কথা বারেকের তরে,
আসেনি কখনও স্মরণে;
আপনাতে ভুলে, আপনারি মনে
চলেছিনু ধীর পবনে।

টুটিয়া গিয়াছে চোখের বাঁধন,
টলিয়াছে আজ মোহের আসন,
একটা বিরাট নিরাশার ছায়া—
উঠেছে ফুটিয়া নয়নে;
পথহারা আমি এ ঘোর সাগরে
কি করিনু মোহছলনে।

চারিদিকে ঘোর ভীম পারাবার,
কোন দিক হবে লক্ষ্য বা আমার।
এ যে জলদ ভীষণ ঘিরেছে আকাশ—
ঝঞ্ঝা উঠিছে ঝাঁপিয়া ;
পথভুলে আজ বারিধি মাঝারে
কোথায় পড়িনু আসিয়া।

সকলি বিজন, কেহ কোথা নাই,
কোন পথে যাব কারেবা সুধাই।
জীর্ণ তরী মোর বুঝি ভেঙ্গে চুরে,
ডোবেগো বারিধি মাঝারে :
কোথা প্রভু তুমি কাণ্ডারী অকূলে
আকুলে ডাকিছি তোমারে।

রাখ গো আমায় পথহারা আজ—
সাজাও আমারে দিয়া দাস-সাজ,
তোমারি নিদেশে বাহিব তরণী—
কোথা আজ তুমি দয়াময়,
ক্ষীণ আশা-আলো জ্বাল প্রাণসখা
এ নিরাশ তিমির কর লয়।

'বকল্‌মা' তুমি নিয়াছ জীবের ;
কোন্ শঙ্কা মোর, ভয় বা কিসের ?
নূতন হালটী ধরিব আজিকে,
এস প্রভু আজ হৃদয়ে—
নিরাশ আঁধার করগো অন্তর—
লও প্রভো মোরে আলয়ে।

অধম সেবক—"কালী"।

—

শ্যামা-সঙ্গীত।

আমার এমনি করে কি মা যাবে চিরদিন।
এদিকে যে দিনে দিনে গত হল মা সুদিন॥
কোন পথে এসেছি ভবে, কোন পথে বা যেতে হবে,
এসেছি বা কোন বেশে লয়ে যাবে বা কোন বেশে,
(আমি) তাই ভাবি নিশি দিবসে, কবে হবে মা শুভদিন॥
গর্ভ হতে এসে ভবে ফিরিলাম মা অনুদিন,
এখন ফিরিতে মা, তোমার পথে, পারিনা যে দিনের দিন॥

—০—

হিসাব করে দেখ দেখি মা, আমার মত কারে করেছিস কি!
সবাই আছে সুখে দুখে, আমায় দুখের ভাগী করেছিস কি?
আমি মা অতি কাতরা, তাই তোমায় ডাকি তারা তারা,
এখন যা কল্লি তা কল্লি ভাল, মাগো পরকালে দিসনা ফাঁকি॥
যা হবার তা আমার হল মা, আর না এমন করিস কারে,—
ওমা এমন করে ফাঁকি দিলে, আর মা বলে কেউ ডাকিবে কি!

—০—

এই কি মায়ের ভালবাসা।
আশা ছিল শ্যামার পদে পাব বাসা)
যাই মা মা বলে পিছু পিছু, তাতে মায়ের হয়গো গোসা॥
দুখে শোকে দগ্ধ হয়ে মা, কাঁদি করে তোমার আশা।
তুমি কাণেতেই তোলোনা কথা, এ কেমন তোমার ভালবাসা॥
দীনহীন সুচারুর কপাল দোষে, মিলেনা দর্শন আশা।
(আমি) কত কেঁদে বেড়াই মা মা বলে, মার ক্ষণেক তরে হয়না আসা॥

মোহ।

মোহের নেশা আমায় লেগেছিল।
স্বর্গপথের দুয়ার খুলি, স্বর্ণরেণু মাখি,
পূবর হ'তে প্রভাত যবে কুটীরে নেমেছিল ;
ঘরের মাঝে, আঙ্গিনা'পরে, রবির কিরণ পড়ি,
আমার ভাঙ্গা কুটীর যবে গিয়েছিল ভরি।

সুখের নেশা আমায় লেগেছিল!
গভীর রাতের মধ্যভাগে, স্বপ্ন কথার মত,
শত জন্মের শত কথা—দুঃখ আবেগ ভরা,
বিশ্ব সাথে সেই প্রভাতে,
মুক্ত হাওয়ার মাঝে,
তারে যখন কুড়ায়ে পেনু,
আমার ঘরের কোণে।

রূপের নেশা আমায় লেগেছিল।
জোছনা দেশের রাণীর মত, উজল বরণ দেহে,
ফুলবাগানের ফুলের মত, স্নিগ্ধ সৌরভ মাখা,
ছেলে ঘরের দেবতা সম
পুণ্য আলোক লয়ে—
সাত রাজার ধন একটী মাণিক
এল যখন ঘরে।

আমি তখন মোহে অচেতন!
প্রাণের কথা, মর্ম্ম ব্যথা,
কি ছিল তার বুকে,
কোন পুরাণো স্মৃতি তার
উঠেছিল জেগে,
আমি তখন ভাবি নাই, কাহার তত্ত্ব মাগি,
আকুল প্রাণে কাঁদিল সে, ধরার বুকে পড়ি!

মোহ আমার ভেঙ্গে গেল,
স্বপন গেল টুটে;
আর একদিন সন্ধ্যাবেলা,
দেখেছিনু যবে,
বুকের পাঁজর ভাঙ্গি তার দীর্ঘশ্বাস উঠে—
সূর্য্য তখন ডুবে গেল,
অস্তাচল শিরে,
বাতাস তখন থেমে গেল,
মুক্ত আকাশ মাঝে,
আর্ত্তনাদে, হাহাকারে, কুটীর গেল ভরি,
আমি ভাবি তোমার সনে কিসের কাড়াকাড়ি।

শ্রীরেবতীমোহন চৌধুরী।

রামকৃষ্ণ-শান্তিশতক।

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় লিখিত 'রামকৃষ্ণ-শান্তিশতক' পুস্তকখানি সম্প্রতি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ভক্তের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নানাভাবে ভগবচ্চরণারবিন্দে নিবেদিত হইয়াছে। সাধারণতঃ পুস্তকখানিকে সঙ্গীত পুস্তক বলা যাইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের অসাম্প্রদায়িকভাব ও তাঁহার শ্রীমুখনিসৃত কথামৃত অবলম্বনে প্রণেতা অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিতে করিতে ভাবুকভক্তের চক্ষে জল আসে, প্রাণ ভগবানের চরণ চিন্তায় তদ্গত হয়, অন্তর বিমল ও শান্ত হয়। যাঁহারা গাহিতে জানেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা আরও মধুময় ও আদরের সামগ্রী। ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর। পুস্তকে রামকৃষ্ণদেবের প্রতিমূর্ত্তিও আছে। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র। ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয় প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা' নামক পুস্তকখানি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে

প্রশ্নোত্তরছলে ধর্ম্মতত্ত্বের নানাবিধ সন্দেহ, যাহা মানব মনে উঠিবার সম্ভাবনা,—তাহা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও উপদেশের দৃষ্টান্ত দ্বারায় লেখক মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তত্ত্বপিপাসু প্রত্যেক নরনারীর ইহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমায় তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইবে। পুস্তকখানি বাঁধান এবং ১৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৸৵০ চৌদ্দআনা মাত্র। ১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, বসুমতী কার্য্যালয়ে গ্রন্থকারের নিকট পুস্তক পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মদিরা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মদিরা। শ্রীরামকৃষ্ণ দাস প্রণীত, মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থ ভক্তের উচ্ছ্বাস, সেইজন্যই পুস্তকের নামের নিম্নে 'ভাবোন্মাদ' কথাটী লেখা আছে। গ্রন্থকার নিজের নাম দেন নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘটনা বা উপদেশ না পাইলেও, পড়িতে পড়িতে ভক্তির প্রস্রবণ দেখিয়া বাস্তবিকই চক্ষে জল আপনি আইসে। গ্রন্থকার রামকৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদ, উন্মাদের ন্যায়ই বর্ণনা করা হইয়াছে, আর যিনি রামকৃষ্ণ-প্রেমিক, তাঁহারই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য, তিনিই পুস্তক পাঠে আনন্দ লাভ করিবেন। পুস্তকখানি "উদ্ভ্রান্ত প্রেমের" ভাষায় ও ভাবে লিখিত। প্রেমিকের প্রেমের উচ্ছ্বাস প্রেমিক ভক্ত পাঠ করিলে নয়নাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের পুস্তক।

শ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতকথা।

খুলনা—খালীশপুর পল্লীবাসী ৺আদিরায় কর্ত্তৃক এই ব্রতকথা বিরচিত। গ্রন্থকার স্কন্দপুরাণীয় রেবাখণ্ড, ভবিষ্যৎ পুরাণ, এবং দেশ প্রচলিত বহুকালাগত কয়েকটী গাঁথা হইতে শ্রীসত্যনারায়ণের মহিমাব্যঞ্জক এই সারতথ্য রচনা করিয়াছেন। ব্রতের সাধারণ নিয়মাদি এই পুস্তকের আদিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। চারিটী বিশেষ উপাখ্যান লইয়া ব্রতকথা রচিত ও মহিমা প্রচারিত হইয়াছে। কবিতাগুলি মনোজ্ঞ ও ভক্তিভাব ব্যঞ্জক। পুস্তকের মূল্য ৵০ দুইআনা মাত্র। ২৪ নং রামকমল মুখার্জ্জীর ষ্ট্রীট, খিদিরপুরে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

BENGAL LIBR
6 - MAY 19

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

মাঘ, সন ১৩১৭ সাল।

চতুর্দ্দশ বর্ষ, দশম সংখ্যা।

অষ্টোত্তর শতনাম রামায়ণ।*

ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

ওঁ শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং
গীর্ব্বাণশান্তিপ্রদং
ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং
বেদান্তবেদ্যং বিভুম্।
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং
মায়ামনুষ্যং হরিং
বন্দেঽহং করুণাকরং রঘুবরং
ভূপালচূড়ামণিং॥
নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুংগব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসং চ॥

---

* এই 'অষ্টোত্তর শতনাম রামায়ণে' সমগ্র রামচরিত কৌশলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা অনেকে মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে পারেন। দাক্ষিণাত্যে ইহার বহুল প্রচার। যাহাতে বাঙ্গালাদেশে এই রামনাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন হয়, তদুদ্দেশে ইহা প্রকাশিত হইল। আশা করি, বঙ্গবাসীমাত্রেই এতৎ সহায়ে সুমধুর রামনামরস আস্বাদনে পবিত্র ও কৃতার্থ হইবেন।

ওঁ শ্রীসীতালক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্নহনুমৎসমেত-

শ্রীরামচন্দ্রপরব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীনামরামায়ণম্।
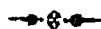
(বালকাণ্ডঃ।)

১। শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর রাম

২। কালাত্মকপরমেশ্বর রাম

৩। শেষতল্পসুখনিদ্রিত রাম

৪। ব্রহ্মাদ্যমরপ্রার্থিত রাম

৫। চণ্ডকিরণকুলমণ্ডন রাম

৬। শ্রীমদ্দশরথনন্দন রাম

৭। কৌশল্যাসুখবর্দ্ধন রাম

৮। বিশ্বামিত্রপ্রিয়ধন রাম

৯। ঘোরতাটকাঘাতক রাম

১০। মারীচাদিনিপাতক রাম

১১। কৌশিকমখসংরক্ষক রাম

১২। শ্রীমদহল্যোদ্ধারক রাম

১৩। গৌতমমুনিসংপূজিত রাম

১৪। সুরমুনিবরগণসংস্তুত রাম

১৫। নাবিকধাবিতমৃদুপদ রাম

১৬। মিথিলাপুরজনমোহক রাম

১৭। বিদেহমানসরঞ্জক রাম

১৮। ত্র্যম্বককার্ম্মুকভঞ্জক রাম

১৯। সীতার্পিতবরমালিক রাম
২০। কৃতবৈবাহিককৌতুক রাম
২১। ভার্গবদর্পবিনাশক রাম
২২। শ্রীমদযোধ্যাপালক রাম

(অযোধ্যাকাণ্ডঃ।)

২৩। অগণিতগুণগণভূষিত রাম
২৪। অবনীতনয়াকামিত রাম
২৫। রাকাচন্দ্রসমানন রাম
২৬। পিতৃবাক্যাশ্রিতকানন রাম
২৭। প্রিয়গুহবিনিবেদিতপদ রাম
২৮। তৎক্ষালিতনিজমৃদুপদ রাম
২৯। ভরদ্বাজমুখানন্দক রাম
৩০। চিত্রকূটাদ্রিনিকেতন রাম
৩১। দশরথসন্ততচিন্তিত রাম
৩২। কৈকেয়ীতনয়ার্থিত রাম
৩৩। বিরচিতনিজপিতৃকর্ম্মক রাম
৩৪। ভরতার্পিতনিজপাদুক রাম

—:০:—

(অরণ্যকাণ্ডঃ।)

৩৫। দণ্ডকাবনজনপাবন রাম
৩৬। দুষ্টবিরাধবিনাশন রাম
৩৭। শরভঙ্গসুতীক্ষ্ণার্চ্চিত রাম
৩৮। অগস্ত্যানুগ্রহবর্দ্ধিত রাম
৩৯। গৃধ্রাধিপসংসেবিত রাম
৪০। পঞ্চবটীতটসুস্থিত রাম

৪১। শূর্পনখার্ত্তিবিধায়ক রাম
৪২। খরদূষণমুখসূদক রাম
৪৩। সীতাপ্রিয়হরিণানুগ রাম
৪৪। মারীচার্ত্তিকৃদাশুগ রাম
৪৫। বিনষ্টসীতান্বেষক রাম
৪৬। গৃধ্রাধিপগতিদায়ক রাম
৪৭। শবরীদত্তফলাশন রাম
৪৮। কবন্ধবাহুচ্ছেদন রাম

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ডঃ।)

৪৯। হনুমৎসেবিতনিজপদ রাম
৫০। নতসুগ্রীবাভীষ্টদ রাম
৫১। গর্ব্বিতবালিসংহারক রাম
৫২। বানরদূতপ্রেষক রাম
৫৩। হিতকরলক্ষ্মণসংযুত রাম

(সুন্দরকাণ্ডঃ।)

৫৪। কপিবরসন্ততসংস্মৃত রাম
৫৫। তদ্গতিবিঘ্নধ্বংসক রাম
৫৬। সীতাপ্রাণাধারক রাম
৫৭। দুষ্টদশাননদূষিত রাম
৫৮। শিষ্টহনুমৎ ভূষিত রাম
৫৯। সীতাবেদিতকাকাবন রাম
৬০। কৃতচূড়ামণিদর্শন রাম
৬১। কপিবরবচনাশ্বাসিত রাম

(যুদ্ধকাণ্ডঃ।)

৬২। রাবণনিধনপ্রস্থিত রাম
৬৩। বানরসৈন্যসমাবৃত রাম
৬৪। শোষিতসরিদীশার্থিত রাম
৬৫। বিভীষণাভয়দায়ক রাম
৬৬। পর্ব্বতসেতুনিবন্ধক রাম
৬৭। ঘটকর্ণশিরশ্ছেদক রাম
৬৮। রাক্ষসসংঘবিমর্দ্দক রাম
৬৯। অহিমহিরাবণচারণ রাম
৭০। সংহৃতদশমুখরাবণ রাম
৭১। বিধিভবমুখসুরসংস্তুত রাম
৭২। খস্থিতদশরথবীক্ষিত রাম
৭৩। সীতাদর্শনমোদিত রাম
৭৪। অভিষিক্তবিভীষণনত রাম
৭৫। পুষ্পকযানারোহণ রাম
৭৬। ভরদ্বাজাভিনিষেবন রাম
৭৭। ভরতপ্রাণপ্রিয়কর রাম
৭৮। সাকেতপুরীভূষণ রাম
৭৯। সকলস্বীয়সমানত রাম
৮০। রত্নলসৎপীঠাস্থিত রাম
৮১। পট্টাভিষেকালঙ্কৃত রাম
৮২। পার্থিবকুলসম্মানিত রাম
৮৩। বিভীষণার্পিতরঙ্গক রাম
৮৪। কোশকুলানুগ্রহংকর রাম
৮৫। সকলজীবসংরক্ষক রাম
৮৬। সমস্তলোকাধারক রাম

(উত্তরকাণ্ডঃ।)

৮৭। আগতমুনিগণসংস্তুত রাম
৮৮। বিশ্রুতদশকণ্ঠোদ্ভব রাম
৮৯। সীতালিঙ্গননির্ব্বৃত রাম
৯০। নীতিসুরক্ষিতজনপদ রাম
৯১। বিপিনত্যাজিতজনকজ রাম
৯২। কারিতলবণাসুরবধ রাম
৯৩। স্বর্গতিশম্বূকস্তুত রাম
৯৪। স্বতনয়কুশলবনন্দিত রাম
৯৫। হয়মেধক্রতুদীক্ষিত রাম
৯৬। কালাবেদিতসুরপদ রাম
৯৭। আযোধ্যকজনমুক্তিদ রাম
৯৮। বিধিমুখবিবুধানন্দক রাম
৯৯। তেজোময়নিজরূপক রাম
১০০। সংসৃতিবন্ধবিমোচক রাম
১০১। ধর্ম্মস্থাপনতৎপর রাম
১০২। ভক্তিপরায়ণমুক্তিদ রাম
১০৩। সর্ব্বচরাচরপালক রাম
১০৪। সর্ব্বভবাময়বারক রাম
১০৫। বৈকুণ্ঠালয়সংস্থিত রাম
১০৬। নিত্যানন্দপদস্থিত রাম
১০৭। রাম রাম জয় রাজা রাম রাম
১০৮। রাম রাম জয় সীতারাম রাম

অতুলিতবলধামং স্বর্ণ শৈলাভদেহং
দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্য।
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং
রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি ॥

গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজং ॥
অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করং ॥
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং
যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং
নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্ ॥
মনোজবং মারুততুল্যবেগং
জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাংবরিষ্ঠং।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং
শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি ॥

যত্র যত্র রঘুনাথ-কার্ত্তনং
তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনম্
মারুতিম্ নমত রাক্ষসান্তকম্ ॥

আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহং ॥
অষ্টোত্তর শতনাম রামায়ণং সমাপ্তং।

বিবেক।

অনেক কষ্টে অনেক সাধানার তোমায় পাইয়াছি। তুমি আমার সাধনের ধন, তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব। তুমি যদি দেবতা নও তবে কে? দেব না হইলে দেবসহচর বটে।' তোমার জন্ম এ মরজগতে নয়, তুমি অনন্ত শাশ্বত জগতের। দুগ্ধের মধ্যে যেমন নিগূঢ়ভাবে ঘৃত বর্ত্তমান থাকে, তুমিও তেমনি প্রত্যেক ভূতেই জ্ঞানময় বিবেকরূপে বিদ্যমান। যেমন মন্থনদণ্ড দিয়া মন্থন করিলে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তেমনি মনদ্বারা সেই আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে তুমি দেবতা হইবে না কেন? যাহা হউক, তুমি দেবতাই হও, দেব সহচরই হও, আর জীবের মানসিকবৃত্তির অধিষ্ঠাতাই হও—যাহাই হওনা কেন—তুমি আমার দেবতা। তোমার লীলা কি অদ্ভুত! তুমি আমাদের নিকটে, দূরে, অতিদূরে, পার্শ্বে, চারিদিকে বিদ্যমান; তুমি আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের চালক এবং প্রত্যেক অপকার্য্যের গতিরোধক। তোমার কোন কার্য্যটী অদ্ভুত নয়, আমি বুঝিতে পারি না। তোমার ইয়ত্ত্বা কোথায়, তোমার সীমা কোথায়, তোমার সমাপ্তি কোথায়, কেহই বর্ণনা করিতে পারে না। তোমার জন্মভূমি—দেবভূমি, তোমার কর্ম্মভূমি—শান্তিভূমি। তুমি নিজে নিরাকার, তোমার কার্য্যাবলী—কর্ম্মভূমিও নিরাকার। তুমি নিজে অনন্ত— তোমার ক্রীড়াক্ষেত্রও অনন্ত! তোমার ব্যাপার অলৌকিক। তোমার লীলাকাণ্ড অনির্ব্বচনীয়! তোমার অলৌকিক মহিমা আলোচনা করিতে করিতে তোমাতে ডুবিয়া যাই—পরে তোমাকে দেবতা না বলিয়া থাকিতে পারি কেমন করিয়া! শুধু দেবতা নও, অন্তর দেবতা—প্রাণের দেবতা, জগৎব্রহ্মাণ্ডের দেবতা—বিশ্বচরাচরের দেবতা। দেব! আমি অধম, তোমায় চিনিতে পারি কৈ? তোমার অদৃশ্য দেববাণী পালন করিতে পারি কৈ? আমার বুদ্ধিশক্তির ধারণাশক্তির হীনতাযুক্ত তোমার অনন্ত মহিমা হৃদয়াঙ্গম করিতে পারিনা, তোমাকে ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারিনা, চিনি চিনি করিয়া চিনিতে পারি না।

দেবতা আমার, আমায় পায়ে ঠেলিওনা, অধম বলিয়া ত্যাগ করিয়া যাইও না। তুমি অচিন্ত্য, বাক্যাতীত, অনন্তরূপ, মঙ্গলস্বরূপ ত্রিকালসংস্পৃষ্ট, আদিমধ্যান্তরহিত, তুমি এক, অদ্বিতীয়, পরিব্যাপক, স্বয়ং প্রকাশমান চিদানন্দ স্বরূপ এবং অদ্ভুতবস্তু। তোমার প্রভাবে, স্পর্শে মানুষ মানুষপদবাচ্য, তোমার

সংকীর্ণতাপ্রযুক্ত মানুষ পশ্বাধম, তোমার অভাবে মৃত! তুমি পরিত্রাতা—উদ্ধারকর্ত্তা, মুক্তিদাতা। যতদিন মানুষ তোমাকে না পায়, যতদিন তোমার সহিত সহবাস করিয়া তোমাকে ধরিতে না পারে, ততদিন তাহাতে মনুষ্যত্ব থাকে না। তুমি মানবের মনুষ্যত্ব, তুমি মানবের অস্তিত্ব। তোমার অভাবে মানুষ মনুষ্যত্ব-হীন—অস্তিত্বহীন। তাই বলিতেছি—প্রভু, আমাকে ছাড়িও না। আর আমায় অকূলপাথারে ডুবাইওনা। তুমি ছাড়িলে আমি মৃত, আমি জড়পিণ্ড, আমি পশ্বাধম হইব। তোমার প্রভাবেই ত আমি সজীব। যেখানে তোমার অভাব, সেখানে জ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্ঞাতা, মনুষ্যত্ব, কিছুই থাকিতে পারেনা। তোমাকে ছাড়িয়া—এই সজীবতা হারাইয়া,—এই মনুষ্যত্ব হারাইয়া—নির্জীব অসাড় নিশ্চেষ্ট দেহটাকে লইয়া কি করিব, কোথায় যাইব! যেখানেই যাইনা, তোমাকে না পাইলে আমার কি দশা হইবে! তুমি যদি চলিয়া গেলে তবে আমার জীবনের মূল্য কোথায়? তবে শুধু পঞ্চভূতময় পঞ্চধারণা প্রবৃত্তি, ষড়রস, দেহ মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি ধাতুধাতু এবং নখ, রোম, কেশ প্রভৃতি তিন প্রকার মল বিদ্যমান আছে, যাহা পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত, এবং চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য ও পেয় চতুর্ব্বিধ আহার্য্য বস্তুর বিকৃতিবিশেষ দেহভার লইয়া কি করিব! আমার জীবনের মূল্য—শরীরে না তোমাতে? তুমি যে পথপ্রদর্শক, তুমি যে ভর্ত্তা, কর্ত্তা, ধাতা, বিধাতা; তুমিই মূল্যবান, তোমার অভাবে জগৎ মূল্যহীন। তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর আবার মহৎ হইতেও মহত্তম; এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমাতে। তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা জ্ঞানময় মঙ্গলস্বরূপ পদার্থ। তোমা বিহনে সকলেই নিষ্প্রভ, নিরানন্দ, বিষদৃশ! তুমিই চালক, তুমি পথপ্রদর্শক, এই প্রবাসে—এই বিজন বন্ধুর প্রদেশে তোমাকে ত্যাগ করিয়া থাকিব কেমন করিয়া? তুমি যে অকূল সমুদ্রের ভেলা? তুমি যে মরুভূমের ওয়েসীশ!

তুমি সাধনার-ধন চিন্তামণি, হৃদয়ের বাঞ্ছিতধন, প্রাণের বস্তু, জীবনের সহচর, আমায় ছাড়িওনা; অধম বলিয়া—ত্রিতাপতাপে বিদগ্ধ বলিয়া—পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও না। তুমি অন্ধকারের আলো।—যখনই আমি সুখ দুঃখ বুদ্ধির আশ্রয় লই—আমার সুখ হউক, দুঃখ হউক এই প্রকারের বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ সুখদুঃখের অনুভাবক এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এবং প্রাণাদি পঞ্চবায়ু গুণত্রয়, কামনা ও সঙ্কল্পাদি পঞ্চবর্গে অভিভূত হই, তখন তুমিই আমাকে তোমার জ্যোতি প্রদান করিয়া আত্মজ্ঞানের বিকাশ করাইয়া উদ্ধার কর। আবার যখন

আমার সংসার, আমি কর্ত্তা, আমি স্থূল, আমি গুণবান, আমি নির্গুণ, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি প্রত্যয়সংযুক্ত হইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত কখন সংযোগ ও কখন বিচ্ছেদ ঘটাই এবং আমার পুত্র নষ্ট হইয়াছে, আমার ভার্য্যা মরিয়াছে, সুতরাং আমার জীবনে কি ফল ইত্যাদিরূপে দীনভাবাপন্ন ও তোমার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত অনেক অনর্থ ও চিন্তাকুল হইয়া শোক করিতে থাকি, তখন আবার পরক্ষণে তোমার আবির্ভাবে সবগুলি যেন ছুটিয়া পলায়ন করে—তখন কেবল তোমাকেই দেখিতে পাই—এ ব্রহ্মাণ্ড তোমাতে, তুমিই সমস্ত জগতের অধীশ্বর! তখন সে শোক, সে দুঃখ, সে ক্লান্তি, সে কষ্ট, সে জ্বালা, কিছুই থাকে না তখন মোহ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কৃতার্থ হই। তবে তুমি উদ্ধারকর্ত্তা হইবে না কেন?

তুমি হৃদয়ভূমের রাজা। তুমি না করিতে পার এমন কর্ম্ম নাই। তুমি গৃহীকে সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীকে গৃহী, রাজাকে ফকির, ফকিরকে রাজা করিতে পার। এ জগৎ তোমার কলকাটা। তোমার ইঙ্গিতে জগৎ পরিচালিত হয়। তুমি যতক্ষণ হৃদিপদ্মে অবস্থান কর, ততক্ষণ তোমার সর্ব্বব্যাপকত্বসহ তুমি আমার হৃদয়েশ্বর বলিয়া উপলব্ধি হয়। তখন অজ্ঞানতা অর্থাৎ মায়া মোহ ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া যায়। যখন তুমি আমার হৃদয় জুড়িয়া বইস, তখন আমার প্রবৃত্তি—আমার গোলাম হয়।

তুমি অনন্ত! তুমি যেমন অনন্তের বস্তু নিরাকার, তেমনি তোমার লীলাও অনন্ত ও নিরাকার, তুমি যে কোন্‌দিক দিয়া কাহাকে কোন্‌পথ দিয়া লইয়া যাও, সেপথ অন্যে জানে না। তাই তুমি অজানা পথের কাণ্ডারী। কত শত শত ঘোর পাতকীকে, অসাধুকে, জীবজগতের নিম্নস্তর হইতে—নিরয়ের মাঝখান থেকে—তোমার এমন জ্যোতি প্রদান কর যে, সে হয় ত সেই রশ্মি অবলম্বন করিয়া তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় পবিত্র দেবভাবে পূর্ণ হইয়া, সেও সাধারণের আদর্শস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে থাকে। ধন্য তোমার লীলা—রত্নাকরকে দস্যুবৃত্তি—পাশবিক-প্রবৃত্তি হইতে মুক্তির পথ প্রদর্শন, জগাই মাধাইকে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা করা—এ সব কাজ কি তোমার না! তবে তোমায় লীলাময় বলিব না ত বলিব কাহাকে? প্রভু, তোমার তাড়িতপ্রবাহে আমাকে সঞ্চালিত কর, সেই প্রবাহে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাও।

জীবন-সহচর, তবে কি যাহারা প্রবৃত্তির স্রোতে নিরয়ের দিকে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহারা কি তোমার আশ্রয় পায় না? তবে কি তাদের তুমি নাই! নাই বা বলি কেমন করে—তবে রত্নাকরকে উদ্ধার করলে কে? জগাই

মাধাইকে হরিপ্রেমোন্মত্ত করালে কে? সেত তুমিই। তবে তুমি তাহাদিগের আছ। তাহারা তোমার আদেশবাণী অপনোদন করিতে পারে না। এরূপ কি একদিনে হইয়াছে—কখনই একদিনে হইতে পারে না। আপনারা কি মনে করেন, চোর সে একদিনেই বড় চোর হইয়া যাইতে পারে। ক্রমান্বয়ে চুরি করিতে করিতে সে মহান চোরে পরিণত হয়, তখন বিবেকবাণী তাহাকে পথ দেখাইলেও, সে তাহা জানিতে পারে না, বা অন্যায় কার্য্য করিতেছি বলিয়া তাহার বোধগম্য হয় না। চৌর্য্যবৃত্তি সমাপ্তির পর তাহার বিবেকের বাণী প্রাণে বাজে, তাই তখন ক্ষণেকের জন্য একটু ব্যতিব্যস্ত হয়। তাই ব'লে প্রভু, তারা তোমার পথানুসরণ করে না, যতক্ষণ চৌর্য্যবস্তু হজম করিতে পারে, ততক্ষণ তাহারা তোমাকে চিনে না, যেই সামলাইল আর কথা নেই, অমনিই তোমাকে ভুলিয়া আবার নিরয়ের পথে প্রধাবিত হয়। তবে তাদের সহিত আর আমার সহিত বিভিন্নভাবে আছ। আমি যখন কোন কার্য্য করিতে যাই, অমনি তুমি আসিয়া কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দাও কিন্তু তাহাদের নিকট কার্য্যসমাপ্তির পর আইস। তবে কেমন করিয়া না বলিব—তুমি সর্ব্ব জীবের।

তুমি দেব সর্ব্ব জীবের। যেখানে হৃদয়ে নির্ভরতা নাই, যেখানে 'আমার' 'আমার' জ্ঞান, যেখানে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির স্রোত প্রবাহিত, সেখানে তুমি গুপ্তভাবে। যেখানে প্রাণের মরমখনি ছাড়িয়া দিতে কাতরতা, সেখানে দেব তোমায় পরাভব। যেখানে স্বভাবের শোভায়, প্রাকৃতিক চাকচিক্যে, মোহের মায়া জালে, মায়ার কুহকীতে প্রবৃত্তির পথপ্রদর্শন করাইতেছে, সেখানে তোমার সংকীর্ণতা। যদিও সেখানে তোমার আবির্ভাব হয়, সে কেবল ক্ষণিকের জন্য। যতক্ষণ প্রবৃত্তির সাফল্য করিবার প্রয়াস থাকে, যতক্ষণ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হয়, দুঃখে, ক্ষোভে অশান্তির মধ্যে, ততক্ষণ হৃদয়মাঝে তোমাকে দেখা যায় না।

এই প্রকার অশান্তি, এই প্রকার মর্ম্মান্তিক পীড়া, দুঃখ যন্ত্রণা জীবনে দুই এক বার অনুভূত হইয়াছে। হয় ত একবার সময় পাইয়াছি, হয় ত কষ্টের পর, অশান্তির পর, দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার পর, আর কিছুই ভাল না লাগায় তোমাকে ডাকিয়াছি, কোন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার জন্য বসিয়াছি—হয় নাই। অমনি বিদ্যুৎচমকে প্রবৃত্তি বংশীবাদন করিয়াছে, বংশীরবে হৃদয়গ্রন্থী পিপাসাকুলিত হইয়া প্রবৃত্তির পথে প্রধাবিত হইয়াছি, আর কোন্ অতলজলে তোমার তুমির ছাই হইয়া গেল। আর তুমি আমাতে থাকিলে না—আমি তোমার

চরণতল হ'তে দূর দূরান্তরে সরিয়া পড়িলাম। তখন বাহ্যজগতের ছাই ভস্ম, ধূলাকাদায় আমার আমি ধূসরিত হইল। তখন জড়জগতে বিচরণ করিতে থাকিলাম, সুতরাং তোমার দর্শন আমার জুটিল না। তোমার স্থান কি জড়জগতে? তুমি যে বাঞ্ছাকল্পতরু! সেখানে যে কল্পবৃক্ষ বিদ্যমান—সেখানে যে অনন্তসুখ, অনন্তশান্তি, দুঃখ যন্ত্রণা দারিদ্র্যতার লেশমাত্র নাই। তোমার জগত, এ পরিদৃশ্যমান জগতের ন্যায় নয়। তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে, তোমার সহচর হইতে হইলে, বাহ্যজগতের সহিত সম্পর্কচ্যুত করিয়া অন্তর্জ্জগতে যাইতে হইবে। সে জগৎ নিরাকার জ্যোতির্ম্ময়। তোমাকে জানিতে পারিলে সর্ব্বজ্ঞতা হয়, আর কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকেনা। তোমাকে লাভ করিতে পারিলে বিবিধ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তোমার প্রসাদে দিব্যচক্ষু লাভ হয় এবং মৃত্যুমুখ হ'তে মুক্তিপথে যাওয়া যায়, তবে তোমায় পাইব কেমন করে? তুমি এক দিব্যবস্তু সর্ব্ব পদার্থে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান।

অরণি ও উত্তরারণির ঘর্ষণদ্বারা যেমন অগ্ন্যুৎপাত হয়, তেমনি তোমাকে মনেতে ঘর্ষণ করিলে যে অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত হয়—সেই জ্ঞানাগ্নির দ্বার। এস্থানটার কুটিল আবর্ত্তন বড়ই ভীষণ। এখানে পাপের মোহিনীশক্তিতে তোমাকে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। বাসনার বশীভূত হইয়া মানবকে কত সময়ে পঙ্কিল তিমিরাচ্ছাদিত মোহকূপে পড়িতে হয়, লালসার তাড়নায় অনেক সময় তোমাকে হারাইতে হয়—মাৎসর্য্যের কবকবলিত হইয়া অনেক সময়ে আত্ম-গ্লানি ভোগ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত তন্দ্রা, মোহ, আলস্য, ঔদাস্য, পরকুৎসা প্রভৃতি কংসচরেরা সতত সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং আক্রমণের পথ খুঁজিতেছে; সুযোগ পাইলেই মানুষকে পশুত্বে পরিণত করে। তখন মানবের ধারণা, উৎসাহ, উদ্যম, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিধৌত হইয়া যায়, তখন সে তোমার আদেশবাণী শ্রবণ করিতে পারে না—তখন তাহার জীবনস্রোত আবর্জ্জনাময় পঙ্কিলখাতে পরিণত করে, তখন তাহার জীবননদে প্রবাহ থাকে না, তাহাতে কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হয় না, এবং পরে এরূপ পঙ্কিলে পরিণত করায় যে, তাহার সংস্রবে কেহই আসিতে সাহসী হয় না। ক্রমে ক্রমে কর্ম্মস্রোত বন্ধ হইয়া আবর্জ্জনা পচিয়া পচিয়া পঙ্কিলের সৃষ্টি করে, পক্ষান্তরে জীবননদ পরিশুষ্ক হইয়া, ষড়রিপুরূপ প্রাণনাশী ভীষণ বিষাক্ত কীটের আবাসভূমি হইয়া পড়ে। ইহার ফলে মানুষ মানব সমাজে ঘৃণ্য—অকর্ম্মণ্য। অতএব ভ্রাতৃগণ! তোমাদের পরিচালককে, নির্দ্দেশ করিয়া হৃদয়বীণাকে সতত বিবেক নিনাদে নিনাদিত

কর। মনোভূমিজাত কুপ্রবৃত্তির অঙ্কুরগুলিকে জ্ঞানাস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া সুকৃতিসলিলসিঞ্চন করিয়া বিবেকের প্রদর্শিত পথাবলম্বী হও। দেখিবে তাহার পথ কি সুন্দর, কি মনোহর, কি শান্তিপ্রদ। সন্তাপিতের হৃদয়বেদনা দূরকরণের জন্য তিনিই একমাত্র শাশ্বত। তাহার প্রভাবে এ নবজগৎ স্বর্গীয় সুষমায় সুশোভিত। তাহার দৃক্‌পাতে নশ্বর মানব জীবনে কি যেন একটী অনুপম স্বর্গীয় ভাবাবেশ দেখা যায়। প্রাণের ভিতর চির-সঞ্জীবনীশক্তির তরঙ্গ রঙ্গে ভঙ্গে খেলা করিতে থাকে। শত্রু, মিত্র ভুল হইয়া যায়, জগত অমৃতময় দেখায়—স্বর্গসুখ উপভোগ হয়।

আপনারা হয় ত মনে ভাবিতে পারেন—এস্থানটা খারাপ, এখানে নানাবিধ শোকতাপ দুঃখজ্বালা, এখান থেকে দূরে থাকাই ভাল। পথ কোথায়? যতদিন বিবেকজ্ঞানে আত্মজ্ঞানী হইতে না পারিবে, ততদিন তোমার সংসার সন্ন্যাস উভয়ই সমান। এস্থান ছাড়িলে কি হইবে, যাহাদের জন্য ছাড়িতেছ, তাহারা ত তোমার সঙ্গেই থাকিল। সেই অস্থি মজ্জা পুরীষ, দেহাদি পঞ্চভূত, রূপমুগ্ধ ষড়রিপুআদি সকলই তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ইহাদিগকে বিবেকজ্ঞানাগ্নিতে ভস্ম কর, তবে তোমার শান্তি, নইলে 'ঢেকির স্বর্গে গেলেও সুখ নাই।' তবে সংসার ছাড়িবে কিসের জন্য। যাহাদের ভয়ে ছাড়িতেছ, তাহারা আরো তোমাকে জড়াইয়া ধরিবে। 'উপরে কোচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন করিও না।' তুমি জগতের নিকট হেয় ঘৃণ্য হইয়াও যদি বাস কর, তবু 'উপরে কোঁচার পত্তন' নিয়ে মানুষসমাজে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিওনা। যদি বিবেকজ্ঞানাগ্নিতে আবর্জ্জনা পোড়াইতে পার, তবে এসমাজে তোমার স্থান। যদিও উহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া হাম্বড়ামীতে দাঁড়াতে যাও, তবে সে তোমার পক্ষে "বজ্রআটুনি ফস্‌কা গেরো?" যদিও মনুষত্ব মনুষত্ব বলিয়া চেঁচাও—সে চেঁচানর আস্থা নাই—ঘুনে ধরা বাঁশের ন্যায়। উপরে যেমনি পরিষ্কার তেমনি পরিষ্কারই থাকে কিন্তু ভিতরে জরাজীর্ণ। যতদিন বিবেক রজ্জু দিয়া মনকে বাঁধিতে না পারিবে, ততদিন তোমার ভিতর গলদ থাকিবেই থাকিবে। ভ্রাতৃগণ, জাগো, পশুত্ব বিনাশ করিয়া দেবত্বের পথে অগ্রসর হও। তোমার কি মনে নাই, যখন মাতৃ উদরে ছিলে তখন কি ভাবিয়াছিলে—

"যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহম্ তৎপ্রপদ্যে নারায়ণম্।"

"যদি এই যোনি হইতে বিমুক্ত হইতে পারি তবে অশুভবিনাশী মোক্ষফলপ্রদ নারায়ণকে সেবা করিব।" তুমি সে সব ভুলিয়া গিয়াছ—বৈষ্ণবীমায়া প্রভাবেই

তোমাব এরূপ ঘটিয়াছে, তাই তোমার শুভকর্ম্মও জানিতে পাওনা। এখন তুমি শরীর রক্ষায় ব্যাপৃত, কিন্তু এ শরীর যে কি তা' কি কখন ভাবিয়া থাক?

ভগবান উপনিষদে বলিয়াছেন—"শরীবমিতি কস্মাৎ অগ্নয়ো হ্যত্র শ্রিয়ন্তে।" এই দেহকে শরীর বলে কেন, শরীর শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্ব্বদা ইহা শীর্ণ হইতেছে—এই নিমিত্তই ইহার নাম শরীর। এখন ত শরীর জানিলে, তবে ইহার মমতা কেন! ইহা দু'দিনের—ইহাব মমতা কেন? ইহা দু'দিনেব—ইহার আবার সুখশান্তি কি? যাহা অনন্তের, যাহা অন্তকাল থাকিবে এবং বহিয়াছে, তাহাকে সুখের কাবণ জানিবে। তুমি যাহাকে সুখের কারণ বলিতেছ, তাহা দু'দিনের। যদি সুখের পথ, শান্তিব পথ, পরমানন্দের পথ খুঁজিতে চাও, তবে জানিও প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা কোন ক্রমেই সুখশান্তি আসিবে না। আসিবে দুঃখ যন্ত্রণা আর আসিবে তাহার সঙ্গে চিব-অশান্তি। যাহার পরক্ষণে অন্তর উৎসাহহীন, হৃদযে গ্লানি, প্রাণে ছটফটানি, তাহা কি কখন শান্তির। দেখিবে পরক্ষণেই তোমার বিবেক তোমাকে শাস্তি দিবে। তুমি অন্যায় করিয়াছ—বলিয়া দিবে। যাহাতে শান্তি ভিন্ন—অগ্রে বা পশ্চাতে কি মধ্যে, কি আদিতে কি অন্তে—কোন স্থানেই অশান্তি নাই—সেই বিবেকবাণী। জ্ঞানালোকে সেই বাণীর অনুসরণ করিতে হইবে, নচেৎ নিস্তার নাই। তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে মনে, মনকে প্রকাশস্বরূপ বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে প্রথমোৎপন্ন মহত্তে এবং মহত্তকে যদি শাশ্বত আত্মাতে লয় করিতে চাও, যদি পরমানন্দের আনন্দধামে চিরসুখ শান্তির মধ্যে বিচরণ করিতে চাও—তবে বিবেকবলে বলীয়ান্ হও। বিবেকের প্রদর্শিতপথ অবলম্বন কর।

তবে এখন—বিবেক দেবতা নয় ত কি? তুমি আমার দেবতা, হৃদয়ের দেবতা। আমি পশ্বাধম আমাকে স্থান দাও, আমাকে তোমার আলোতে লইয়া চল। তুমি অনন্ত, আমি অতি ক্ষুদ্র। প্রভু, তুমি আমাকে স্থান দাও আর নাই দাও, কিন্তু আমি যখন তোমাকে হৃদপদ্মে বসাই, তখন আমার ক্ষুদ্রত্ব, আমার অপদার্থত্ব তোমার জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিতে পূর্ণ হয়। আমার ভাঙ্গা হৃদয়ে, আমার শুষ্ক মালঞ্চে নবপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। তখন আমি জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ, দুঃখ, দারিদ্রতার গণ্ডীতে থাকি না—আমার নশ্বর জীবন অনন্তজীবনের সহিত মিশিয়া—অমর হই, অমরত্ব লাভ করি। তখন আমি বুঝিতে পারি যে, সকলই তোমার চক্র! সকলই তোমার খেলা—সকলই তোমার লীলা। আমি

যাদুকরের পুতুল—যখন বাঁচাও, তখন বাঁচি, যখন মার তখন মরি। হে প্রভু, তুমি করুণাময়, সর্ব্বজীবাধীশ্বর। ধন্য তুমি—ধন্য তোমার লীলা—লীলাময়! তুমিই নিত্য, অনন্ত, চিরবর্ত্তমান; তোমার দয়া ও শক্তি বিশ্বচরাচর ব্যাপৃত। জলের মধ্যে যেমন শীতলতা, অগ্নির মধ্যে যেমন দাহ্যতা, দুগ্ধের মধ্যে যেমন ধবলতা, তেমনি জীবহৃদয়ে—তুমি বিবেক। তুমি জগতের বিধাতা—ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে। তুমি সকলের পূর্ব্বেও ছিলে, সকলের পরেও তুমি বর্ত্তমান থাকিবে। হে প্রভু, তুমি আমার আশ্রয়। তুমি ক্ষেমঙ্কর, আমি পাতকী! তুমি জগতের আলো। দয়াময়, প্রেমময়, আমি অন্ধকারে ভ্রমিতেছি—আমি তোমার জ্ঞান ও প্রেমের কাঙ্গাল। তোমার জ্ঞান প্রেম ও দয়া, আমাকে দান কর। আর তোমার যেমন সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, তোমার যেমন সকলের প্রতি সমান যত্ন—সমান স্নেহ—সমান ভালবাসা, তাই আমাকে দান কর। হে প্রভু! আমার পাপরাশি ক্ষমা কর। আমাকে তোমার অনন্ত পথের আলো প্রদর্শন করাও।

ব্রহ্মচারী দেবব্রত।

—০:০:০—

মন বুলবুল।

(১)

উঠ স্মরি দুর্গা নাম,
ঘুমাবে কি অবিরাম,
রামকৃষ্ণ রাধাশ্যাম,
ধর মিঠি-বুলি।

(২)

অজ্ঞান অলস ঘুমে,
পড়িয়া রবে কি ভূমে,
নাম সুধারস চুমে,
ঝাড় ভবধূলি।

(৩)

কর দেখি ডাকাডাকি,
মোহিবি মজিবি পাখী;
দেখ নিধি পাও নাকি,
আঁখি যাবে খুলি।

(৪)

মোক্ষ মুক্তি নামে পাবি,
উড়ে শান্তিধামে যাবি,
খাঁচা ত্যাগে ছুটি "খাবি,"
ঊর্দ্ধে আঁখি তুলি।

(৫)

সে কালে রে কি করিবি,
বলিবি যা রাথ ভাবি,
"হরি বোলে" তরে যাবি,
মুক্তি পক্ষ খুলি।

(৬)

ঘৃণিত এ ভবার্ণবে,
কর্ণধার সে মাধবে,
তরঙ্গে না ভয় রবে,
ডাক আছ ভুলি।

(৭)

শান্তিধামে যাবি সুখে,
আসা যাওয়া যাবে চুকে,
শ্মশানে সৈকত বুকে,
খাঁচা ভস্ম চুর্ণি।

(৮)

এ চিত্তবিকার রোগে,
ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগে,
রবে কি আশারি যোগে?
মোহ ঘুমে ঢুলি।

(৯)

লীলা সাঙ্গে পক্ষ স্থির,
দৃষ্টি না রবে আঁথির,
নিথর হবে শরীর,
এ ইন্দ্রিয় গুলি।

(১০)

ছোলা জল কলরবে,
কাটাবি কি দিন ভবে,
ডাকিতে শিখিবি কবে
হইয়া আকুলী?

(১১)

প্রাণারাম হরিনাম,
বসতি গোলোকধাম,
পুর্ণ হবে মনস্কাম,
কণ্ঠে নে না তুলি।

(১২)

প্রেমানন্দে ডাক বসি,
মুছিবে মরম মসি,
উদিবে সে জ্যোতি শশী,
হবে কোলাকুলি।

(১৩)

ঝাঁকে ঝাঁকে কত পাখী,
সে প্রেম পিযুষ চাকি,
মত্ত প্রেমে ব্রহ্মে ডাকি,
নাচে হেলি ঢুলি।

(১৪)

তুমি ধর সুর-তান,
তোল প্রেমানন্দে গান,
তবেই জুড়াবে প্রাণ,
যাবে ফাঁস খুলি।

(১৫)

মত্ত দুষ্ট রে বুল বুল,
ডাকির্তে করনা ভুল,
মেথনা ভবের ধূল,
ডাক কণ্ঠ তুলি।
রে মন বুলবুলি!

শ্রীসুশীলমালতী সরকার।

মাতৃমূর্ত্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬০ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখিনী প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন, দেবসেবার সমস্ত আয়োজন করিলেন, সন্ন্যাসী সে ভারগ্রহণ করিলেন।

গত নিশীথে, যে জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন—ইনি নররূপী ভগবান, তাঁহার স্বামীর মুখে ইঁহার স্তুতি শুনিয়াছেন। তাঁহার স্বামী বলিতেন, ইঁহার চিন্তায় আনন্দ, দর্শনে পুণ্য, সেবায় পরিত্রাণ। ইঁহার চিত্রপট সযত্নে তিনি গৃহে রক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহার সাধ ছিল, তাঁহার ঠাকুর ঘরের মধ্যে এই চিত্র সজ্জিত করিয়া, নিত্য সেবা করিবেন, কিন্তু অর্থের অসচ্ছলতায় সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। তিনি সেই অবধি তাহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, পত্নীকে বলিতেন—

"যখন ঠাকুরের দয়া হইবে, তিনি অবশ্যই আমাকে সেবার অধিকার দিবেন।" এতদিন দুঃখিনী সে কথা ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু স্বপ্নে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার সকল কথা একে একে মনে পড়িল।

তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে, তিনি সেই চিত্রপট খুলিলেন,—সে চিত্র তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি মধুর, তেমনি মনোহর। দুঃখিনীর হৃদয় ইতিপূর্ব্বেই ভগবচ্চিন্তায় পূর্ণ ছিল, বিধাতার করুণা দয়া আশীর্ব্বাদ স্মরণ করিয়া ভয়ে, ভক্তিতে, এবং প্রেমে সে হৃদয় গলিয়াছিল, এক্ষণে সম্মুখে সেই শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি আত্মহারা হইলেন, ভূত, ভবিষ্যত মুছিয়া গেল, তাঁহার স্বামী যেমন মধুরকণ্ঠে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গাহিতেন, তিনিও তেমনি মধুরকণ্ঠে, তেমনি ভক্তিপূর্ণ, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে, বলিতে লাগিলেন—

"আচণ্ডালা প্রতিহতরয়ো যস্য প্রেম-প্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্য প্রতিমমহিমা জানকী প্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যোহি রামঃ।
স্তব্ধীকৃত্য প্রলয় কলিতম্বাহবোত্থং সুঘোরং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতি সহজামন্ধতামিশ্রমিশ্রাম্।"

পশ্চাৎ হইতে কেহ গম্ভীরকণ্ঠে সেই গীতের অপরাংশ পূর্ণ করিলেন—

"গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ

সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষঃ রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীং॥"

সন্ন্যাসী হাসি হাসি মুখে বলিলেন, "কৈ মা, সে কাঙ্গালের ঠাকুর, সে দীনের বন্ধু কৈ? তুমি কি তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিয়াছ?"

দুঃখিনী সেই পুণ্য-চিত্র-পট সন্ন্যাসীর সম্মুখে ধরিলেন এবং আদ্যোপান্ত সকল কথাই তাঁহাকে বলিলেন।

সন্ন্যাসী গম্ভীর অথচ মধুরকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—'মা, তুমি যে দেবতার আশ্রয় লইয়াছ, তাহাতে তোমার আর চিন্তা কেন? ইনিই ত্রেতায় রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দ্বাপরে কৃষ্ণরূপে এবং এক্ষণে এই কলিযুগে একাধারে রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহার দর্শনে পুণ্য, ইঁহার নাম কীর্ত্তনে আনন্দ, এবং ইঁহার সেবায় আত্মার পরিতৃপ্তি! পাপীর প্রতি এত দয়া, এত করুণা, আর দেখা যায় না। এস মা, আমি ভগবানের নামকীর্ত্তন করিতেছি, শুনিয়া হৃদয় শীতল হইবে, সকল সন্তাপ দূর হইবে।" সন্ন্যাসী ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন "জয় জয় রামকৃষ্ণ!" দুঃখিনী ও মনে মনে ভাবিলেন,—"পতিত পাবন, কাঙ্গালের ঠাকুর! আমি পতিতা, এ পাপমুখে তোমার নাম অপবিত্র হইবে। আমি মনে মনে তোমায় আত্মসমর্পণ করি, তুমি শ্রীচরণে স্থান দিয়ে পাতকীর উদ্ধার করিও!"

—০:০:০—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রামের মধ্যে একটা আন্দোলন পড়িয়া গেল—কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া, দুঃখিনীর কুটীরে উঠিয়াছে; সেই নাকি তাহার ভরণপোষণের ভার লইয়াছে। প্রাতে ও সায়াহ্নে আসিয়া দেব-সেবা করে, দুঃখিনীকে ভাগবত শ্রবণ করায়, এবং ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়া নানা শাস্ত্রবিষয়ে তাহাকে শিক্ষা দেয়! কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, কেহ দেখিতে আসিল, কেহ লোকমুখে সংবাদ লইল, কেহ বা সে সংবাদ গ্রাহের মধ্যে আনিল না। সন্ন্যাসী কখন কোথায় যাইতেন, কি করিতেন, কেহ জানিত না, কিছুদিন পরে লোকের সে সম্বন্ধে কৌতূহলও নিবৃত্ত হইল।

দুঃখিনীর দারিদ্রকষ্ট নাই, অর্থের চিন্তা, অন্নের ভাবনা রহিলনা, সন্ন্যাসী কোথা হইতে তাহা সংগ্রহ করেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন না, জানিবার আবশ্যকও বোধ করেন না। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ধর্ম্মশিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন, বিশুদ্ধ-হৃদয়ে ভগবচ্চিন্তায় দিন কাটাইতে লাগিলেন, এবং সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে মায়ার বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টিত হইলেন।

কিন্তু তথাপি যে লোকনিন্দা তাঁহার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা তিনি বিস্মৃত হইলেন না। তাঁহার একান্ত দুঃখের সময়, যাহারা একবার চাহিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই, অন্নাভাবে মরিতে বসিলেও যাহারা একমুঠা অন্ন দিয়া দুঃখিনীর কন্যাকে রাখিতে চাহে নাই, আজ তাহারা নিতান্তই আপনার হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি রাঁধুনিগিরি ছাড়িয়াছ, লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষায়ও বাহির হওনা—এখন চলে কিরূপে?"

"ভগবান চালান, তাতেই চলে।"

আত্মীয়েরা চোখ ঠারাঠারি করিয়া বলিল, "ইহার ভিতর কিছু আছে। ছুঁড়ীটার রূপযৌবন আছে, বয়স হইলেও এখনও রূপের নদীতে ভাঁটা পড়ে নাই, এত দুঃখেও এমন রূপের তেজ! নিশ্চয়ই এ কাহারও অনুগৃহীতা!"

তখন সেই সিদ্ধান্তই সকলের মনে ধরিল। সুন্দরীরা প্রথমেই এই সংবাদ প্রচার করিলেন। পরে বাবুর দল ইহার সমর্থন করিয়া, ভাগ্যবান ব্যক্তিটা কে—তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল। প্রবীণেরা সমাজ ও বংশের গৌরব লক্ষ্য করিয়া পতিতা ব্রাহ্মণীর সংস্রব ত্যাগ করিতে সংকল্প করিলেন। বালক বালিকারা পিতৃপিতামহের আদেশে সে গৃহ-প্রাঙ্গণ স্পর্শ করা মহাপাপ মনে করিল, অথচ কেহ একবার একদিনের জন্যও সেদিকে ভুলিয়া চাহে নাই!

বহু অনুসন্ধান ও আলোচনার পর স্থির হইল, প্রসাদপুরের জমিদার নহেন,—কিন্তু তাঁহার পুত্র গোপালচন্দ্রই সেই ভাগ্যবান পুরুষ। এ সম্বন্ধে একটু মতভেদও হইল, কেহ কেহ বলিল—জমিদার নিজেই বহুদিন ধরিয়া এই সুন্দরীর প্রণয়-প্রার্থী ছিলেন, কেহ বলিল—সুন্দরী নিজেই তাহা উপেক্ষা করিয়া, পুত্রকেই বরণ করিয়াছে। তখন সকলের উৎকণ্ঠা দূর হইল এবং যাহারা অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও দুঃখিনীকে বিলাস-সঙ্গিনী করিতে পারে নাই, তাহারা "হায় হায়" করিতে লাগিল।

গোপালচন্দ্র অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী, সংসারের কোন আকর্ষণ তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি দেশে বিদেশে সাধুসঙ্গে দিন কাটাইতেন,

দরিদ্রের সেবা, তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া, সম্প্রতি এই সন্ন্যাসীর সহিত দেশে ফিরিয়াছিলেন। তিনিই সেই রাত্রে দুঃখিনীকে পথ হইতে গৃহে ফিরাইয়াছিলেন, তারপর বহুদিন সেখানে আর আসেন নাই, অথবা আসিলে সন্ন্যাসীর সহিত দেখা করিয়া গৃহে ফিরিতেন। দুঃখিনী তাঁহার পরিচয় জানিতেন না, বহুদিন পরে তিনি গোপালচন্দ্রকে দেখিয়াছিলেন।

তা গোপালচন্দ্রের সহিত এমন একটা কাণ্ড গড়াইবে, এমন কিছু ঘটনা কখন দেখা যায় নাই। একদিন সন্ন্যাসীর সহিত একত্রে ভোজনের পর, গোপালচন্দ্র বাটী ফিরিবার সময় অভ্যাসবশতঃ, দুঃখিনীর পদধূলি মস্তকে দিতেছেন, দুঃখিনীও তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, অলক্ষ্যে কেহ নাকি তাহা দেখিয়াছিল; যে দেখিয়াছিল, সে প্রচার করিল—বৃদ্ধ সন্ন্যাসীঠাকুর বাহিরে ছিলেন, ইতিমধ্যে গোপালবাবু সুন্দরীর প্রেমভিক্ষা করিতেছিলেন, আর সুন্দরীও হাসি হাসিমুখে তাহাকে প্রেম সম্ভাষণ করিতেছিলেন।

এসকল কথা মনে আনিতেও ঘৃণা হয়, লেখনী কলঙ্কিত করিতেও প্রবৃত্তি আসে না—কিন্তু ইহাই সংসার! দূর সম্পর্কীয়া এক বৃদ্ধা, যিনি সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটে একবার উঁকি মারিবার অবসর পান নাই, তিনি এতদিন পরে একবার দেখিতে আসিয়া বলিলেন,—"বলি, বউ! ব্যাপার কি সত্য?"

দুঃখিনী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল,—"কি ব্যাপার, ঠাকুরঝি?"

বৃদ্ধা। লোকে যাহা বলে?

দুঃখিনী। লোকে কি বলে?

বৃদ্ধা। তুই নাকি কুলে কালি দিয়াছিস?

দুঃখিনী। আমি দিই নাই, ভগবান দেওয়ান কালি পড়িবে। তার আগে তোমায় বলিব।

দুঃখিনীর হাসি দেখিয়া, বৃদ্ধা ভাবিল "একি হইল? একটুকুও ত লজ্জা করিল না, তবে বুঝি এখনও ততদূর গড়ায়নি!" প্রকাশ্যে বলিল,—"তা, এত হাসিস্ কেন?"

দুঃখিনী। হাসি কেন? ঠাকুরঝি, এতদিন পরে কি একবার অবসর হয়েছে? যখন না খেতে পেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, দুধের বাছা গলা কাট হয়ে গিয়েছিল, তখন তোমরা কোথায় ছিলে? ভিক্ষা ভিক্ষা বলে যখন দ্বারে দ্বারে কেঁদেছি, তখন সমাজ, ধর্ম্ম, জাতি কোথায় ছিল? আজ যে মহাপুরুষ চরণে

স্থান দিয়াছেন, ধর্ম্মের উপদেশে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করেছেন, তাঁরই কৃপায় এখন ধর্ম্মাধর্ম্মের অনেক রহস্যই বুঝেছি। আমি আমার কর্ম্মফল এড়াইতে পারি নাই, তুমি কুলটা বলিয়া আমার অখ্যাতি করিতেছ—তাহাতে আমার আর দুঃখ নাই, লোকের নিন্দাবাদে আর কোন কষ্ট আমার হইবে না। তুমি আমার জন্য চিন্তিত হইওনা, আমি যেমন দুঃখিনী তেমনি আছি, আমি যে কুলে আশ্রয় লইয়াছি, ইন্দ্রত্বের বিনিময়ে সে কুল আমি ত্যাগ করিব না।

বৃদ্ধা আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। দুঃখিনীর চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল। তিনি যুক্তকরে ভগবানকে ডাকিলেন,—"হে দেব! এখনও এ চিত্ত দৃঢ় হইল না? লোকের নিন্দাবাদে এখনও প্রাণ কাতর হয়?"

সন্ন্যাসী সমস্ত অবগত হইয়া, হাসিমুখে বলিলেন,—"কেন মা, এর জন্য চোখে জল কেন? বিধাতা নিজে কি লোকের নিন্দার হাত এড়াইতে পেরেছেন?"

—:০:—

বিংশ পরিচ্ছেদ।

জমিদার বহুদিন পরে পুত্রকে পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার মনের ভাব একটু পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। ধর্ম্মের টানে নহে, পাপের ভয়ে নহে—বাসনার অতৃপ্তিতে মনের গতি ফিরিতেছিল।

একমাত্র পুত্র যৌবনে সোণার সংসার পায়ে ঠেলিয়া, সুখশান্তির আশায় গৃহত্যাগী। পিতার অসচ্চরিত্রতার জন্য, তাহার হৃদয়ে একটা দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু সেজন্য পিতার প্রতি কখন মন্দ ব্যবহার করে নাই। বরং দৃঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসে জননীকে বুঝাইতেন,—"মা, মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে পাপ কখন তিষ্টিতে পারিবে না। একদিন অবশ্যই মনের গতি ফিরিবে, একদিন নিশ্চিত বুঝিতে হইবে ভোগের সীমা আছে। আমার মনে হয়, এ অত্যাচারের দণ্ডও অবশ্য পাইতে হইবে, কিন্তু সে দণ্ড পুরস্কার বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত; কেননা, তাহাতেই পাপের ক্ষয় অনিবার্য্য। তুমি সহিয়া থাক, সুদিন অবশ্যই আসিবে, বাবার মতি আবার ফিরিবে, আবার ভগবচ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয়পূর্ণ হইবে, এ বিলাস বৈভব জগতের সেবায় নিয়োজিত হইবে।"

জননী অশ্রুপূর্ণ নয়নে, জড়িতস্বরে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, পুত্র জননীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"মা, আশীর্ব্বাদ কর যেন ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়, আমি অন্য সম্পদের কামনা করিনা।"

গোপাল যে দুঃখিনীর সহায়তা করিতেন, গ্রামস্থ অনেক দুঃস্থ পরিবারবর্গের পোষণ করিতেন, একথা জননী জানিতেন। যে লোকনিন্দা, মিথ্যা অপবাদ ও নিদারুণ কলঙ্ককাহিনী দুঃখিনীর কর্ণে পৌঁছিয়াছিল, তাহা যথাসময়ে গোপাল ও তাঁহার জননীও শুনিয়াছিলেন। কিন্তু সংযমীর সে বিশাল হৃদয়ে একটি তরঙ্গ উঠিল না। তিনি মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন, এবং সরল অন্তরে প্রাণ খুলিয়া জননীকে সকল কথা জানাইলেন।

জননী বলিলেন,—"না বাবা, ও সকল কথায় কর্ণপাত করিওনা। আমি জানি তিনি দেবী, নরকের কলঙ্ক তাঁহাতে স্পর্শিবে না। তিনি তোমার প্রকৃত পরিচয় জানিলে, হয়ত তোমার দান গ্রহণ করিতেন না।

গোপাল। মা, আমিত কখন তাঁহাকে কিছু দিই নাই, আমার গুরুদেব সে ভারগ্রহণ করিয়াছেন।

জননী। তাহাও আমি জানি। কিন্তু লোকের ধারণা অন্যরূপ। সে যাহাই হউক, তুমি আপন কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হইওনা। তুমি যে দেবতার চরণে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছ, তিনি সর্ব্ব বিপদ হইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন।

মাতা ও পুত্রে যখন এই কথা হইতেছিল, জমিদার ও তাঁহার গুণের ভাই, কি একটা কথা লইয়া বাহিরে অত্যন্ত বাদানুবাদ করিতেছিলেন। গোপাল স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, তাঁহার পিতা বলিতেছেন—"ভায়া হরিহর! তুমি যতই বল, গোপালের চরিত্রে আমার অচল বিশ্বাস। সে আমার অবাধ্য হউক, সংসারে মায়া মমতাহীন হউক, তথাপি সে নিষ্পাপ, তাহার হৃদয় একান্ত পবিত্র। আমি এত পাপের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও আমার গৃহের পুণ্যবলে এখনও দাঁড়াইয়া আছি। তুমি আমার এ পবিত্র বিশ্বাস নষ্ট করিওনা।"

হরিহর উচ্চহাস্যে এক বীভৎসভাবের অভিনয় করিল। ধীরে ধীরে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে সুরের পর সুর চড়াইয়া, সে নানা ভাবে বুঝাইল, গোপাল চরিত্রহীন, কামিনী কাঞ্চনে একান্ত আসক্ত, বাহিরে ধর্ম্মের ভাণ, সংসারে অনাস্থা। সে বুঝাইল, 'রমণীর রূপলাবণ্য এত সহজেই উপেক্ষা করা দেবতারও সাধ্যের অতীত, গোপাল ত যুবামাত্র; আর অর্থের আকর্ষণে জগত মুগ্ধ, তাহাও উপেক্ষা করা একান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সর্ব্বোপরি সেই কুহকিনীর রূপলাবণ্য জগতে অতুলনীয়, আমি চক্ষে দেখিয়াছি—সে রূপের শিখায় সকলকেই দগ্ধ করিতে পারে। গোপাল-পতঙ্গ যে তাহাতে দগ্ধ হয় নাই, এমন হইতে পারে না। গ্রামের সকল লোকেই সেই কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছে।"

জমিদার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"তুমি সেখানে কি জন্ত গিয়াছিলে?

হরিহর। একদিন সন্ন্যাসীকে দেখিতে খেয়াল হইল। শিষ্য লইয়া গুরুগিরিটা কিরূপ দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, সন্ন্যাসীর মত কিছু নাই; গৈরিক বসন নাই, সুদীর্ঘ, শুভ্র দাড়ী গোঁফ নাই, মাথায় জটা নাই, অঙ্গে বিভূতি নাই, হাতে কমণ্ডলু নাই। তোমার আমার মত মানুষটা—কিছু বয়স হইয়াছে, কিন্তু বালকের ন্যায় সরলতা এখনও বিদ্যমান। মুখখানি হাসি হাসি, অনর্গল বকিতেছে। দু' একজন লোক সর্ব্বদাই যাতায়াত করে।

জমিদার। উপদেশ কিছু শুনিলে?

হরিহর। উপদেশ আর কি? আবহমানকাল হইতে যে কথা চলিয়া আসিতেছে, তাহারই চর্ব্বিত চর্ব্বণ। একটা বিশেষত্ব এই, শুদ্ধাভক্তিতেই ইহার অনুরাগ বেশী। একটা কথা বেশ মনযোগ দিয়া শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিতে-ছিলেন—ভগবান ভক্তিই চান, রূপ, গুণ, ধন, মান, বংশ, পৌরুষ, এ সকলে তিনি ভুলেন না—তিনি ভক্তিপ্রিয়। শুদ্ধ আচরণে তাঁহাকে পাইতে হইলে ব্যাধ কখন তাঁহার চরণ লাভে সমর্থ হইত না; বিদ্যায় গজেন্দ্র, বয়ঃক্রমে ধ্রুব, রূপে কুব্জারাণী, ধনে সুদামা ব্রাহ্মণ, বংশে বিদুর, কিম্বা পৌরুষে উগ্রসেন—কেহই তাঁহাকে পাইত না। ইঁহারা সকলেই ভক্তিতে তাঁহার কৃপালাভ করিয়া-ছিল। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ভক্তি সহজে কি মিলে?" তিনি বলিলেন,—"সাধনের নানা পথ, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে ভাগবতে কয়টা সুন্দর কথা আছে।" এই বলিয়া মাথামুণ্ড তিনি অনেক বকিয়া মরিলেন, আমি সেদিকে মন দিলাম না। কিন্তু সহজ কথা দু' একটা মনে রাখিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন—"ভগবানের নাম শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিত ভক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং নাম শ্রবণেই তাঁহার ভক্তির লক্ষণ; সেইরূপ, নাম কীর্ত্তনে শুকদেব; স্মরণে প্রহ্লাদ; পাদসেবনে—লক্ষ্মী; অর্চ্চনায়—পৃথু; বন্দনে—অক্রূর; দাস্যে—হনুমান এবং আত্মনিবেদনে—বলিরাজা। দাদা, আমাদের এসব ত কিছুই নাই, কিছু হইল না, তোমার আমার আশা নাই!"

ভাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সত্যই আশা নাই!"

হরিহর রাগের ভান করিয়া বলিলেন,—ঐ জন্য ত তোমাকে কিছু বলি না। আমি কি ছাই সত্য সত্য সন্ন্যাসী দেখিতে গিয়াছিলাম, না তাঁহার ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলাম? আমার উদ্দেশ্য সেই রূপসীকে দেখিতে যাওয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার দুর্ব্বুদ্ধির কথায় সক্ত শিক্ষা জানিতে যাওয়া। তা দুইই হইয়াছে।

ভাই। দূর হোক, ওকথা ছাড়িয়া দাও। সন্ন্যাসীকে একবার দেখিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।

হরিহর। তা একে দুই হবে। দেখিলাম, হাঁ রূপসী বটে। এত রূপ আমি জন্মে দেখি নাই। সে সেই কুটীর আলো করিয়া আছে। সন্ন্যাসী বৃদ্ধ, ধর্ম্মভাব কতটা—তা বড় বুঝিতে পারি না, তবে কথাবার্ত্তায় মনে হইল না যে সে ভণ্ড। কিন্তু সুন্দরীর রূপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি, গোপাল যে আত্মহারা হইবে, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের নহে। লোকের মুখে যেরূপ শুনিলাম, যাহারা চক্ষে দেখিয়াছে—তাহারও যেরূপ বলিল, তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই। আর কিছু নয়, ছোঁড়াটা বিবাহ না করিয়া একেবারে উৎসন্নে যাইবে, সেইজন্যই আমি চিন্তিত হয়ে, তোমাকে সকল কথা বলিলাম। এখন যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কর। আমার কথায় অবিশ্বাস করিওনা। আরও দাদা, একটা কথা—তুমি যাহার জন্য লালায়িত হয়েছিলে, তোমার পুত্র"—

জমিদার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আর কোন কথা বলিওনা। আমি নিজে এসম্বন্ধে না জানিয়া কাহার কথা বিশ্বাস করিব না। যদি সত্য হয়?—ভগবান তুমিই জান।"

কিন্তু সয়তানের কার্য্য সেখানেই সমাপ্ত হইল না। ক্রমে ক্রমে পিতার হৃদয় বিষাক্ত হইল। গুণধর ভাই তখন নিশ্চিন্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

উৎসব-সংবাদ।

১৫ই মাঘ, রবিবার, বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব, মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সহস্রাধিক ভক্ত সমবেত হইয়াছিলেন এবং প্রায় দুই তিন সহস্র কাঙ্গালী ভোজন করান হইয়াছিল।

২১শে, মাঘ, শনিবার, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের 'কর্ণধার কুটীর' মজিলপুরে রামকৃষ্ণ-সারস্বত সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ভাগবত শ্রীমধুসূদন বিদ্যানিধি 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথকতায়' সাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। ভক্ত শ্রীভূপতিচরণ মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের উপদেশ ও ধর্ম্মভাব বুঝাইয়া দিয়া সকলকে আনন্দিত করেন। ভক্ত ও কাঙ্গালী সেবারও ত্রুটী হয় নাই।

কলিকাতা বেলিয়াঘাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দাস মহাশয়ের রামকৃষ্ণ কুটীরে ২২শে মাঘ তারিখে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়া গিয়াছে। নামকীর্ত্তনে আনন্দের বাজার বসিয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

ফাল্গুন, সন ১৩১৭ সাল।

চতুর্দ্দশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা।

ভক্ত বন্দনা।

ঝিঁঝিট—একতালা।

ধন্য হে ভকত-বৃন্দ, ভাগ্যবান্—প্রণমি।

হেরিলে—শ্রীভগবানে, নর-লীলায—হে জ্ঞানি॥

ধন্য রাণী রাসমণি, রমণীকুল-শিরোমণি,

ধন্য মথুর, ভক্তবীর, চিনিলে অন্তর্য্যামী॥

ধন্য কেশব প্রতিভাবান্, তোমার 'সুলভে' পাইল স্থান,

"দক্ষিণ-সহরে, গিয়ে গে—শুনরে, সোণার মানুষে অমৃত বাণী"॥

পেয়ে সে সংবাদ—পিপাসী-প্রাণ, দলে-দলে আসে হোতে নানা স্থান,

কেহ বা বিরক্ত, কেহ অনুরক্ত, যার যা নিয়তি সে মত মানি॥

ভাগ্যবান্ রাম, মিত্র মনোমোহন, ভাগ্যবলে পেলে সে স্নিগ্ধ চরণ,

মহেন্দ্র মাষ্টার, বহু গুণাধার, চিনিল চকিতে—'কে ইনি'॥

তেজস্বী তেয়াগী নরেন্দ্র ধীমান, কৃপাতে তাঁহারি পেয়ে দিব্য জ্ঞান,

জগৎ মাতালে, সবারে চিনালে, 'কামজয়ী কৃষ্ণ—জগৎস্বামী'॥

নটেন্দ্র গিরিশ, জলন্ত-বিশ্বাসে, শিবরূপে নিল গুরুবে মানসে,
হোয়ে গৃহবাসী, যেন বে সন্ন্যাসী, বোয়েছে নির্ভযে পেযে পা দুখানি ॥
তাপস বিজয়, ত্যজি লজ্জা ভয়, সত্যেব সাধনে—পেযে পদাশ্রয়,
ছেড়ে দিল দল, জনম সফল, বিতবিল জীবে সুধা সঞ্জীবনী।
তেজস্বী অক্ষয়, গভীর বিশ্বাসে 'পুঁথিতে' আঁকিল প্রভুদেবে হেসে,
সে চারু চবিতে, আর 'কথামৃতে', সুপ্রভাত হোলো আঁধাব-যামী ॥
আছে কত শত কৃপাভাগী তাব, দেবেন্দ্র, ঈশান, ভূপতি, কেদাব,
স্বর্গীয় সে নাগ, দীন মহাভাগ, অতুলন আহা তাঁহাব কাহিনী ॥
হায় কালীপদ, তোমাব নির্ভব বসু-বলবাম, সুবেন্দ্র, অধব,
ভক্ত-উপাধ্যায়, লাটু মহাশয়, কাবে বেখে কার মহিমা বাখানি ॥
বাল-ব্রহ্মচাবী কুমাব-সন্ন্যাসী, সে নিত্যগোপাল, বাবুবাম, শশী,
'রাজা' সে বাখাল, ছিড়ে কর্ম্ম-জাল, ভাবে মগ্ন সদা, পেযে গুণমণি ॥
কোথা মা ব্রাহ্মণী, যৌবনে যোগিনী, বাৎসল্য সাধিকা 'গোপাল'-জননী,
'মধুব ভাবেব' সে প্রেম-'পাগলিনী,'—স্মরি তোমা সবে নমামি ॥
সেবাব্রত সেই 'হৃদয়ে' প্রণমি, ছায়া সম ছিল সহ চিন্তামণি,
(তাঁব) সাক্ষীরূপে বামলালে মানি, আব যিনি (আমাব) অন্তবযামিনী ॥
কৃপা কোবে মা যে দেছেন অভয়, (সেই) অভয়াবে স্মবি হোযেছি নির্ভয়,
জীব-বণে যেন (আর) পাইনা মাগো ভয়, নিদানের সাধ মিটায়ো জননী ॥
(আব) অন্ধকাযা-রূপে বিবাজে মা যথা, যাবে যা পতিত, নোয়াগেবে মাথা,
পতিতপাবনী প্রসাদেরে তথা, হেবিবি ইষ্টে—আপনি ॥*

মাতৃমূর্ত্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪০ পৃষ্ঠাব পর)

—:o:—

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মা, ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব চিত্রপট কি করিতে চাও?" দুঃখিনী ম্লানমুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন।"

সন্ন্যাসী। তোমার কি সাধ?

---

* সেবক শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণ শান্তিশতক' হইতে উদ্ধৃত।

দুঃখিনী। আমার কোন বাসনা নাই, আপনি যেমত অনুমতি করিবেন।

সন্ন্যাসী। হয়, ঠাকুর ঘরে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নিত্য ইহার সেবা কর, কিম্বা প্রত্যক্ষ ভগবান জ্ঞানে এই শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে থাক। নচেৎ গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন কর। দেয়ালে অন্য চিত্রের মত ইহা শোভার জন্য রাখিবার প্রয়োজন নাই।

দুঃখিনী। প্রতিষ্ঠা বা বিসর্জ্জন আমার পক্ষে উভয়ই তুল্য, আমি আপনার কৃপায় সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখিতেছি।

সন্ন্যাসী। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার স্বামী সযত্নে ইহা রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সাধ ছিল, তিনি ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্য সেবা করিবেন। তোমার দেহান্তের পর, স্বামী পুত্রকে পাইলে, ইঁহার কথা কি বলিবে?

দুঃখিনী অবিচলিতভাবে বলিলেন,—"আগে মনে হইত, স্বামী, পুত্র, পরিজন—সব স্বতন্ত্র, এখন বুঝিলাম সব এক; একমাত্র ভগবান স্বামীরূপে কখন হৃদয় অধিকার করিয়াছেন, কখন পুত্রপরিজনরূপে মন ভুলাইয়াছেন। এখন আর কাহারও পৃথক সত্ত্বা ভাবিতে পারি না। স্বামীকে চিন্তা করিলেও ঐ শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাই। সন্তানের চিন্তাতেও তাহাকে দেখিতে পাই। ভগবানের চিন্তাতেও স্বামী পুত্র ও আত্মীয় স্বজনের সম্মিলন সুখ অনুভব করি। তবে আমার স্বামীর যে বাসনা ছিল, আমি এক দিনের জন্যও তাহা করিয়া যাইলে আমার একটা মহাব্রত পালন হইবে।

সন্ন্যাসী। তবে সেই কথাই ভাল. আগামী ফাল্গুন মাসের শুক্ল দ্বিতীয়া তিথিতে, ঠাকুরের জন্মোৎসব করিব। ঐ চিত্রপট সেই দিন প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমার বাসনা পূর্ণ করিও।

সেই শুভদিন সমাগত হইলে, অতি প্রত্যুষে দুঃখিনী শয্যা হইতে উঠিলেন। ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া মনে হইল যেন স্বামীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শান্ত ও সংযত চিত্ত অধিকতর প্রফুল্ল হইল। তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া অঙ্গে বিভূতি মাখিলেন, গৈরিক বসনে দেহ আবৃত করিলেন, হৃদয়ে ইষ্ট-দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

তখন পথে এক ভিখারিণী গাহিতেছিল :—

(ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান)

"কতই ছল্ তুই জানিস শ্যামা,
আমার কিছু আছে জানা।

তোমার কালো রূপে ভুবন আলো,
বিশ্বে আছে কীর্ত্তি নানা!
রূপে আছে হৃদি ভরা, আঁখি হয়নি জ্যোতি হারা,
তুমি যে ভাবে থাকনা শ্যামা—
(তোমায়) চিন্তে কিছু যায় আসেনা।"

দুঃখিনী হাসিয়া বলিলেন, অনেক দিন মা তোর গান শুনি নাই। কণ্ঠের স্বর আজও তেমনি মধুর আছে।

ভিখারিণী গান থামাইয়া বলিল,—"মা, এত ছাই মাখিলি কেন? ছাই মাখিলেই কি রূপের হাত এড়াইতে পারিবি? ঘসা ফানুসের ভিতর হতে আলোর তেজ আরও বাড়ে। যদি ও রূপ ঢাকিবার হ'ত, বিধাতা এত রূপ কেন দেবে মা? অঙ্গে বিভূতি, পরণে গৈরিক —রূপের আভা প্রভাত রবিকে পরাস্ত করেছে—এ যে মা, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি! আজ মা তোর বাড়ীতে গিয়ে অনেক গান শুনাব।

দুঃখিনী গৃহে আসিয়া দেখিলেন, গোপাল ইতিমধ্যে আসিয়াছে এবং সন্ন্যাসীর আদেশ মত নানা পত্র পুষ্পে সেই কুটীর সজ্জিত করিয়াছে। ধূপ ধূনায় গৃহ আমোদিত, প্রভাতের মৃদু সমীরণে সেই সুগন্ধ চারিদিক উন্মথিত করিয়াছে।

চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া, দুঃখিনীর মনে হইল, তাঁহারই সেই কুটীর আজ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার আত্মবিস্মৃতি ঘটিল, কন্যা ছুটিয়া আসিয়া মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল, তখন কাহার উদ্দেশে দুঃখিনীর প্রশান্ত নয়ন হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিল!

—•:•:•—

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপ সয়তান এ জগতে চির বন্দী। তাহার উদ্ধারের কোন উপায় নাই। যে দিন কেহ তাহাকে চাহিবেনা, তাহার আপাত মধুর বাক্যে প্রতারিত হইবেনা,—সেইদিন তাহার মুক্তির দিন। হায় সে দিন কি নরভাগ্যে কখন আসিবে? হৃদয়ে হৃদয়ে পাপ কাঁদিয়া বেড়াইতেছে—আমায় ছাড়িয়া দাও, আমরা তাহা শুনিনা, তাহাকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ বাখিয়াছি! সেও তাই তাহার উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া, এ দুর্লভ মনুষ্যজন্ম বিড়ম্বিত করিতেছে।

প্রসাদপুরের জমিদার আজীবন পাপের সহচর হইয়াছেন। ভাগ্যগুণে কখন কখন শুভমুহূর্ত্ত দেখা দিলেও তিনি পাপের মোহ অতিক্রম করিতে পারিতেন না। পাপরূপী হবিহর নিয়তই তাঁহার হৃদয়ে উঁকি মারিতেছিল, তাহার প্রভাব জীবনের উপর এত আধিপত্য লাভ করিয়াছিল যে, আর ইচ্ছা করিলেও তিনি তাহার হাত এড়াইতে পারিতেননা। তাঁহার পুত্রকে নিস্পাপ জানিয়াও ক্রমে তাহার ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, তিনিও পিতার ন্যায় দুশ্চরিত্র ও ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিলনা।

গৃহিনী সমস্ত বুঝিয়া, স্বামীকে অনেক বুঝাইলেন, এ অসম্ভব বাক্যে অবিশ্বাস জন্মাইবার বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইলনা। তাঁহার স্বামী বলিলেন,—"আমি সে সয়তানীকে বিশেষরূপ জানি, সে রূপের ফাঁদে আমার নিতান্ত সরলহৃদয় সন্তানকে ভুলাইয়াছে। এই দেখনা সেখানে কি উৎসবের ব্যাপার হইবে, সে তাহার জন্য একান্ত ব্যস্ত, আহার নিদ্রা নাই, শুনিলাম এক বিরাট ভোজের আয়োজন হইতেছে! সংসারে মায়া নাই, কিন্তু সেটা বাহিরের একটা আবরণ মাত্র, ভিতরে ভিতরে সবই আছে। এই দেখনা, এই অল্প দিনের মধ্যে কত অর্থ খরচ করিয়াছে! অর্থ যায় যাউক, কিন্তু এই মোহ, এই আসক্তি, এই ভণ্ডামি, অনেক দূর গড়াইয়াছে,—আমি আর ইহার প্রশ্রয় দিতে পারিবনা। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি পুত্রকে লইয়া স্থানান্তরে যাও, আমার চোখের উপর, আত্মীয় স্বজনের মাথা হেঁট করিয়া, আমার মান সম্ভ্রম ডুবাইয়া, সে এমন করিবে, আমি তাহা সহিতে পারিবনা। আমি কি মনে করিয়াছি জান? আমি কল্য প্রাতে সেই গ্রামে গিয়া, নিজে ইহার বিষয় অবগত হইব, নিজে সেই পিশাচীর কুটীরে গিয়া দেখিব, সেই ভণ্ড সন্ন্যাসীর ধর্ম্মসাধন কিরূপ, আর তোমার ধর্ম্মরত পুত্রের পুণ্যব্রত কি। যাহা শুনিয়াছি, তাহা সত্য হইলে হয় পুত্রঘাতী হইব—আর নয়, নিজে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া এক দিকে চলিয়া যাইব। তুমি তোমার পুত্রের পুণ্য লইয়া পুণ্যের সংসার করিতে থাক।"

গৃহিণী প্রমাদ গণিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার স্বামী ক্রুদ্ধ হইলে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইতেন। তাঁহার যতদূর সাধ্য ছিল, চেষ্টা করিলেন, কাঁদাকাটি করিলেন, কিন্তু স্বামীর মন ফিরাইতে পারিলেন না। তখন দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয় আশ্রয়, অগতির গতি, ভগবানকে কাতর হৃদয়ে হৃদয়ের ব্যথা জানাইলেন। তিনি চোখের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে ডাকিলেন,—

"হে অনাথশরণ, কাঙ্গালের ঠাকুর। আমি বড় দুঃখী—তাত তুমি জান। আমি এ বিপদে আর কি বলিব—তোমারই মহিমা তুমিই প্রচার করিও। আমার মনে তিলমাত্র অবিশ্বাস আসে না, তোমার দয়াময় নাম যে গ্রহণ করিয়াছে, তুমি সকল বিপদ হইতেই তাহাকে রক্ষা করিয়াছ, দেখো ঠাকুর, আমার এ জীবন্ত বিশ্বাস যেন মিথ্যা না হয়। একদিকে স্বামী—একদিকে পুত্র, আমি দুর্ব্বলা রমণী কি করিতে পারি। আমি তোমারই শরণ লইলাম, তুমি শরণাগতাকে চরণে রাখিও।"

তখন সন্ধ্যাকাল। গৃহিণী শুনিলেন, অন্দরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া এক ভিখারিণী গাহিতেছে,—

"জাল গুটিয়ে নেনা শ্যামা, বাঁধন খুলে দেনা মা,
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, আর খেলাতে চাইবো না।
কি ঝকমারি ভবের খেলা, ঘরে পরে দেয় মা জ্বালা,
(ওমা) ঘুরিয়ে দেয়গো ভাবের দোলা, পাক খেতে আর পারি না।
সকল ঘটে আছ তুমি, নিমিত্ত হই কেন আমি,
অহং নাশো অন্তর্য্যামি, বুকে দিয়ে ঐ অভয় পা।"*

গীতের সুমধুর স্বর গৃহিণীর অন্তর স্পর্শ করিল। তিনি ঠাকুর প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন। ভিখারিণীকে বলিলেন,—"তুমি আবার গাও, তোমার গান বড় মিষ্ট।" ভিখারিণী পুনরপি ঐ গীত গাহিল, পরে বলিল, "মা, তোর এত ভাবনা কেন? যার ভাবনা সেই ভাবছে, তুমি আমি ভেবে কি করব মা? আমি একদিন বড় ভাবতুম, কিন্তু চিন্তামণির এমনি দয়া, আমার স্বামী পুত্র সব নিয়ে, পথে বসিয়ে সব চিন্তার দূর করলে! তবু পেটের ভাবনাটা গেলনা। একদিন তাও গেল। তোরও ভাবনা যাবে, মা। যে তাঁর শরণ লয়, তিনি তার ভার লন। তুমি মা, ঠাকুরের চরণে সব সমর্পণ কর, তিনিও তোমার সকল ভাবনার ভার লবেন।"

গৃহিণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে পুণ্যবল, আমার কৈ মা?"

ভিখারিণী বলিল,—"সকলি দয়াময়ের ইচ্ছা। একটা কথা বলিতেছিলাম কি—তোমার পুত্র যে কাল ভগবানের প্রসাদ বিতরণ করিবেন, তুমি কি মা, সেখানে যাবে না?"

গৃহিণী। তোমার বাড়ী কি সেখানে?

* শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত বিরচিত "রামকৃষ্ণ শান্তিশতক।"

ভিখারিণী। আমার আবার বাড়ী কোথায় মা? সে কি আর সর্ব্বনাশী রেখেছে? যে যখন ডাকে, তার কাছেই তখন থাকি। যখন কেউ ডাকেনা, মার মন্দিরে গিয়ে পড়ে থাকি। আজ এই গ্রামে এসেছিলাম, ভাবলুম যদি তুমি যাও, তোমার সঙ্গে আমিও যাব।"

গৃহিণী কি ভাবিয়া বলিলেন,—"তুমি এই রাত্রে এখানে থাক।"

জমিদার রাত্রে অন্দরে আসিলেন না, প্রাতে কাহাকে কিছু না বলিয়া, বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

—:০:—

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পথে আসিতে আসিতে জমিদার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের নিকট অনেক কথা অবগত হইলেন। ভালমন্দ অনেক কথাই শুনিলেন। তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া, বরাবর দুঃখিনীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি সে কুটীরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। তাহাতে বিলাসের কোন চিহ্ন ছিলনা, পুণ্য-পবিত্রতার মনোরম চিত্র দেখিয়া তিনি যেন মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য বুঝি তাঁহার বিক্ষুব্ধচিত্ত শান্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে ভাব মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তখন তিনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

তখন সন্ন্যাসী গৃহাভ্যন্তরে ঠাকুরের পূজায় নিবিষ্ট ছিলেন। দুঃখিনী সচন্দন পুষ্পের মালা হাতে লইয়া দ্বার সম্মুখে দণ্ডায়মানা, আর গোপাল কতিপয় ভক্তের সহিত প্রাঙ্গণে বসিয়া নির্নিমেষ নয়নে দেবতার পানে চাহিয়া আছে।

জমিদার সে দৃশ্য দেখিলেন। ক্রোধে, ক্ষোভে ও ঘৃণায় তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছিল,আর কোনদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিলনা। একবার সেই গৈরিক পরিহিতা রমণীর প্রতি চাহিলেন, তাঁহার সেই বিক্ষুব্ধচিত্তেও মনে হইল যেন একখানি সজীব দেবী-প্রতিমা সজ্জিত রহিয়াছে। একবার সেইদিকে, একবার বাহ্যজ্ঞান শূন্য, সংযতচিত্ত পুত্রের প্রতি চাহিলেন, ঘৃণার আগুন যেন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি গোপালের হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, গোপাল চমকিত হইয়া পিতার প্রতি চাহিলেন। তখন পিতা গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"গোপাল! ধর্ম্মসাধনার এই উত্তম স্থান! এই বয়সে এত ভাণ, এত কৃত্রিমতা, এত উচ্ছৃঙ্খলতা? গৃহী হইয়াও এই তোমার সন্ন্যাস? এই ত্যাগ? এতকাল এই ভাবেই আমাকে

প্রতারণা করিয়া আসিতেছ? আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা সত্য, তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। ঐ পিশাচী রমণীর কুহকে পড়িয়া তোমার স্বভাব কলুষিত করিয়াছ, তোমার স্বাভাবিক পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে, তুমি ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছ! এখনও সাবধান হও, ঐ রমণীর মায়া হইতে আপনাকে বিমুক্ত কর। কামিনী-কাঞ্চন ধর্ম্মের অন্তরায়—সে কথা কেবল মুখেই না থাকে!"

গোপালের দেহ কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল,—রাগে নহে, দুঃখে নহে, পিতার প্রতি অশ্রদ্ধায় নহে,—কিন্তু যে নিষ্পাপ, সম্পূর্ণ নিরপরাধ, তাহার প্রতি এই অন্যায় অত্যাচারের জন্য তাহার প্রাণে আশঙ্কা হইতেছিল—বুঝি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! গোপাল নীরবে অনেক তাড়না সহ্য করিল, মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিল, শেষে তাঁহার নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণ হইতে লাগিল।

গোপাল সাশ্রুনয়নে পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিল,—"বাবা, এমন পাপ কথা মুখে আনিবেন না। আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, আমি উঁহাকে আমার জননী বলিয়াই জানি। আমার মনে কোন পাপ নাই, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ!"

পিতা। আমি একথা বিশ্বাস করি না। তুমিত এক রকম গৃহত্যাগ করিয়াছ, এখন এ জন্মের মত আমার সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া, তুমি এখান হইতে দূর হও, সমাজে আমার মাথা হেঁট করিওনা।

গোপাল। বাবা, তাহা হইলে যে নিষ্পাপ, তাহারত বিচার হইল না। আপনি এ ভুল বিশ্বাস ত্যাগ করুন। আপনি একবার চাহিয়া দেখুন—ঐ মূর্ত্তি মাতৃমূর্ত্তি কিনা। ঐ অপরূপ রূপ দেখিয়া, বিশ্বজননীকে মনে পড়ে কি—না! ঐ অপূর্ব্ব দেবপ্রতিম রূপ দেখিয়া "মা" বলিয়া, ডাকিতে সাধ যায় কি—না! আমি এই দেবতা সমক্ষে বলিতেছি, আমি উঁহাকে জননীর মত ভালবাসি, উহার ধর্ম্মভাব দেখিয়া উহার সেবার জন্য অর্থদান করি। মার আমার অপরূপ রূপ, এরূপ দেখে চিত্ত শান্ত হয়, নিজের গর্ভধারিণীর মুখচ্ছায়া মনে পড়ে, তারপর স্বয়ং ভগবতীর ত্রিভুবন আলোকরা মূর্ত্তি মনে পড়ে! মা—মা—মা! সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করিওনা। আমার ইষ্টদেবতা! অন্তর্য্যামিন!—আমার চরণে স্থান দিও।

আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কাঁপিতে কাঁপিতে গোপাল পড়িয়া গেল।

বায়ু হিল্লোলে তখনও সে "মা" "মা" ধ্বনি ভাসিতেছিল, সেই ক্ষুদ্র কুটীর, কুটীর-প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের লতাবল্লরী মাতৃনামে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

তখন জমিদারের প্রাণ ব্যাকুল হইল। তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন পদতলে গোপাল পড়িয়া আছে, তাহার বিস্তৃত চক্ষুটী উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল—সে আলোকে মাতৃনাম। গোপালের মুখে তখনও যেন মাতৃনাম নিঃশব্দে উচ্চারিত হইতেছে! চাহিয়া চাহিয়া, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, বুঝি বুকের ভিতর রক্তের আধার ফাটিয়া গেল, তিনি অস্থির হইয়া ভূমে লুটাইতে লাগিলেন।

• দুঃখিনী রমণী গোপালের মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, সন্ন্যাসী কমণ্ডলু হইতে ঠাকুরের চরণামৃত গোপালের মুখে, চোখে, সর্ব্বদেহে সিঞ্চন করিলেন, ভক্তমণ্ডলী "জয় রামকৃষ্ণ" নামে কুটীর প্রতিধ্বনিত করিলেন।

জমিদার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"মা সতিকুলরাণি! তোমার পদধূলি আমার সন্তানের মস্তকে দাও, আমার মৃত সন্তান বাঁচিয়া উঠিবে। আমি না বুঝিয়া সতীর অবমাননা করিয়াছি, ধর্ম্ম পদদলিত করিয়াছি, আমার পরিত্রাণ নাই—কিন্তু আমার সন্তান নিষ্প্রাণ—

চকিতের মধ্যে একবার বেদীপানে তাঁহার নয়ন ফিরিল! তিনি দেখিলেন, যে দেবতার চিত্র, একদিন পাপের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, এখানেও সেই চিত্র! এখানেও সেই চিত্র হইতে নয়নের সেই অপূর্ব্ব জ্যোতি নির্গত হইতেছে! এখানেও সেই বাৎসল্যের ভাব, সেই সস্নেহ দৃষ্টি। তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন যেন সেই চিত্রপট হইতে কি এক অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইয়া, তাঁহার পুত্রের দেহোপরি পতিত হইল। গোপাল ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিয়া, অস্ফুটস্বরে ডাকিতেছে—"জয় জয় রামকৃষ্ণ।"

তখন জমিদার হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে ডাকিলেন—"জয় জয় রামকৃষ্ণ।" ভক্তমণ্ডলী ও কৌতূহলাক্রান্ত প্রতিবেশীগণও ডাকিলেন "জয় জয় রামকৃষ্ণ।"

গোপালের মাতা প্রভাত হইতেই অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, তিনি দু'এক-জন আত্মীয়াকে লইয়া, ভিখারিণীর সহিত সেই কুটীরে আসিলেন। পথে আসিতে শুনিলেন, গোপালের মৃত্যু হইয়াছে! যখন কুটীরদ্বারে আসিলেন, দূর হইতে দেখিলেন, গোপাল বসিয়া আছে আর তাহাকে ঘেরিয়া ভক্তমণ্ডলী হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে ডাকিতেছে "জয় জয় রামকৃষ্ণ!" গৃহিণী সেই সম্মিলিত কণ্ঠস্বর হইতে পরিষ্কাররূপে তাঁহার স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন, তখন তাঁহার

হৃদয়ের ভাব অন্যরূপ হইল। আনন্দাশ্রুতে তাঁহার হৃদয় ভাসিয়া গেল, মনে মনে বলিলেন,—"ঠাকুর, তুমিই সত্য। নারায়ণ! তোমারই নাম জয়যুক্ত হউক।"

ভিখারিণী তখন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিল—

"আমি অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি,
আর কি শমন ভয় রেখেছি!" ইত্যাদি।

গোপাল, পিতা ও মাতাকে একত্রে দেখিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইলেন। তখন সন্ন্যাসী হাসি হাসি মুখে সকলকে বলিলেন, "ঠাকুরের অভয় চরণে যে আশ্রয় লইয়াছে, সে যথার্থই শমন ভয় এড়াইয়াছে! আপনারা সকলে ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করুন।"

তখন সেই প্রাঙ্গণে বসিয়া, সকলেই ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে শত শত লোক সেখানে সমবেত হইল, তখন জমিদার তাঁহার কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন, "এই গ্রামে যত সম্ভব যাহা কিছু উৎকৃষ্ট দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পার, ঠাকুরের প্রসাদ করাইয়া ভক্তমণ্ডলীকে দেওয়াইবার ব্যবস্থা কর।" যথাসময়ে সেই আদেশ প্রতিপালিত হইল।

সন্ধ্যা সমাগত হইলে, জনমণ্ডলী গৃহে প্রত্যাগত হইল। কুটীর আবার পূর্ব্বের ন্যায় হইল। তখন সন্ন্যাসী, ঠাকুরের আরাত্রিক সমাপন করিয়া, জমিদার ও তাঁহার পত্নীকে বলিলেন,—"আপনারা গোপালকে লইয়া এইক্ষণে গৃহে যান।"

জমিদার হাসিয়া বলিলেন,—"আর গৃহ নাই, ঠাকুর আমার গৃহ ভাঙ্গিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী। তবে করিবেন কি?

জমিদার। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপা এই আমার মা রহিয়াছেন। সন্তানের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া যদি উনি স্থান দেন, আমি এই পুণ্যকুটীরে ঠাকুরের সেবা করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টা অতিবাহিত করিব। আর জমিদারি, বিষয় বৈভব, ভক্তের সেবায়, দীনের পরিচর্য্যায় ব্যয় করিব।

গৃহিণীও তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বহুকাল পরে, দুঃখিনীকে কাছে পাইয়া, তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। ভিখারিণী হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল,—"দেখ্ মা, তোর রূপের তেজটা কি! এই রূপেই তুই মা বিশ্বজয় করেছিস্—এ রূপ কি সবাই দেখতে জানে, না ধরতে পারে? বিধাতা এত রূপ দিয়ে তোর ভৈরবী মূর্ত্তি বুঝি ভালবাসিয়াছিলেন, তাই এই মাতৃমূর্ত্তিতে সাজিয়েছেন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"হে ধনকুবের! তুমি এই রমণীর রূপলাবণ্য দেখিয়া যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলে, মনে করিয়াছিলে যে এ রূপের সংস্পর্শে আসিয়া মানব পতঙ্গ দগ্ধ হইবে, ঠিক তাহা নহে। এই অপূর্ব্ব রূপ স্ত্রী দেহের নহে। এই রমণী সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া, একমাত্র যাহা অপরিচ্ছিন্ন সত্য, তথাবিধ পরম বস্তু লাভ করিয়াই এমন শ্রীমতী হইয়াছেন। *যাহা ভোগের বস্তু, তাহাকে আশানুরূপ ভোগ করিয়া পরে বিসর্জ্জন করিলে যেমন প্রাণের তৃপ্তিলাভ হয়, ইঁনি তেমনি কিছুমাত্র ভোগ না করিয়াও তেমনি তৃপ্ত আছেন এবং হর্ষ বা বিষাদ কিছুতেই আর ইঁহার মন বিচলিত হয় না—সেই জন্য শ্রীমতী। ইঁনি আকাশবৎ স্বচ্ছ হৃদয়ে পরমব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, তাঁহাতেই অনুরাগ স্থাপন করিয়াছেন. ইঁহার সুখ বা দুঃখ কিছুরই প্রার্থনা বা আকাঙ্ক্ষা নাই;—সর্ব্বথা সর্ব্ব বিষয়ে ইঁহার চিত্তের সন্তোষ আছে এবং সম্পূর্ণ বিশ্রান্তি লাভ করিয়া এমন শ্রীমতী। ইঁহার একূপ জ্ঞান-বিকাশ হইয়াছে যে, অন্তর একেবারে নির্ম্মল হইয়াছে এবং নিয়তই অন্তরে বাহিরে একরূপ অনির্ব্বচনীয় পরমস্বরূপ দর্শন করিতেছেন, এইজন্যই এমন শ্রীমতী।* এ রূপ দর্শনে চিত্ত শান্ত হয়, উদ্বেলিত হয়না।

এইরূপ নানাপ্রকার শাস্ত্র সঙ্গত কথা হইতে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতির আলোচনা হইতে লাগিল। জমিদার নবজীবন লাভ করিলেন, অকপটে তাঁহার পাপ ব্যক্ত করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, যে রামকৃষ্ণ নাম প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিয়াছে, তাহার সকল পাপের মার্জ্জনা হইয়াছে।

আমরা শুনিয়াছি, সেই কুটীর সুবৃহৎ মন্দিরে পরিণত হইয়াছে, মন্দির সংলগ্ন এক সুবৃহৎ চত্বর, নিত্য অতিথি অভ্যাগতের সেবায় ব্যবহৃত হইত এবং সেই ধনাঢ্য জমিদার আজীবন পুত্র ও পত্নীর সহিত সেই "মাতৃমূর্ত্তি" শরণ করিয়া, শ্রীশ্রীকৃষ্ণরামি দেবের সেবায় জীবনপাত করিয়াছেন।

সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

—:-:—

* যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে চূড়ালা বৃত্তান্ত।

প্রার্থনা।

(১)

তুমি আমার
আমি তোমার
দু'টি মিলে এক প্রাণ,
দু'জনার মাঝখানে,
থাকিবেনা ব্যবধান।

(২)

তোমার লাগি
হলেম ত্যাগী
সর্ব্বস্ব করিনু দান,
তবু তুমি রুষ্ট হলে
এই বুঝি সুবিধান।

(৩)

তোমার সনে
চরণ ধ্যানে
ত্যজিলাম কুলমান,
ভালবেসে অবশেষে
সহি এত অপমান।

(৪)

চাতুরী করে
চরণে ধরে
প্রথমে বাড়ালে মান,
শেষে কিন্তু পায়ে ঠেলে
দিলে ভাল প্রতিদান।

(৫)

কূটস্থ হাসি
সৌন্দর্য্য রাশি
প্রেমময় তবপ্রাণ,
তাই বুঝি অকাতরে
অন্যে কর প্রেমদান।

(৬)

সকলে দেখে
রয়েছি সুখে
হৃদয়ে দিয়াছ স্থান,
জানেনাত অহিবিষে
জ্বলিছে অন্তর প্রাণ।

(৭)

নিষ্ঠুর পতি
সার দুর্গতি,
কিসে সে বাঁচাবে প্রাণ,
সদা পোড়ে মনাগুণে
থাকে শুধু অভিমান।

(৮)

কালিন্দীকূলে
কীর্ত্তি রাখিলে
হয়ে এত বুদ্ধিমান,
কলঙ্কিনী রাধা হলো
হায়! বিধি ভগবান!

(৯)

তুমি আমার
আমি তোমার
দু'টি মিলে এক প্রাণ,
দুজনার মাঝখানে
থাকিবে না ব্যবধান।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভক্ত রাজেন্দ্রনাথ।

১২৯৮ সাল, ১০ই ভাদ্র, বুধবার, জন্মাষ্টমী। এই শুভদিনে কাঁকুড়গাছী যোগস্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব—অর্থাৎ ঠাকুর রামকৃষ্ণের ষষ্ঠবার্ষিক প্রতিষ্ঠা মহোৎসব। আমরা এই দিনে প্রাতে ৮ ঘটিকায় সেবকমণ্ডলীর অগ্রগণ্য রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ১১নং মধুরায়ের গলিস্থ বাটীতে সংকীর্ত্তনে যোগদান করিবার জন্য গমন করি। যাইয়া যাহা দেখিলাম, সেই প্রেমপূর্ণ করুণরসের পবিত্র ছবি এখনও মানসপটে মাঝে মাঝে উদয় হইয়া প্রাণকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে। উৎসব উপলক্ষে রচিত কীর্ত্তনটী গীত হইতেছে, আর রামচন্দ্রের গণ্ডস্থল দুইটী নয়নধারায় ভাসিয়া যাইতেছে। সে অপূর্ব্ব প্রেমধারা দেখিয়া আমাদের পাষাণ প্রাণও তখন বিগলিত হইয়াছিল। অত্যন্ত মুগ্ধ হইলাম। কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যোগোদ্যানে চলিলাম। আমারাও গাহিতে লাগিলাম—"বিষম বিষয় তৃষা গেলনা, হোলোনা দীনের উপায়।

পেয়ে শ্রীচরণ, করি নাই হে যতন,
পরম রতন হারালাম হেলায়।" ইত্যাদি (রামচন্দ্র কৃত জীবনী দেখ)

রামচন্দ্রের মাসতুতো ভাই, ভক্ত-প্রবর শ্রীমনোমোহন মিত্র মহাশয় এই কীর্ত্তনের সঙ্গে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন। দুটী ভাইয়ে এত প্রণয় ও সদ্ভাব যে, জগতে এরূপ সৌহৃদ্য দেখা যায়না। মায়িক সম্বন্ধ কোথায় ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে! এখন দু'জনেই শ্রীরামকৃষ্ণের দাস—এই সম্বন্ধে আত্মহারা।

এই উৎসবের দিনে আমাদের প্রথম যোগোদ্যান দর্শন। তৎপরে প্রতি রবিবারে এবং অবকাশ দিবসে আমরা প্রায়ই যোগোদ্যানে যাইতাম। দুই চারিবার যাতায়াত করিতে করিতে ক্রমশঃ ভক্তগণের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। তখন মধ্যে মধ্যে মনোমোহন বাবুর সহিত একটী যুবক আসিতেন। তাঁহার নাম শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। ইনি সম্প্রতি মনোমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মাণিকপ্রভার সহিত বিবাহিত হইয়াছেন। রাজেন্দ্রনাথ অতি শান্ত-স্বভাব, মৃদুভাষী, সহাস্য আনন এবং বিদ্বান; বোধ হয় সে সময়ে বি, এ, পড়িতেছিলেন। এই সকলের উপর তাঁহার একটী বিশেষ গুণ, তিনি ভক্ত-প্রাণ এবং পরদুঃখকাতর। এইরূপে কিছুকাল আসা যাওয়ার পর, তিনি সস্ত্রীক মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকটে ১২৯৯ (খৃঃ ১৮৯৩) সালের অগ্রহায়ণ

মাসে দীক্ষিত হয়েন। দীক্ষালাভের পর তিনি বিশেষ অনুরাগের সহিত স্বীয় ইষ্টসাধনায় প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি অতি নম্র ছিলেন, তাই লোক দেখান কোনও প্রকার কার্য্য তিনি ভালবাসিতেন না।

ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হয় ১৩০০ সালের দুর্গাপূজার সময় সেবক রামচন্দ্র পৃষ্ঠব্রণরোগে আক্রান্ত হয়েন। পূজার কয়দিন যোগোদ্যানে ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অনেক ভক্ত মহাষ্টমীর দিন পূজায় যোগদান করিবার জন্য উপস্থিত। আমাদের ভ্রাতা রাজেন্দ্রনাথও আসিয়াছেন। ভক্তগণ পূজা করিতেছেন, কিন্তু রামচন্দ্র বিহনে তাঁহারা উল্লাসহীন ও ব্যাকুল। রামচন্দ্র যে ভাবে পূজা করেন, সেরূপ পূজা আজ হইতেছে না। তাঁহার পূজা দেখিয়া কত পাষাণ প্রাণ দ্রব হইয়াছে, কত বদ্ধজীবের মোহপাশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, কত নাস্তিক রামকৃষ্ণপদে জীবন মন উৎসর্গ করিয়াছে। তাঁহার স্তুতিগীতি ও প্রার্থনা শ্রবণে কত পাষাণের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া নয়নাশ্রু দরধারায় বহিয়াছে। হায়! হায়! যাহা দেখিয়াছি, তাহা আর দেখিবনা; যাহা শুনিয়াছি, তাহা আর শুনিব না; যাহা উপভোগ করিয়াছি, তাহা এখন স্মৃতিপটে উদয় হইলে, কেবল দীর্ঘশ্বাসের সহিত নয়নকোণে দুই এক ফোঁটা জলের আবির্ভাব হয় মাত্র। যাহাহউক, সেদিন ভক্তগণ পূজা শেষ করিয়া ঠাকুরের চরণে জানাইতেছেন, যেন সত্বরই আবার তাঁহারা রামচন্দ্রকে সুস্থ শরীরে তাঁহাদের মধ্যে দেখিয়া জীবন জুড়াইতে পারেন;—এইরূপ ভাবপ্রকাশের সময় রাজেন্দ্রনাথ পূজার কোষাখানি লইয়া তাঁহার ললাট প্রদেশে ঘন ঘন দারুণ আঘাত করিতে লাগিলেন, আর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন;—বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর! রামচন্দ্রের ব্যাধি আমাকে অর্পণ কর, আমি তাঁহার হইয়া রোগভোগ করিতে ও জীবন দিতে প্রস্তুত—তুমি তাঁহাকে রক্ষা কর।" তাঁহার এইরূপ আর্ত্তি দেখিয়া উপস্থিত ভক্তগণ দারুণ ক্রন্দনরোল তুলিলেন;—ঠাকুরের বেদী যেন টলিতে লাগিল। প্রভু যেন সেই সরল যুবকগণের আকুল ক্রন্দনে কাণ দিলেন। কিয়ৎকাল পরে সকলে এইরূপ পূজা সমাপন করিলেন। আমাদের বেশ স্মরণ আছে, ডাক্তারেরা মূত্রপীড়াগ্রস্ত রামচন্দ্রের জীবনলাভে বিশেষ সন্দিহান ছিলেন, কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, যদি জীবনরক্ষা হয় ব্রণের ক্ষত শুকাইতে অন্ততঃ তিন চারি মাস লাগিবে। অদ্ভুত রামকৃষ্ণ-কৃপা! বোধ হয় আটদশ দিবস পরেই রামচন্দ্র সিমুলিয়ার বাটী হইতে যোগস্থানে আসিলেন, ক্ষত অনেক শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে। এক মাসের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থদেহ প্রাপ্ত হইলেন।

আমাদের বিশ্বাস, ভক্তরাজেন্দ্রনাথের সেই ব্যাকুল প্রার্থনা—তাঁহার গুরুদেবের জীবনলাভের প্রধান কারণ। রাজেন্দ্রনাথ চাপালোক ছিলেন,—নিজের ভাব ভক্তি গোপন রাখিতেন। কিন্তু সেইদিন তাঁহার গুরুভক্তি ও ইষ্টানুরাগ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

ইহার পর রাজেন্দ্রনাথ 'বোর্ড অফ রেভিনিউ' অফিসে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। সংসার প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দীন দুঃখীর জন্যও চিন্তা করিতেন এবং তাঁহার অর্থ এবং সামর্থ্য—এই দুইটীর দ্বারাই তিনি তাহাদিগের সাহায্যে আজীবন নিযুক্ত ছিলেন। ১৩০৬ সালে রাজেন্দ্রনাথের স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। তখন তাঁহার তিন বর্ষীয়া একটী শিশুকন্যা।

কিছুকাল পরে, গড়পার-বাসী শ্রীমতিলাল নাগ মহাশয়ের কনিষ্ঠাকন্যা শ্রীমতি প্রমোদপ্রভার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহে তাঁহার কোনও সন্তান সন্ততি হয় নাই। রাজেন্দ্রনাথ এক কর্ম্মস্থলে যাতায়াত করা ব্যতীত বিশেষ কোথাও যাইতেন না। নিত্য বাটীতে ঠাকুরের সেবা ও পূজা করিতেন। অবসর সময়ে ধ্যান, জপ এবং প্রভুর লীলা আলোচনায় কাল কাটাইতেন। ছুটির দিনে কখনও যোগোদ্যানে, কখন বা দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে যাইয়া সমস্ত দিন ঈশ্বর চিন্তা করিতেন। কত ব্যথিত-হৃদয়ে তিনি ভগবদ্-কৃপা বুঝাইয়া দিয়া, সান্ত্বনার শীতলবারি ঢালিয়াছেন। কতজনকে তিনি বিপদে মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা দেখাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ধৈর্য্য ধরিয়া ঈশ্বরমুখাপেক্ষী হইতে শিখাইয়াছেন। জনৈক উপকৃতা প্রতিবাসিনী রাজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"পিতা, পুত্র, ভ্রাতা তুমি, জানি পরীক্ষায়—
পেয়েছি যে স্নেহরাশি, হয়নি হবেনা বাসি,
জাগিছে, জাগিয়া রবে, চির এ হিয়ায়।

"বিপদের ঘূর্ণিপাকে বাঁচালে আমায়—
জ্ঞানগর্ভ উপদেশে, ঠেকি ধৈর্য্যকূলে এসে,
নতুবা এ মন-তরী ভাসিত কোথায়!"

পাঠক! রাজেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কবিত্ব ভাবেরও বিশেষ বিকাশ ছিল। তিনি ১৩০৭ সালে তিনটী গীত রচনা করিয়া তাঁহার গুরুদেবের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র উহা দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং শেষোক্ত

গীতটী তাঁহার 'ঈশ্বরলাভ' নামক বক্তৃতায় সংযুক্ত করিয়া গান করিয়াছিলেন। গান তিনটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

(১)

"শোভিছে কনকতরু বিপিন মাঝারে রে।
ধরি সে পাদপবরে লতিকা দুলিছেরে॥
গরল অনিল পিয়ে, সুধা বায়ু উগারিয়ে,
বিষদগ্ধ বনে কত জীবন বিতরেরে॥
আবেশে বিভোর হয়ে, লতিকার কোলে শুয়ে,
সুখের স্বপন ঘোরে ফুলদল হাসেরে॥

(২)

সুনিল জলধিপারে, কনক কিরীটশিরে,
বিরাজেন রামকৃষ্ণ মদনমোহন।
বিবিধ তটিনীগণে, বিচরিয়ে নানা স্থানে,
চুম্বিছে সকলে তাঁর সুচারু চরণ।
চল সবে হেরি সেই পরাণ রতন॥
ক্রমে দিন হ'ল গত, কালে ধরিতে উদ্যত,
ত্বরা করি নাম-ভেলা কররে বন্ধন।
স্বচ্ছ সুবিমল বারি, হের নদী বহে ধীরি,
ভাসায়ে তাহাতে তরী কর আরোহণ।
অসার সংসারে আর রেখোনারে মন॥
দ্বিপথ সন্দেহ ঘোরে, মোদের উদ্ধার তরে,
দাঁড়াইয়ে কর্ণধার আছে একজন।
বিশ্বাস শলাকা লয়ে, তাঁহার কোলেতে শুয়ে,
চল যাই নাম-ভেলা করি আরোহণ—
হইতে হবেনা চক্র জলেতে মগন।
প্রাণনাথে নিরখিয়ে জুড়াবে জীবন॥

(৩)

ঘন তমোরাশি, গিয়েছেরে টুটি,
রামকৃষ্ণ নাম তপন-কিরণে।

আয় সবে মিলি,　　রামকৃষ্ণ বলি,
মনোসাধে খেলি প্রকৃতি বিপিনে ॥
লতিকার কোলে,　　ফুলবালা দোলে,
এস তুলি মোরা সে কুসুম সনে।
বিপিন মাঝারে,　　ধরি পিকবরে,
দাও নাম-সুধা ঢালি তার প্রাণে ॥
অটবী উপরি,　　পুলকেতে পূরি,
গাইবে সে নাম ললিত পঞ্চমে।
কোকিলের ধ্বনি,　　রামকৃষ্ণ ধ্বনি,
মাতাবে ভুবন রামকৃষ্ণ প্রেমে ॥
ধরি চাতকেরে,　　শিখাইয়া দেবে,
রামকৃষ্ণ নাম কহি কাণে কাণে।
সুনীল অম্বরে,　　গাবে উচ্চৈঃস্বরে,
রামকৃষ্ণ নাম আপনার মনে ॥
নবীন নীরদে,　　লিখেদে লিখেদে,
রামকৃষ্ণ নাম চপলা অক্ষরে।
দামিনী চকিলে,　　হেরিব সকলে,
রামকৃষ্ণ নাম প্রফুল্ল অন্তরে ॥
চল বাত-ভরে,　　গগন উপরে,
বিতরিগে নাম তারকা মাঝারে।
আঁকো সুধাকরে,　　সুধার উপরে,
রামকৃষ্ণ ছবি সুধা যাহে ক্ষরে ॥
শুক্লতিথি সাঁজে,　　রামকৃষ্ণ সাজে,
উঠিবে চন্দ্রমা গগন মাঝারে।
শশধর কোলে,　　রামকৃষ্ণ খেলে,
হেরিয়া মাতিবে সবে চরাচরে ॥
জীবের হৃদয়ে,　　ভক্তি তুলি দিয়ে,
মদনমোহনে লিখ যতনে।
রামকৃষ্ণ বলি,　　দিয়ে করতালি,
এস সবে নাচি মাতোয়ারা প্রাণে ॥

রাজেন্দ্রনাথ ভাবুক ও চিন্তাশীল ছিলেন। হয়ত আরও কত সুমধুর গীতি তাঁহার ভক্তিভাব হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, কিন্তু আর আমাদের জানা নাই।

রাজেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় গীতে বলিয়াছেন "ক্রমে দিন হল গত, কালে ধরিতে উদ্যত"—ঠিক তাহাই হইল। ক্রমে দিন যাইতে যাইতে 'কাল' আসিয়া রাজেন্দ্রনাথকেও একদিন ধরিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, একদিন তিনি কর্ম্মস্থল হইতে গৃহে ফিরিবার কালে, তাঁহার মুখ হইতে রক্ত উঠিল, ক্রমে ইহা যক্ষ্মারোগে পরিণত হইয়া শেষাবস্থায় তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া তুলিল। চিকিৎসকগণের যত্নে যন্ত্রণার উপশম ঘটিত বটে, কিন্তু রোগ আরোগ্য হইল না। রোগের চিকিৎসা হয়, কিন্তু কালের চিকিৎসা নাই। এইরূপে প্রায় আড়াই বৎসর রোগ ভোগ করিয়া গত ২৭শে বৈশাখ, মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় রাজেন্দ্রনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গেলেন? ইহার উত্তরে বলিতে পারি—"রাজেন্দ্রনাথ অহর্নিশি যে গুরু ও ইষ্টপাদপদ্ম চিন্তা করিতেন, রাজেন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তিমশয্যায় অনবরত যাঁহার চরণচিন্তা করিয়া রোগ-যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করিতেন, যাঁহার করুণা ও মঙ্গল-ইচ্ছা বুঝাইয়া দিয়া তিনি তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণকে সান্ত্বনা দিতেন, যাঁহার সৌম্য মনভুলানো প্রতিমূর্ত্তি তিনি তাঁহার শিরদেশে পুষ্পচন্দনে সর্ব্বদা সজ্জিত রাখিয়া বার বার স্পর্শ ও প্রণাম করিতেন, যাঁহার মধুর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে—সেই পতিতপাবন জীবতারণ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীপাদপদ্মে রাজেন্দ্রনাথ লীন হইয়াছেন।" ভক্ত যথার্থই বলিয়াছেন—

"অমৃত কাননবাসী প্রেমিক-রসাল,
রামকৃষ্ণ প্রাণারামে, সেবিতে সে সত্যধামে,
নিত্যদেহে চলে ভ্রাতা রাজেন্দ্র-তমাল।
এস ধর্ম্ম-ভাই-বোন, মিলিয়া সবাই—
"রামকৃষ্ণ হরি হরি,"— তোলো ধ্বনি কণ্ঠভরি,
নেহারো শ্রীপদতলে, সে রাজেন্দ্র ভাই॥"

তবে থাকো ভাই রাজেন্দ্র! প্রভুর অভয় পদতলে অনন্তকালের জন্য থাকো। কিন্তু এ স্বার্থপর আত্মজনের একটী প্রার্থনা—একটী যাচিঞা এখনও তোমার নিকটে আমাদের আছে। ভাই! ঐ প্রাণারাম প্রভুকে একবার জিজ্ঞাসা করিও, কবে আমরা তোমার মত প্রভুকে বিপদ ও সম্পদের সখা বলিয়া চিনিব? কবে আমরা সকল ভুলিয়া তাঁহার মূর্ত্তি মাথায় তুলিয়া

লইব ? কবে আমরা বিষয় পিপাসা, সংসার লালসা বিসর্জ্জন দিতে শিখিব ? কবে এই মায়াপাশ কাটাইয়া তাঁহার অভয় চরণতলে তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া আনন্দবিলাসে নৃত্য করিব ? ভাই, এ জগতে কত সময়ে কত প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমাদের চিত্তকে শান্ত করিয়াছ—এখন এই প্রশ্নের উত্তরটি দিবে কি ?

—:০:—

বিপন্ন উকীলের জন্য সাহায্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে বিগত ১৪ই জানুয়ারীর পর হইতে ৩১শে মার্চ্চ অবধি নিম্নলিখিত সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে বিপন্ন উকীল দেবেন্দ্রনাথের জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত	নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর, নদীয়া		২৲
,,	মোহিনীমোহন ঘোষ বোম্বাই	...	৫৲
,,	কেশবলাল সেন মুঙ্গের, (১ম দফে)	.	১৲
,,	প্রিয়নাথ বসু মিলিটারি একাউণ্টস্ অফিস্	...	২৲
,,	রমেশচন্দ্র মিত্র মিনাখাঁ ২৪ পরগণা	...	২৲
,,	প্রভাকর বসু, বীরভূম	...	৷০
,,	জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী, বাণেশ্বর	...	১৲
,,	রামকৃষ্ণানন্দ রায়, ময়মনসিংহ,	..	১৲
,,	কেশবলাল সেন মুঙ্গের, (২য় দফে)	..	১৲
,,	উগাক্ষণী মেস মেম্বরগণ, বড়বাজার, কলিকাতা	...	২৲
,,	গিরিশচন্দ্র সিংহ, তারাস, পাবনা	..	২৲
,,	যামিনীকান্ত সেন মিলিটারি একাউণ্টস অফিস কলিকাতা		১৲
	চারিজন, হিতাকাঙ্ক্ষী, ঐ ঐ ঐ ঐ		২৲
শ্রীযুক্ত	পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিমলা পাহাড়	...	১৲
,,	রাজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ ঐ	...	১৲
,,	বিনয়চন্দ্র মজুমদার, ঐ ঐ	...	১৲
	জনৈক বন্ধু, কলিকাতা	...	১৲
	সেক্রেটারি, মোক্তার বার, পাবনা	...	১০৲
শ্রীযুক্ত	রাধারমণ সেন, গোরক্ষপুর	...	১৲
	ষ্টুডেণ্ট মেডিক্যাল কলেজ মেস, কলিকাতা	...	১৲

শ্রীযুক্ত সনাতন দাস, রাঁচি	...	৫৲
,, রাধিকাপ্রসাদ, মহল্লামির্জ্জাপুর, মুঙ্গের	...	১৲
,, মন্মথনাথ ঘোষ বর্ম্মণ, বাগেরহাট	...	১৲
,, অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর, নদীয়া	...	১।৶০
,, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্ধুগণ, মেটিলি, জলপাইগুড়ি		৩।০
,, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রেঙ্গুন	...	৫৲
আলিপুরের উকিল মহোদয়গণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু, বি, এল		২৪৲
	মোট—	৭৯।৶৹

যিনি এই বিপন্ন উকীল পরিবারের জন্য যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু সাহায্য করিবেন, তাহাই নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে।

স্বামী যোগবিনোদ, শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির, যোগোদ্যান,
কাঁকুড়গাছী, কলিকাতা।

সাহায্যের খরচের হিসাব—

২০শে	জানুয়ারী	১৯১১,	দেবেন্দ্রনাথকে সংসার খরচের জন্য	২৲
২৫শে	,,	,,	ঐ, ঐ ঐ	৮৲
২৮শে	,,	,,	বিস্কুট এক টিন	৸/০
৩০শে	,,	,,	দেবেন্দ্রনাথকে সংসার খরচের জন্য	২॥০
২রা	ফেব্রুয়ারী	,,	ঐ ঐ	১৲
৮ই	,,	,,	ঐ ঐ	২৲
১১ই	,,	,,	ঐ ঐ	৩৲
১৫ই	,,	,,	ঐ ঐ	৩৲
ঐ	,,	,,	বোরিক কটন্	।০
২৩শে	,,	,,	দেবেন্দ্রনাথকে সংসার খরচের জন্য	১০।০
২৮শে	,,	,,	১টা মশারি	১৸১০
ঐ	,,	,,	১টী শীতলপাটি	১৸/০
১২ই	মার্চ্চ, ,,	,,	দেবেন্দ্রনাথকে সংসার খরচের জন্য	২৲
২৫শে	,,	,,	ঐ ঐ ঐ	১৲
২৮শে	,,	,,	ঐ ঐ ঐ	৩৲
৩১শে	,,	,,	ঐ ঐ ঐ	১১৲
			মোট—	৫৩৷৶১০

জমা ——————— ৭৯৷৶০

১৪ই জানুয়ারীর পর বাকী জমা ২৴০

মোট— ৮১৷০

খরচ — — — ৫৩৷৵১০

৩১ মার্চ্চ, ১৯১১ বাকী ১৮৴১০

—:—

উৎসব সংবাদ।

৭ই ফাল্গুন, রবিবার সালিখা-রামকৃষ্ণ-অনাথ-বন্ধু-সমিতির অষ্টমবার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সমস্ত দিবস পূজা, পাঠ, নামসংকীর্ত্তন, ভক্ত-সেবা ও দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা হইয়াছিল।

১৮ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মতিথি পূজা এবং ১৯শে তারিখে জন্মোৎসব ও রাজভোগ সম্পন্ন হইয়াছে। জয়নগর মজিলপুর নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মধুসূদন বিদ্যানিধি রামকৃষ্ণ-ভাগবত (কথকতা) প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ দিনে তিনি যোগোদ্যানে ঠাকুরের অবতারবাদ ও যোগোদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা সেবক রামচন্দ্রের সহিত ঠাকুরের সংঘোটন প্রভৃতি বিষয় লইয়া কথকতা বলিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে দুইটী গীত পরে উদ্ধৃত হইল।

বাঁকুড়া জেলার কোয়ালপাড়া যোগাশ্রমে ১৮ই ফাল্গুন তারিখে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়াছে। সমস্ত দিবস পূজা, পাঠ সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ধর্ম্মবিপ্লব নাশ ও জীবের মুক্তির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব বিষয়ে একটী সুললিত বক্তৃতা করিয়া সর্ব্বসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

কটক জেলার অন্তঃপাতী বহুগ্রামে ১৮ই তারিখে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়াছিল। সংগীত, পূজা, পাঠ, ভক্তসেবা ও দরিদ্রসেবা যথাযথ সম্পন্ন হইয়াছে।

বাঙ্গালোর আলসুর শ্রীরামকৃষ্ণমঠে স্বামী যোগেশ্বরানন্দের সবিশেষ তত্ত্বাবধারণে ২১শে ফাল্গুন তারিখে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে নগরসংকীর্ত্তন, দরিদ্রসেবা, ঐকতান বাদ্য এবং বক্তৃতাদি হইয়াছিল।

রেঙ্গুনে ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে সমারোহের সহিত ২১শে ফাল্গুন তারিখে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব হইয়া গিয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ও তাঁহার প্রিয়-সেবক শ্রীরামচন্দ্রকে অপূর্ব্ব ফুলসাজে সাজাইয়া, কালী-সংগীত ও প্রভুর গুণানুকীর্ত্তনে উৎসবক্ষেত্র আনন্দময় হইয়াছিল। এখানকার অনেক ভক্ত, সেবক রামচন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ লাভের উপায় স্বরূপ ভাবিয়া, তাঁহাকে গুরুরূপে হৃদয়ে ধারণ করত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপা-প্রার্থী হন, এইজন্যই ঠাকুরের সহিত তাঁহারা সেবক রামচন্দ্রের পূজা করিয়া থাকেন।

২১শে ফাল্গুন, বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে মহা সমারোহে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে।

যশোহর, চৌগাছা রামাশ্রমে ৩০শে ফাল্গুন, দোলপূর্ণিমার দিন ঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়াছিল।

যশোহর হরিণাকুণ্ড বিবেকানন্দ আশ্রমে ১২ই চৈত্র তারিখে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়াছিল।

—:—

দুইটী গীত।

(১)

সিন্ধুখাম্বাজ—মধ্যমান।

চিনিবারে ত্রিনয়নায় তুমি দুনয়নে না পারিবে।
যতদিন অবোধ মন তোমার, জ্ঞানের আঁখি না খুলিবে।
সে আঁখিটী খুলবে যবে, তোমার জীবত্ব ঘুচিয়ে যাবে,
তখনি শিবত্ব পেয়ে, মায়ের অভয়চরণ সার করিবে॥
এত সাধের বিলাস ভবন, শ্মশান সম হবে তখন,
(দেখবে) শৃগাল কুকুর আপনার জন, (আপন) দেহকে পর ভাবিবে॥
ভালমন্দ আচার বিচার, হবে ও নয়নে সব একাকার,
(তখন) তুমি আমি ঘুচে গিয়ে, কেবল 'আমি' হয়ে যাবে॥
কেঁদে বলে মধুসূদন, কবে কালি! খুলবে নয়ন,
পেয়ে তোমার তত্ত্ব, হব মত্ত, (ভবে) আসা যাওয়া ঘুচে যাবে॥

শ্রীমধুসূদন বিদ্যানিধি।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কে তুমি ভকতবর, প্রেমিকের চূড়ামণি।
চিনালে শ্রীভগবানে, ল'ভে সে দুর্লভ-মণি॥
কৃপাসিন্ধু ভাগ্যবান্, হে বিশ্বাসী গুণধাম,
সার্থক তোমার নাম, দত্ত রাম মহামানী॥
গৃহীর আদর্শ তুমি, ভক্তি পথে মহাজ্ঞানী,
তাইতো হে অন্তর্য্যামী, নিলেন তোমারে টানি॥
কল্পতরু কৃপাবলে, সিংহবল বুকে পেলে,
সেই শক্তি সঞ্চারিলে, শুনায়ে অভয়বাণী—
"পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্, সশরীরে মূর্ত্তিমান্,
দেখে যাবে ভাগ্যবান্, পূজবে সে পা দুখানি॥"
'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি, 'জগদ্গুরু চিন্তামণি,'
ছেয়েছে আজি অবনী, তাইহে তোমারে নমি॥

সেবক—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

ভক্তপ্রবর বলরাম।

রামকৃষ্ণ-ভক্ত-হারে মধ্য-মণি হয়ে,
কে তুমি বৈষ্ণবকুল চূড়ামণি ধীর।
প্রেমিক, সাধক, সিদ্ধ গুরু-কৃপা পেয়ে,
ছুটালে মরমে প্রেম ভকতির নীর॥
তোমারি আবাসে শুনি প্রেম অবতার,
ভক্ত সঙ্গে নানা রঙ্গে দিবস যামিনী
বিলাইল জ্ঞান প্রেম অবারিত দ্বার।
অমর হইল দীন পিয়ে সঞ্জীবনী॥
ভক্ত-সেবা ভক্ত-মেলা তব পূত গেহে,
আজিও চলিছে দেব সমভাবে সব।
বলরাম! প্রাণারাম ধন্য নরদেহে,
নিয়োজিলে গুরুপদে অতুল বৈভব॥

হেন ভক্ত-সঙ্গ মিলে অদৃষ্টে যাহার।
গোষ্পদ সমান তা'র ভবনদী পার॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

শান্তিশতকের অভিমত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রণেতা, আদর্শভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'রামকৃষ্ণ-শান্তিশতক' পাঠে উক্ত গ্রন্থপ্রণেতা রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

MORTON INSTITUTION
50, Amherst street.

Dear Haran Babu,

How grateful I am to think that you remember me! Your kind and very welcome gift of the sacred songs is just to hand. It calls forth a world of associations—sweet and hallowed—such as I may never come across once again in my life!

May the Lord bless you.

Yours affectionately
M.

ইহার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ :—

প্রিয় হারাণবাবু! আপনি আমাকে স্মরণ রাখিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ! আপনার পবিত্র সঙ্গীতপূর্ণ পুস্তক, আপনার সদয় উপহার স্বরূপ, আমি এইমাত্র পাইলাম। এই পুস্তক অনেক পবিত্র ও সুমধুর স্মৃতি, আমার হৃদয়ে উদ্রিক্ত করিয়াছে। এমন বুঝি, এ জীবনে আর আমি কখন পাইব না।

আপনি ও আপনার পরিবারবর্গ শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

আপনার স্নেহাভিলাষী
"ম।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণ ভরসা।

তত্ত্ব-মঞ্জরী।

চৈত্র, সন ১৩১৭ সাল।

চতুর্দ্দশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা।

বীণাপাণি।
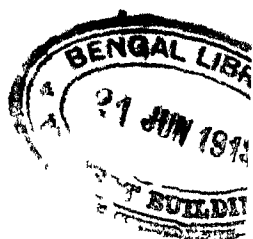
আয় (গো) মা বীণাসঙ্গে, বঙ্গ-কুঞ্জে বীণাপাণি।
অজ্ঞান আঁধার ঘোর অপসর নারায়নী॥
বঙ্গীয়-গগন-গায়—
একে একে ডুবে যায়,
জ্ঞান-জ্যোতি সমুদয়, ওগো জ্ঞানগরবিনী।
সব আলো নিবে গেল,
ভারত-গগন-ভাল
ছাইল তিমির জাল, অবিদ্যা-কাল-যামিনী।
এ সময় নাহি এলে,
হাল ধরি না ফিরালে,
অবিদ্যা-তরঙ্গ-ভঙ্গে ডুবিবে জ্ঞান-তরণী।
বাল্মিকী, তুলসী, ব্যাস,
তানসেন, কালিদাস,
(তব) আরাধি চরণযুগ, অমর হয়েছে শুনি।
তাই আজি জোড় করে,
ডাকি গো মা ঘরে ঘরে,
অবিদ্যা-তামস নাশ জ্ঞান-ভানু-বিকাশিনী॥

শ্রী[illegible]নাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রীতিমালা।

মানব মূঢ়মতি কর প্রণিধান।
পরিহরি মায়াবেশ হও সচেতন॥ ১
কে তব কান্ত আর কে তব কুমার,
বেশ করে ভাব মনে এই বিচিত্র সংসার,
মায়া দড়ি গলে দিয়ে টানে বারেবার,
হারাওনা মায়াবশে গুরু মহাধন॥ ২
পদ্মপত্রে বারিবিন্দু যেমন চঞ্চল,
সেই মত শোকে তাপে হইবে বিচল,
হারাইয়ে মহামন্ত্র হইলে বিকল,
যেতে হবে তোমায় তখন শমন ভবন॥ ৩
যতক্ষণ উপার্জ্জন করিছ সংসারে,
সবে তোমায় খাতির যত্ন করিবে সাদরে,
ভেবে দেখ কে তোমায় লবে কোলে করে,
যখন কায়া ছেড়ে যাবে তোমার এই প্রিয় রত্ন ধন॥ ৪
বাল্যকালে বাল্যখেলা খেলেছো অবাধে,
যৌবনে যুবতী সঙ্গে যৌবন প্রসাদে,
বৃদ্ধকালে পড়ে সদা নানা চিন্তাহ্রদে,
সাধিবে আর কবে বল সেই মহামন্ত্র ধন॥
সকল কর্ম্ম করে চল, তাঁরে ডাক সর্ব্বক্ষণ,
হৃদিপদ্মে বসে শ্যামা দিবেন দরশন,
সরল প্রাণ, সরল জ্ঞান, এইমাত্র ধন,
মহানন্দে মাতোয়ারা রবে সর্ব্বক্ষণ॥ ৬

এই প্রীতিমালায় কতকগুলা কথার সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু যতই আমরা জ্ঞানী হইনা কেন, সকল লেখকের মনোভাব বুঝা অতি কঠিন, কেননা আমরা যেচে তো আর সেই ভাব হৃদয়ে আন্‌তে পারিনা, যতক্ষণ না আপনা হতে সেটা অন্তরে উদয় হচ্চে। যদি পাহাড়ের বিষয় কোন লোকের কাছে বলা যায়, সেটা কি তিনি বুঝতে পারেন—যদি দেখে না থাকেন; সেই রকম যেটা অপার্থিব কিন্তু কেবল দিব্যদৃষ্টি ও ভাবগ্রাহ্য, তা কি প্রকারে ফাঁকি দিয়ে আদায়

হতে পারে? এই প্রকৃত ভাব না হওয়ায় আমরা তখন অভিধানগত অর্থের সাহায্যে সেটা এক রকম আপনার মত করে মনের মধ্যে গড়ে পিটে নেই, তাই মুনিদের মত নানা রকম বোধ হয়, বাদ বিসম্বাদ হতে থাকে, আর মৌখিক বিচার করে করে আসলগুলা হারিয়ে ফেলি। যখন প্রকৃত হতে পারা যাবে তখন আর আনন্দের সীমা থাকবে না। তাই ভোলানাথ মহেশ্বর আনন্দে কিছু বলতে না পেরে কেবল বোম বোম করে নৃত্য করছেন। "রোম রোম্ ফুল্লিত ভই, মুখে না আবে বোল"—(সহজ বাই)। না হবার প্রধান কারণই চঞ্চলতা "যাবজ্জীবো ভ্রমত্যেব তাবৎ তত্ত্বং ন বিন্দতি"—(গোরক্ষনাথ)। "আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষঃ বরাননে"—(আগম)—নিজের পরেশ-মণি ছেড়ে কেবল ঘুরে বেড়ালে মোক্ষলাভ কোথায়। মহাদেব এই কথা বলে গেছেন। এই চঞ্চলতা বিন্দুব্রহ্ম অর্থাৎ শুক্রের চাঞ্চল্যে ঘটে "বিন্দুশ্চলতি যস্যাঙ্গে চিত্তং তস্যৈব চঞ্চলম"—অমৃত সিদ্ধি। সকল বিষয়ের নিয়ম আছে, সেইগুলা ঠিক্ ঠিক্ হলেই পূর্ণ বিকাশ হয়, যেমন বিচি পুঁতে সমান জল হাওয়া রৌদ্র লাগলে তবেই গাছটী বিকাশ হয়।

মূঢ়মতি—মূঢ় কিনা আপনাকে হারিয়ে পাবর জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের জন্য ব্যাকুলতা, ব্যস্ততা। সে না থাক্‌লে শরীররূপ ইন্দ্রিয় যে থাকবেনা, সেটার দিকে নজর নেই। মাথা বাদ দিলে ধড় কতক্ষণ থাকে? মাথা ও ধড়ের যোগ থাকলে সকল মঙ্গল। ইহাকেই Religion বলে—Re—again and lego—to bind অর্থাৎ যে তার কেটে গেছে সেটা পুনরায় যোগ করে দেওয়া। এই জন্যই সত্য সাধনা।

মায়াবেশ—মিথ্যাকে সত্য বলে মনে হওয়া, অর্থাৎ যা দেখছি শুনছি এটাই যেন চিরকাল থাকবে—এই যে ভাব এটা মিথ্যার আবেশ, কেননা দেখাতো যাচ্চে যে, ছোট ছিলাম বড় হলাম, আর একে একে সকলে চলে যাচ্চে। এ ঘুমের ঝোঁক জোর করে না ভাঙ্গালে, জ্বালা সইতে সইতে জ্বালার ঘরে গিয়ে পড়্‌তে হবে। এই পালিশ মাথা কেন? সমাজ যাতে ভাল বলে। তোমার এতে ভাল মন্দ যাই ঘটুকনা কেন, তোমায় বহুরূপী সাজতে হবে, তাই ক্রমে ক্রমে ভিতরে ঘুণ ধরে ভিতর ফোঁপরা হয়ে যাচ্চে। বাঃ! কি তামাসা! কি তামাসা! এতে দেশটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বৎসরাবধি ধরে ভীষণ ভীষণ রোগের পালা লেগেই আছে, ধুলপাড় উড়ে ক্রমে ক্রমে শ্মশানে পরিণত হয়ে যাচ্চে, তবুও লোক ঠেকিয়ে বেশ গাঁট ভারী করতে ছাড়িনা! ঐরকম দুদিন চলবে,

তা ভুলেও কখন ভাবিনা। ভবিষ্যৎ ভাবিনা বলেই অল্পে অল্পে বিকার ছড়িয়ে পড়ে কণ্ঠায় কণ্ঠায় হয়ে উঠচে। যা করা যাবে তার সাথে মাথা অর্থাৎ সৎ উদ্দেশ্যের যোগ থাক্‌লে তবেই পাকা গাঁথুনী হবে, নইলে হঠাৎ কোন দিন না কোন দিন ভেঙ্গে পড়বে।

সচেতন—চৈতন্য-পদে অধিষ্ঠানলাভ, অর্থাৎ লড়াই ক'রে স্থিতি লাভ। ইহারই নাম গোলোকে স্থিতি। ইহা সাধনার বস্তু, উহাতে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়, নইলে কেবল ইটপাটকেলের বোঝা বওয়া। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য গোস্বামী প্রথমে মৌখিক জ্ঞান বিচারে ও শিব-শক্তি বলে সকলকে এমন কি কাপালিক-শ্রেষ্ঠ মুণ্ডন মিশ্রকেও পরাস্ত করেন। পরে আত্মদীক্ষা প্রাপ্ত হইলে শ্রীকাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকেদারনাথে সাধনায় প্রবৃত্ত হন। অবিচলিত অধ্যবসায় ও অনুরাগের ফলে অপরোক্ষানুভূতি ইত্যাদি সারগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া চিরশান্তি পদে বিশ্রামলাভ করেন। শ্রীকাশীধাম পরিত্যাগ করিবার কারণই সাধনার স্থান অতি নির্জ্জন হওয়া চাই, গোলমালে গোলে হরিবোল হয়ে যায় "একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মন"—(মনু) "নিঃশব্দ দেশমাস্থায—"(ক্ষুরিকোপনিষৎ) "একাকী যত চিত্তাত্মা"—(গীতা)। আর স্থানও পরিষ্কার, পবিত্র হওয়া চাই "শুচৌ দেশে"—(গীতা)। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এত শিষ্য সত্বেও আড়াইজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। আর মায়াতীত শুকদেব গোস্বামীকেও এই হরিনাম নিতে হয়েছিল। তবেই ভাল করে বুঝলেই বোঝা যায় এটা একটা ছেল খেলা ব্যাপার নয়।

কে তব কান্তা ইত্যাদি—জন্ম জন্ম ও আজীবন ধরে গোপনে এই খেলাই হচ্চে, ইহার অন্ত নেই। আর তোমার পুত্রই বা কে? কেননা মা ভিন্ন বাপের জানবার উপায় নেই, তাই কথায় আছে "মায়ের অগোচর বাপ নেই"। এই হেতু সংসার নাম পেয়েছে, কারণ সার সংয়ের বিচিত্র ভূমি। তাই দত্তাত্রেয়, মনু মহারাজও এবিষয়ের অনেক কথাই বলে গেছেন। হায়! হায়!! এবিষয়টা কেউ ভাল করে বুঝলেনা! বুঝলে না! এটা যে পুতুল খেলা নয়, এটা যে ইন্দ্রিয় সেবা নয়, তার প্রমাণতো স্পষ্টই রয়েছে, যা হতে এই সৃষ্টি রচনা হচ্চে। এর চেয়ে আর বেশী কি হতে পারে? এই গার্হস্থ্যাশ্রম কি করে করতে হয়, পূর্ব্বে সকলে এমন কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র, সান্দীপনী মুনি ও বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে, ঋষিদের কাছে শিক্ষা করতেন। তার ফলে শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা, সকল দিকে চিরশান্তি ও বীর জ্ঞানী বংশধর লাভ হতো, এখন তাহার পরিবর্ত্তে চারিদিকে অন্নকষ্ট, হাহাকার রব ও ব্যাধিগ্রস্ত পুত্রাদি, আমাদের বিরুদ্ধ শক্তি

ও জ্ঞান, বিকৃত মল মূত্রাদি ও বিকৃত অস্থিই ইহার একমাত্র কারণ। এতেও তো কই ঘুম ভাঙ্গেনা। যখন একটা সামান্য ঘাসও সময় বিশেষে প্রাণ বাঁচিয়ে দেয়, আর পেটের জ্বালা থামাতেতো হবে। চাসের ক্ষেতে যদি ৪।৫ রকম সার দিয়ে ঠিক করা হয়, তাতে কি ধান হতে পারে? ধানের মত পাট কসা চাই, ধানের মত সার চাই, তবেই ধান হবে। নইলে উলুবন হয়ে যাবে। সেইজন্যই ঋষি মুনিরা সকল তন্য তন্য করে জ্ঞানবলে বিচার করেই সকল প্রকৃত ভাবের বিধান দিয়ে গেছেন, আর যে সেই ভাব লাভ করতে না পারবে, সে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে হাবু ডুবু খেতে খেতে তলিয়ে যাবে। যে দিন আসল জ্ঞান হবে তখন সকল সত্য বুঝে আনন্দে ফটী-ফাটা হ'য়ে যাবে। সরলতাই সারধন। ভাইরে একবার প্রাণ খুলে সেই দয়াল নাথকে ডাক—সে বড় দয়াল, বড় দয়াল, তাঁর মত দয়াল এ ত্রিজগতে নেই, এ ত্রিজগতে নেই।

মায়াপাশ—ঘৃণা ভয়াদি ভেদে আট প্রকার, ইহাকে অষ্টপাশ বলে। ইহারা সাধকের মন অতিক্ষুদ্র করে রাখে এবং তাকে বিফল মনোরথ করে। তাই কঠোর একাগ্রতা ও অধ্যবসায় চাই তবেই সফল হবার কিছু আশা থাকে। "মমতা ভ্রমতা কি মিটে, উপজে সমতা রস কি জ্ঞান। তব পাওয়ে ঘটমে ভজন, পিছে পদ নির্ব্বাণ"—(উৎঘটানন্দ)। দেহত্যাগ হলেও এই আকর্ষণের হাত হতে নিষ্কৃতি নাই, কর্ম্মের তারতম্যের দরুণ কম বেশী হয়, তাই ফিরে আসতে হয়, তবে কি যে আশ্রয় হবে, তা আমরা জানিনা—সেও সেই কর্ম্মমত; যেমন চুম্বকের টান কোনটাতে বেশী কোনটাতে কম, যেটাতে যেমন শক্তি আছে। তবে শুদ্ধ পজেটিভ ও শুদ্ধ নেগেটিভ একত্র হলে তার টান চলে যায়। সেইরূপ সাধনার দ্বারা ও পরিশুদ্ধ গৃহস্থাশ্রম দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হয়ে গেলে জীবন্মুক্তিলাভ।

মহাধন—আপনার সেই পুরাতন যায়গা। তবে এখন অনেক দিন ভুলে গিয়ে সেটা পৃথক বোধ হতে পারে। সত্যগুরুই সেটা দেখিয়ে দেন, ও তাহার উপায় বলে দেন। তারপর সাধন দ্বারায় সেটা ফিরে পাওয়া চাই। একেই Religion বলে অর্থাৎ ধর্ম্ম—যাকে ধারণ করিলে পুনরায় ঘরে ফিরে যাওয়া যায়। যার কণা নিয়ে এই জগতের এত হামবাড়াই। থলসে মাছের চাল বেশী, রুই ভেটকী ডুবে থাকে। এই মহাধন পেতে গেলেই যে গেরুয়া চাই, সেটা ভুল, কেবলা ভাবের ঘরে চুরি থাকলে সবই মিটে—"সর্ব্বাণ্যেতানি বৈ মিথ্যা যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ"—গৌতমীয় সংহিতা।

গুরু—যিনি সেই পরাৎপর আনন্দঘন পুরুষকে দেখিয়ে দেন—"তৎপদং

দর্শিতং যেন" তিনি গুরু। আমরা মনে করি, গুরু আবার কি করবেন? এইতো আমরা আফিসে বড় বড় নোটড্রাফট লিখছি, ৪০০।৫০০ টাকার চাকরি করচি, এম এ পরীক্ষায় গোল্ড মেডেল পেয়েছি, বক্তৃতায় ত্রিভুবন কাঁপাচ্চি, সবই করবি, আর একটা [illegible]গোবও লোকে আমায় কি শিখাবে, কি বুঝাবে! সবই সত্য কিন্তু এটা কিছু গুরুতর, এখানে অর্থকরী বিদ্যা খাটেনা, যেমন রোঝার কাছে ডাক্তার জারিজুরী খাটেনা। তাই যদি না হবে, তবে রিস ডেভিসের মত লোক — যিনি [illegible] চীফ কমিশনার ছিলেন, কর্ম্মত্যাগ করে গায়ত্রী মন্ত্র [illegible] কেন? এ বাবা শক্ত ঘানির ঠেলা! কখন যে কার [illegible] নেই। তবে গুরুকে শিষ্য যদি অন্তরের সহিত আরাধনা করেন তবেই হাতে হাতেই বাজারের কেনা বেচা শেষ হয়, নৈলে একবার জুয়ার—একবার [illegible] শেষ [illegible] কুপোকাৎ। কিন্তু একটা কথা আছে—কর্ম্ম-ত্যাগ শুনেই [illegible], সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কেবল ভেক গেরুয়া ধর। তা নয়, তা নয়—তা যদি হত, পরমহংসদেব রামকৃষ্ণও পরতেন। যেমন যেমন ক্লাস ডিঙ্গবে, পুরাতন বই গুলা আপনই ছেড়ে যাবে—"ন কর্ম্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্ম্ম ভিস্ত্যজ্যতেহসৌ"—আগম। ইহাই যথার্থ মেডেল। "মোহাদস্য পরিত্যাগ স্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"—গীতা। অন্তরে ভোগ ইচ্ছা সত্ত্বে, লোক দেখান ত্যাগকে তামস—মিথ্যাচার বলে।

মহামন্ত্র—হরিনাম অর্থাৎ গায়ত্রী জপ। আসল হরিনাম মুখে হয় না, উহা আপ-নিই হচ্চে। তাহা মুখ দিয়ে করতে নিষেধ করা আছে "অকণ্ঠৌষ্ঠ অলুমনাসিকঞ্চ উভয়োষ্ঠ বর্জ্জিতম'—ব্রহ্মবিন্দ। তবে যতক্ষণ আসল ঠিকানা না পাওয়া যায়, গৌণও ভাল, কেননা "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল", এই নমুনা থাকলে একদিন না একদিন, তাঁর তরে প্রাণ কেঁদে উঠতে পারে, আরও সকল শব্দেরই এক একটা শক্তি আছে, তার লয় মান ঠিক ঠিক হলেই স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। ইহারই প্রকৃতভাব জানাবার জন্যই, ঋষিরা পূজার সময় শঙ্খ ঘণ্টাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা করে গেছেন। তাই বলে যে এটা হেয় হবে, এ কখন হতে পারে না, কেননা যিনি সূক্ষ্ম তিনি স্থূলেও বিকাশ হয়ে পূর্ণানন্দ বিতরণ করেন,— "যথা বাহ্যান্তথা মধ্যে" "স্থূলরূপী স্থিতোয়ঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ অন্যথাস্থিতঃ"—জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র। এইরূপ সকল কার্য্যের এত সুন্দর ব্যবস্থা আছে, যিনি প্রকৃত হতে পেরেছেন তিনিই ডুবে গেছেন। আর আমাদের মর্ত্তে এক এক মহাতর্ক-বাগীশের বিচার ছটায় সবই ক্রমশঃ গুটিয়ে এসে এক কোণে ঠেকেছে। এই

পূর্ণারত্রিক পূজা মায়ের নাটমন্দির থেকে আরম্ভ ক'রে মন্দির অবধি "উর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণম্ মধ্যপূর্ণম হরিনাম সুমধুবম্" "তির্য্যগূর্দ্ধমধঃপূর্ণম্ সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং" শঙ্করাচার্য্য। বেশ সামঞ্জস্যভাবে তাঁরা আসল ব্যাপারগুলা কর্ম্মকাণ্ডে প্রকাশ করে গেছেন। কিন্তু এখন হয়েছে অর্থ বুঝেই সর্ব্বজ্ঞ হয়ে পড়া, তাই দেবদেবীও সরে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তবে যখন কণ্ঠায় কণ্ঠাগ্র হবে পড়ে তখনই তাঁরা আবির্ভাব হয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। এই হরিনাম পাবার জন্য কোন গোঁসাই এক সময় মক্কায় বিবির কাছে প্রেরিত হন। সকলই ঠিক আছে, তবে বুদ্ধির দোষে লুকিয়ে পড়েছে, ও আমাদের ভাবগতিক দেখে শুনে ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাঁরা গুপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা নকল চান্না, তারা আসল হতে বলছেন;—কেননা আসলে বাদ বিসম্বাদ নেই, ঈর্ষা নেই, কেবল আনন্দই আনন্দ।

মন্দির—Know ye not that ye are the Temple of God.—Bib. এই শরীররূপ মন্দির থাকতে আবার মন্দির কেন? না নিজের প্রতি যত্ন আছে, না দেবালয়ের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, কেবল একটা লোক দেখান পূজা পাঠ. হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শমন ভবন—এখান হতে যাওয়া আর কতশত জায়গা ঘুরে ঘুরে আবার মানবকুলে ভাল ঘরে জন্মান। ইহারই পরীক্ষা শেষ সময়ে হয়, তখন জীবনের সকল গুপ্তচিত্র দেখা দিতে থাকে। একতো মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা, রোগের যন্ত্রণা, তার উপর আবার সেই বিচিত্রলীলার অভিনয় হতে হতেই কায়া ত্যাগ হয়ে সেই অবস্থা লাভ হয় "যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিত"—গীতা। তাই সাধনার এত মাহাত্ম্য। কে এই শমনের খেলা হটাতে পারে—সেই একমাত্র দয়াল ছাড়া। যম অর্থাৎ স্থির বায়ু—যার অধিকারে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল রয়েছে—"ত্বমেব বায়বী শক্তি" আর গুপ্তচিত্রই চিত্রগুপ্ত। ভাইরে এ হাসি ঠাট্টা নয়, এ হাসি ঠাট্টা নয়। দু'চার কথা মুখস্থ করে বা শুনে, লেকচার দিলে হয় না, লেকচার দিলে হয় না। নিজের কাজ সারা চাই, নিজের কাজ সারা চাই।

মহানন্দ—যখন অমৃত ক্ষরণ হ'তে থাকে তখনই শেষ হয়। আমরা দেখি, পূজা করে চরণামৃত খাই, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে জল দিয়ে নিবিয়ে আসি। এও ঠিক তাই, যখন চতুর্দ্দশ ভুবন পার হয়ে যেতে পারা যাবে, তখনই সত্য মিথ্যা বুঝা যাবে। তাই আমাদের শ্রাদ্ধ শেষ সময়ে একটা মহামন্ত্র পড়ে—"মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।" তাই রামপ্রসাদ সেনও গেয়ে-

ছিলেন। "আমার জ্ঞান ভাটীতে চুয়ায় সুরা পান করে মদ মন মাতালে।" আর দেওয়ান হাফেজও বলেন, "তোমার নমাজের আসন সুরার সিক্ত হইলে তোমার ভাল হইবে।" এই আসন কোথায়?—বিল্বদলোপরি কাবাপীঠ। এই হেতু বৈশাখ মাসে ঝার বারিবার বিধি আছে, বৈশাখ কি?—শাখা অর্থাৎ গুণাতীত অবস্থা। নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন গীতা"।

'ভ্রূমধ্যে ডুবিলে [illegible] তারা
হৃদয় গগনে [illegible],
সহস্রার চ্যুত অমৃত [illegible],
পানে মাতো [illegible]।"—যোগ সংগীত।
'And he fed thee with manna—বাইবেল।

এই চতুর্দ্দশ ভুবন পার হওয়া মুখের কথা নয়! একতো ভাগ্য চাই, অর্থাৎ যেমন কর্ম্ম সেই মত লাভ, তবে ভাবে আবার মনের আগ্রহ চাই, পরে যোগীশ্বর মহাদেবের সাথে লড়াই, (এই লড়াই ও অন্য লড়াইএর কথা গীতায় বলেছেন), যিনি অমূল্যরতন, পাছে চোরে চুরি করে বলে দ্বারে দ্বারী হ'য়ে রয়েছেন। তাই শক্তিমান গুরু ও শক্তিমান শিষ্য চাই—"আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি"—ছান্দোগ্য। "ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্রু সমুদ্ভবা"—শিবসংহিতা। তবেই আলো মিটবে, নইলে কাজ এগিয়ে থাকবে। তবে মানুষ হলেই যে হরিনাম পাবে সে তা কই দেখা যায় না। কত জন্মের পর যে ফিরে হরিনাম পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই, কেননা যা চাওয়া যাবে তাই পাওয়া যাবে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"—গীতা। তাই তীব্রতার সহিত কাজ সেরে নেওয়া চাই, তাই পাতঞ্জলে আছে "তীব্র বেগাৎ আসন্ন।" এরই প্রধান মাহাত্ম্যবলে ব্রাহ্মণেরা যখন অন্ন খেতে বসেন, তখন হাতে জলগণ্ডুষ নিয়ে সেই পবিত্র পুরুষকে স্মরণ করেন ও উঠিবার সময় তাবৎ মন্ত্রে ধারণ করেন, এখন হয়েছে গণ্ডুষের জল গলা ভিজাবার জন্য। যখন ঘড়া বসে ভরে উপচে পড়তে থাকে, তখন তার এক আশ্চর্য্য হাবভাব হয়, তার কতক স্ফুরণ দেখাবার জন্যই এই পুরুষ প্রকৃতির সৃষ্টি। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ নিতাইচাঁদের-সাথে সেই লীলাই অতি সংগোপনে করতেন। এই অবস্থার নাম ভক্তি, অর্থাৎ যাহাকে চলিত কথায় ভর-নামা বলে। অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা ভেদে দুই প্রকার। এই দুইই এক এবং একই দুই, কেননা দুই না হ'লে ভোগ করে কে? যখন দুই একত্রে এক হ'য়ে গেল, তখনই পূর্ণ হ'লো,

কিন্তু অন্তরঙ্গার বিচ্ছেদ বিরহ নাই, বহিরঙ্গার আছে, তবে যিনি উভয়ই রক্ষা করতে সমর্থ তিনিই পূর্ণাত্মা। এই অন্তরঙ্গার শুভদৃষ্টিই বিবাহের সময় হয়ে থাকে, তখন একটা সাদা কাপড় ঢেকে দিবার বিধি আছে, ও সেই সময় যাতে কেউ না মন্দ চিন্তা করে তার বিশেষ নিয়ম আছে, কেননা সেই সময় যে সকল শক্তি কার্য্যকরী হয়, তাহারই প্রাধান্য জীবনে হয়ে পড়ে, তাই বিশেষ সতর্কতা। এখন একটা ছেলে খেলার সাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ক'রে সবই গেছে আর যাচ্চে। সকল গূঢ় ভাবগুলি এত সরল সকলে প্রকাশ করা কাহারও সাধ্য হয়নি, কেননা এতো আর মুখস্থর জিনিস নয়, কেবল বক বক করে বকে গেলেই হ'লো; তাঁরা খেটেছিলেন, তন্ন তন্ন ক'রে বিচার করে ঠিক ঠিক প্রকাশ করে গেছেন। এখন টোল পাশ করলেই বেদান্তবাগীশ উপাধি সহজে যোগাড় হয়ে যায়, কে আর অনাহার অনিদ্রায় পাগলের মত 'মা মা' বলে চীৎকার করবে বল? এখনকার লোকগুলাতো আর তাদের মত বোকা নয় যে, হাতের ফূর্ত্তি ছেড়ে দিয়ে পাগলামি করবে। এ সকল বলাতে হয় কি, বুজরুকেরা লোক ঠাগিয়ে নিজেদের জাহির করবার বেশ বন্দোবস্ত করে নেয়। তাই এই দুর্দ্দশা এসে উপস্থিত হয়েছে।

সকল কর্ম্ম ইত্যাদি—যতক্ষণ না আসল অবস্থালাভ হচ্চে ততক্ষণ আপনার ভরণপোষণের উপায় করা চাই, ও সঙ্গে সঙ্গে সাধনা দরকার। এই রকম করতে করতে সেই পর পর লাভ হ'তে থাকবে, আপনা হতেই সব গুড়িয়ে আসবে। তাই কর্ম্মই গুরু বলে বর্ণনা করা আছে "কর্ম্মৈব পরমোগুরু" আর বিশেষ ক্ষেত্র হ'লে কর্ম্মই শরীর ধারণ করে, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেন। তাই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে "সাধকানাং হিতার্থায় মূর্ত্তি কল্পনা",—সাধকের হিতের জন্য শ্রীভগবান নিজে ব্রজপথে এসে পথ দেখাতে থাকেন। তখন সকল সন্দেহ দূর হয়ে যায়, একেই সরলতা বা ভাব বলে। এই বিশেষ ক্ষেত্র শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেবের ছিল বলে, তিনি কাহারও নিকট হ'তে মনের চিরশান্তির উপায় না পেয়ে, শেষে একগোঁ করে বুদ্ধগয়ায় বোধিসত্ব বৃক্ষতলে আসন ধ্যানের সাহায্যে একরাত্রে চারিপদ অতিক্রম করে পূর্ণানন্দে স্থিতিলাভ করেন। "প্রবিবেক রসং পীত্বা রসং উপশমস্যচ। নির্দ্দরঃ স্যাৎ চ নিষ্পাপো ধর্ম্মপ্রীতিরসং পীবন্"—শ্রীবুদ্ধদেব—সেই অমৃত পুরুষকে যিনি ধারণ করতে পেরেছেন তিনি চিরদুঃখের খাতা পুড়িয়ে দিয়েছেন; তার তখন মমতাও নেই, দয়াও নেই; সে এক কিছুত কিমাকার হয়ে গেছে। "নির্ভয়ো নিরহঙ্কারঃ সঃ শান্তির অধি-

গচ্ছতি"—গীতা। কিন্তু গৌরাঙ্গপ্রভু সে বেগ ধারণ করতে না পেয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তেন; তিনি মাধবাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত হন। এই চারিপদের তিনটী বন্ধন যখন সন্তানাদি জন্মায় তখন দেখা যায়। উহার গলদেশে একটী—উহাকে কণ্ঠগ্রন্থী বা জিহ্বাগ্রন্থী বলে, হৃদয়ে একটী—উহাকে হৃদয় গ্রন্থী, ও কোমরে একটী—উহাকে মূলাধার গ্রন্থী বলে। এই তিন গ্রন্থী ভেদ করিবার ভিন্ন ভিন্ন সাধনা আছে ও চতুর্থ অতীব দুর্গম। সুকৃতি ফলে শক্তিমান পুরুষ বা নারী না হইলে এই মায়ার বেড়ী কাটা বড়ই দুঃসাধ্য। পরমহংসদেবও ইহাকে দুঃসাধ্য ঊর্দ্ধমুখ তন্ত্রসাধনা বলে গেছেন, কেননা তিনি দ্বাদশবৎসরকাল কত কঠোর পরিশ্রমে সেই যোগিনী মাইজীর নিকট শিক্ষা করেছিলেন। মাইজী ছাড়া কে তাঁর ক্ষুধা মিটাতে পেরেছিলো? এই দুরবস্থার সময় স্বকর্ম্মী স্ত্রীপুত্রাদি বা শ্রদ্ধাবান শিষ্য কাছে না থাকলে কষ্ট হবার সম্ভাবনা। তাই ঋষি মুনিদের সুখের সংসার ছিল। তাঁরা আমাদের মত ফিচেল বদমায়েস ছিলেন না। তাই নিমাই নিতাইকে গোদাবরী থেকে ফিরে গিয়ে সংসার করতে বলেন। আমরা সবাই অন্ধ, তাই নিজেদের বুদ্ধিবলে ধরাকে সরা দেখছি। শ্রীবুদ্ধদেবকে ভগবান বলবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার হাতে শঙ্খচক্রধ্বজাদি শক্তিচিহ্ন প্রকাশ ছিল, যাহার দ্বারা তিনি একরূপ স্বয়ংই সিদ্ধিলাভ করেন। "জহুরী জহরত চেনে, অন্য লোকে খান ভানে।" এই অন্তরস্থ ত্রিসন্ধির স্থান হতে ত্রিসন্ধ্যার ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রীভগবান যে পথ দেখাতে থাকেন উপনিষধও বলে গেছেন "তেজেযত্তে রূপং কল্যাণ তমস্ততে পশ্যামি যোসা বসৌ পুরুষ সোহমস্মি"—বাজসনেয় উপনিষৎ। কারণ-বারির অন্তর্গত কালিদহ পার হইলে উত্তম পুরুষের দর্শন হয়। "অতো ধর্ম্মানুধারায়"—ঋগ্বেদ। এইহেতু অন্তরঙ্গ ধর্ম্মের প্রয়োজন। এই কারণ বারি নারায়ণ শিলায় যজ্ঞোপবীত স্বরূপে বর্ত্তমান, কালিদহ ঐ শিলার অন্তর্গত ব্রহ্ম গুহা "And darkness was upon the face of the deep"—Genesis, এই জন্যই নারায়ণের স্তবে আছে "ধ্যেয় নারায়ণ সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী"; God made two great lights: the greater light to rule the day, the lesser light to rule the night"—Bib। প্রকৃত বস্তু অধিগত না হলে সকল বোঝা কঠিন। আর যিনি আসল চান তিনি কাহারও ধার করা বিদ্যা লয়েন না; সাধনার দ্বারা লাভ করেন, কারণ অন্তরের আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়, মনে করা যায় এইতো সবই বুঝে ফেলেছি। এটা মুখস্থ বুঝবার নয়

ঝাপট্ উঠ্‌বার পূর্ব্বে নিজের পাড়ী জমাবার বিষয় ; আর এ বিষয়ের বেদাদি পুস্তকগুলা সাধক সহচর, যাহা কর্ম্মীকে কর্ম্মপথে সাহায্য করে, যাহাতে তাহার সন্দেহ দূর হ'য়ে মনে বড়ই আগ্রহ বৃদ্ধি হয়। ঐ ব্রহ্মগুহাই কাশীর জ্ঞানবাপিকুণ্ড, আর উত্তমপুরুষই পাণ্ডা। এই পাণ্ডা থেকে নকল পাণ্ডা তীর্থাদিতে দেখা যায়।

শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী।

—•:•:•—

গুরু-পদ ভরসা।

(১)

ঘোরা গভীরা যামিনী—
একদা হেরিনু স্বপনে।
মানস দর্পণে মূরতি,
মম প্রভু সম আকৃতি,
আধ ঘুমঘোরাবৃত—
নিদ্রা বিজড়িত নয়নে॥

(২)

তখন ভাঙেনি ঘুম—
শয্যায় ছিনু গো শায়িত।
কে যেন বলে দিল এসে,
প্রভুর উদয় আবাসে
আমারি, দীন কুটীরে—
আমারি প্রভু চির-বাঞ্ছিত॥

(৩)

তন্দ্রালস নয়নে—
উঠিয়া চাহিনু যেমনি।
বিফল বাসনা সকলি,
হেরিনু আঁধার কেবলি,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর—
হতাশে কাঁদিনু অমনি॥

(৪)

আমি কাঁদিয়া কাটা'নু—

সারা রাতি গো ভাবিয়া।

যদি হে কৃপা করে এলে,

তবে কেন ছলিয়া গেলে,

কি দোষ করেছি পদে—

কিছু পাইনাত খুঁজিয়া॥

(৫)

তুমি মম ইষ্ট মন্ত্র—

আমি যতদিন বাঁচিব।

মম "গুরু-পদ" ভরসা

"রাম-কৃষ্ণ" নাম ভরসা

অন্য দেবতা জানিনা—

প্রভু তোমাকেই পুজিব॥

(৬)

ইহকাল, পরকাল—

তুমি মম আশা ভরসা।

সতত নশ্বর জীবনে,

যেন "গুরু-পদ" ধেয়ানে,

তনু মম হয় লয়—

ভেঙ্গে যায় সংসার-বাসা॥

সেবক—শ্রীমনোহরচন্দ্র বসু।

—•:০:•—

মানব জীবনের কর্ত্তব্য।

অনন্ত অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজনকারী পরমেশ্বর পরমপুরুষ তদ্‌সৃষ্ট সর্ব্ব জীবকেই একটী মাত্র রজ্জুতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং নিয়তই সেই সকল জীবকে লইয়া অনন্তকালের জন্য ক্রীড়ায় মগ্ন হইয়া আছেন। সেই সকল বদ্ধজীব তাঁহার শক্তি ব্যতীত সে পাশ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়না সত্য; কিন্তু সেই পাশ হইতে মুক্তি হইবার উপায় প্রত্যেক মনুষ্য হৃদয়েই বিবেক

বুদ্ধি দ্বারা প্রণিধান শক্তিও প্রদান করিয়াছেন। যিনি তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করেন অর্থাৎ সেই পাশ মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহাকেই তিনি আপনার শক্তি বিশেষ প্রদান করিয়া থাকেন। আর সেই মহাত্মাও এ মহিমণ্ডলে আপনার প্রাধান্য সংস্থাপনে কৃতার্থতা লাভ করেন। সেই ভগবদ্দত্ত শক্তি লাভের উপায় দ্বিবিধ। একটী সংসার আশ্রম এবং অপরটী সন্ন্যাসাশ্রম। আমরা সংসারী জীব, সংসারের কথাই বলিতেছি।

রাজর্ষি জনক সংসারাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সদৃশ আরও কত শত মহাত্মাই যে সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ প্রণিধান করিয়া গিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সংসারে থাকিয়া ভগবচ্চিন্তা বা ভগবদুপাসনা করিতে হইলে.. সকল দিক বজায় রাখিয়া অতি সঙ্গোপনে নিয়ম প্রাণায়ামাদি করিতে হয়। কাম-কাঞ্চনের মায়া, অপত্যস্নেহ হইতে আত্মাকে দূরে লইয়া গিয়া নির্লিপ্তভাবে ঈশ্বরোপাসনা করাই প্রকৃত মানবের কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা যে কত দূর কঠোর ভাবিলেও তাহার ভাব পাইবার অবসর নাই; আবার যে ভাবে, সেই সে ভাবের—ভাবুক বুঝিবে যে, কেবলমাত্র ভগবানের কার্য্য ব্যতীত আর কোন কার্য্যই সে করে না। তখন বুঝিবে যে, সে কি ভাব, কিরূপ সাধন। তখন সে আরও বুঝিবে যে, ভগবান সচরাচরকে কি প্রকারে পরিচালন করিতেছেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান পুরুষপুঙ্গব কি প্রণালীতে সুখ দুঃখের অবতারণ করিয়াছেন। নচেৎ সংসার অসার ভাবিয়া যিনি তাঁহাকে বা তাঁহার কার্য্যকে মন্দ ভাবিতেছেন, তিনি সদাই নিরানন্দ ব্যতীত আনন্দ কোথায় পাইবেন? তাই বলিতেছি, কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া ঈশ্বরের কার্য্যানুষ্ঠানই মানবের জীবনব্যাপী কর্ত্তব্য।

ঠাকুর স্বয়ং একস্থানে বলিয়াছেন যে—"সংসারে থাকিয়া ভগবানকে পাইবার যে সুযোগ তা আর কোথাও নাই। কিন্তু সংসারে থাকিতে জানা চাই। সংসারে থাক মাছের মত হ'য়ে, অর্থাৎ মাছ জলে থাকে, তার গায়ে যেমন জল লাগিতে পারে না, সেই রকমে তুমিও সংসারে থাক।" ভগবানের এই বাক্য প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে অতি ধ্রুব সত্য। ইহার প্রমাণ পুরাকালে রাজর্ষি সীরধ্বজ এবং বর্ত্তমানে মাহাত্মা স্বর্গীয় "রামচন্দ্র" "কেশবচন্দ্র" ও শ্রীল শ্রীযুক্ত "পাগল হরনাথ" প্রভৃতি খুঁজিলে কত শত জন পাওয়া যায়।

তাই বলি, সংসার সমুদ্রে কাঞ্চন এবং কামিনীর আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মন যেন সেই সর্ব্বশক্তিমানের শ্রীচরণে থাকে,

তাহা হইলেই ঐশীশক্তি প্রভাবে ষড়রিপুগণ, হাঙ্গর ও কুম্ভীরাদিতে আমাদের কোন অনিষ্টসাধন করিতে সক্ষম হইবেনা। পরন্তু তাহারাই পরস্পর আপনাপন কর্ত্তব্যকার্য্য করিবে অর্থাৎ কামের কার্য্য ঐশীকাম হইবে এবং ক্রোধ তখন বিনয় নামে প্রবর্ত্তিত হইবে এবং লোভ তখন ক্ষোভে পরিণত হইয়া—কেন কর্ত্তব্য কার্য্যে বিরত হও, চেতন হইয়া অচৈতন্যকে দূর কর এবং সচ্চিদানন্দ পদান্বেষণ কর,—বলিয়া আমাদের বৈরাগ্যের উৎপাদন করিবে; তাই বলিতেছি—হে পরম কারুণিক-পরমেশ্বর আমাদিগকে সংসার সমুদ্রে মীন করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালনের শক্তি দাও প্রভো।

সংসার অতি ভয়ঙ্কর স্থান। এখানে বাহ্য জ্যোতিরূপ মায়ার পূর্ণবিকাশ পত্নীপ্রেম; আত্মজের আকাঙ্ক্ষা পূরিত স্নেহ বা মায়ার বন্ধন এবং মাৎসর্য্যাহঙ্কারে সদাই আচ্ছন্ন থাকিয়াও ভগবদুপাসনা দ্বারা আত্মোন্নতি করিতে হয়, বলিয়াই আবার চতুরাশ্রম মধ্যে সংসারাশ্রম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এই আশ্রমে থাকিয়া ভগবদ-প্রেমার্জ্জনের চারিটী স্তর বিভাগ করা যাইতে পারে। এবং সকলগুলিই ঐশী মহিমায় প্রতিভাসিত হইয়া রহিয়াছে।

প্রথম স্তরে বাল্য জীবনের কর্ত্তব্য। পূজ্যপদ মাতৃপিতৃ পাদপদ্ম সভক্তিতে পূজা করাই এই স্তরের প্রধান কার্য্য, অর্থাৎ অনুক্ষণ অক্ষুণ্ণভাবে তাঁহাদের জীবিতাবস্থায় তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করাই একান্ত কর্ত্তব্য। শৈশবে মাতা পিতৃ প্রতি আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা না থাকিলে পরে ঈশ্বরানুরাগ কি প্রকারে প্রকটিত হইবে? মাতা পিতা যে সন্তানের কিরূপ আরাধ্য তাহা মম সদৃশ ব্যক্তি প্রায় কি বুঝাইবে? শাস্ত্রে বলে—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা॥
পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণ পোষণাৎ।
অতোহি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমোগুরুঃ॥"

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, মাতা পিতা কিরূপ বস্তু। আজীবন মাতাপিতার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেও তাঁহাদিগের পূজা করিয়া তৃপ্তিসাধন হইবে না।

দ্বিতীয় স্তরে পাঠ্য জীবন। এই স্তরে গুরুভক্তিতে প্রবুক্ত থাকিয়া এবং সহাধ্যায়ীসহ মিলিত হইয়া পরস্পর প্রেমে সখ্যতা স্থাপন করিয়া, সখ্যভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতেই ক্রমশঃ ভগবানের প্রতিও সখ্যতা স্থাপনায় প্রকৃষ্ট

উপায় বলিতে হইবে। এবম্প্রকার অবস্থায় না উপনীত হইলে, সখ্যভাব কি প্রকার তাহা উপলব্ধি করা যাইত না, সুতরাং ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য যে সখ্যভাব গ্রহণ করিবার পক্ষে এই স্তরের একান্তই আবশ্যক।

তৃতীয় স্তর ইহারই পরবর্ত্তী। ইহারই পর মানব কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ভগবানের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। এই স্তরের কর্ত্তব্য কি? ভাবিয়া দেখিলেই অনেক কর্ত্তব্য, স্থিরাকৃত করিতে পারা যাইবে। প্রথমে শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যক, কেন না, সেই পরিশ্রমের মূল্য ভগবান প্রদান করিয়া থাকেন। পরন্তু সংসার প্রতিপালন, স্ত্রীর ভরণপোষণ, সন্তানের লালন ও পালন, ইহা তো প্রত্যেক মানবই স্বীকার করিবে, অধিকন্তু দরিদ্রনারায়ণের সেবা, অতিথি সৎকার প্রভৃতি নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যের সীমা নাই। এই সমুদয় সুসম্পন্ন-পূর্ব্বক ভগবানের উপাসনা করাই এই স্তরের প্রধান কার্য্য, কেননা সেই সর্ব্বশক্তিমানের শ্রীচরণ চিন্তা ব্যতীত মানব জীবনের আর কি কোনও কর্ত্তব্য কার্য্য থাকিতে পারে?

শেষ চতুর্থস্তর,—চরমাবস্থা অর্থাৎ স্থবিরকালে উপনীত হইয়া বিধিপূর্ব্বক নিয়ম পালন করাই উদ্দেশ্য, এবং ঐকান্তিক মনে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের চরণে মনকে লীন করিয়া শেষের কর্ত্তব্য পালনই মহাকার্য্য। এই সমস্ত কর্ত্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলেই অনন্তকালের জন্য নিরয়-নীরধি-নিমগ্ন হইয়া শেষজীবনে প্রত্যবায় ভোগ করিয়া শান্তিহীন হইয়া পরমেশ্বরের শ্রীচরণ হইতে কি পতিত হইতে হইবে না? অথবা নিজ নিজ কর্ত্তব্য চ্যুতির জন্য কি একবারও মন আলোড়িত হইয়া উঠিবে না? কিম্বা নিজ নিজ দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতেই হইবে, এ ভাব কি তখন আসিবে না?

তাই বলি হে ভগবান্। আমাকে আমার কর্ত্তব্যচ্যুত করিয়া শেষে অনু-তাপানলে দগ্ধীভূত করিও না। হে দয়াময়। এই দানের শেষ সময় তোমার মহিমা গুণে কৃতার্থ করিও। এবং বাসনা পরিপূরণ করিয়া আমার কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত করিয়া শান্তিপ্রদান করিও। যেন সংসারকূপে থাকিয়া সংসারের মায়ায় তোমার জ্ঞানময় জ্যোতিঃ না হারাই। তাই আবার আরও বলি, হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর, যদিই বা মানবাকারে এই মায়াবারি পরিপূর্ণ সংসার মহানীরধির অগাধ জলে নিমজ্জন করিয়াছ; যেন ঐ প্রকারে আমার মর্ম্মরূপ সরোবরহিত জ্ঞানপথ হইতে তোমার শ্রীচরণ অপসরণ করিওনা। মানবজাতিকে তোমার কার্য্য করিবার শক্তি দাও প্রভো! তোমার দয়া ব্যতীত

কিরূপে মায়ায় আবদ্ধ জীব তোমার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে? চরমপন্থী সংসারত্যাগী মহাযোগী পুরুষও যখন তোমার স্বরূপতত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ, তখন আমরা সংসারে বদ্ধজীব কিরূপে তোমার কার্য্য প্রতিপালন করিব?

তাই আবার বলি, আমাদিগকে তোমার কার্য্য পালনের যেমন ভারার্পণ করিয়াছ, তেমনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে, কি প্রকারের কার্য্য আমাদিগের কর্ত্তব্য। হে দয়াময় রামকৃষ্ণ! আমাদের কার্য্য কিছুই নাই, তবে যা করি, তা কেবলমাত্র তোমারই কার্য্য করি, যা করিব তাও তুমি করিয়া রাখিয়াছ, আমরা কেবল নিমিত্তের ভাগী। তোমার কার্য্য,—তোমার রামকৃষ্ণ নামের মহিমাগুণ কীর্ত্তন করাই মানব জীবনের কর্ত্তব্য!

সেবক—শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—:০:—

সাধু নবগোপাল।

জনম কায়স্থকুলে প্রেমিক প্রবীণ,
হে মানব, দেখেছ কি শ্রীনবগোপালে।
নন্দন নন্দিনী জায়া লয়ে নিশিদিন,
রামকৃষ্ণনাম গাহি ভাসে আঁখি জলে॥
পল্লীবালবালা যা'রে হেরিলে নয়নে,
'রামকৃষ্ণ' বলি নাচে গাহে উভরায়।
শিশুভাবে ভক্তবর মিলি শিশুসনে,
পথে ঘাটে রামকৃষ্ণ নাম গাহি যায়॥
জীব-নদে রামকৃষ্ণ ধ্রুবতারা যা'র,
সরল, বিশ্বাসী হেন ভবে অতুলন।
রামকৃষ্ণ ভক্ত তা'র চির আপনার,
সার মাত্র ভবে যা'র শ্রীগুরু চরণ॥
সংসারীর সাজে হেন ভক্ত পরিবার।
দেবতার বাঞ্ছনীয় অঙ্গে কণ্ঠা কা'র॥

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংগীত।

দীনবসনে দীন ভূষণে,
দীনমঙ্গল চিন্তন।
অবতীর্ণ হয়ে জগতের কোলে,
সমন্বয়-ধর্ম্ম ভবে প্রচারিলে,
বাদ বিসম্বাদ সকলি মিটালে,
শান্তিময় হ'ল ভুবন। ১।

মরমে মরমে ভগবান তব—
ব্যথা সহিলে ব্যাকুল অন্তরে,
ব্যাকুলতা শিক্ষা প্রদানিলে নরে,
(ধন্য) মাতৃহারা-শিশু ক্রন্দন। ২।

বেদবিধি যার সন্ধি নাহি পায়,
হেন সত্য সব সরল কথায়—
বুঝাইলে দেব জানি নিরুপায়,
শুদ্ধাভক্তি করি সাধন। ৩।

জাতি কুল ধর্ম্ম নাহি বিচারিলে,
আচণ্ডালে ভবে প্রেম বিতরিলে,
স্বদেশী বিদেশী সবে আলিঙ্গিলে,
করিলে একতা স্থাপন। ৪।

ভাষা নাহি মম তব গুণ গানে,
পাসরি সকলি হেরি মুখপানে,
প্রসাদ দেব, শুদ্ধাভক্তি দানে,
ভুলায়ে কামিনীকাঞ্চন।

আর এক ভিক্ষা আছে গো আমার,
'রামকৃষ্ণ' নামে ঘুচুক আঁধার,
'রামকৃষ্ণ' নামে মাতুক সংসার,
লভিয়া নবীন জীবন। ৬।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন।

—০:০—

যাচ্ঞা।

(১)

কোথা আছ মোর প্রভু!

আমি তোমার করুণা-আশে গল-লগ্নী-কৃত-বাসে,
আছি তোমার ধেয়ানে তোমার পূজনে,

দেখা দাও দীনে বিভু!

(২)

পড়িয়ে সংসার-কূপে,

মোর আলোর নাহিক পন্থা, বিশ্ব-মঙ্গল-নিয়ন্তা,
আমি [illegible] দিকেতে চাই পথ নাহি পাই,

অন্ধকার স্তূপে স্তূপে!

(৩)

ভয়ে কাঁপে তাই প্রাণ ;
"হায়, কোথা পিতা কোথা মাতা, দারা, সুতাসুত ভ্রাতা,"
বলে' উচ্চে ডাকি যত ডুবে যাই তত,
কে যেন দিতেছে টান !

(৪)

নিরুপায় হায় এবে,—
মোর বিপদগ্রস্ত প্রাণ সঙ্কট কর ত্রাণ—
বিনা তব করুণায় অন্য গতি নাই
বেশ বুঝিয়াছি ভেবে।

(৫)

জানি তুমি দীন-বন্ধু।
দেখ দীন আমি, কোথা বন্ধু ! দেহ দয়া এক বিন্দু ;
জানি নিকটে তোমার অতল, অপার
করুণার মহাসিন্ধু।

(৬)

আঁধার কাটিয়া যাক ;
মোর মায়ার পুতলী যত, মাতা পিতা দারা সুত,
আমি তোমার চরণ করিনু শরণ
তারা দূরে পড়ে' থাক।

(৭)

কূপ হ'তে গিয়ে দূরে,
তব পবিত্র মন্দিরে পশি হেরিয়ে নিযুত-শশী,
যেন সারা-জনমের, সারা-জীবনের
অন্ধকার যায় স'রে।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।

—•:•—

সুন্দর।

(১)

যোগাসনে নাথ! স্তিমিত নয়ন
বিশ্ব মাঝারে বিশ্ব ভুলি,
ধরিয়া রেখেছে "সমাধিস্থ ছবি"
শিষ্য-সৌভাগ্যের মধুর তুলি।

(২)

অন্তরে বাহিরে হেরিব তোমায়
সুধীর সুপ্রেমি হৃদয়নিধি,
অশ্রুজলে জলে ধুয়ে গেছে কত
সিংহাসন কর এ মম হৃদি।

(৩)

হৃদিপদ্মাসনে "চিন্ময় সুন্দরে"
তুলিয়া রতন হইব স্থির,
যদি অভ্যাসেতে ঝরে ত ঝরিবে
আনন্দ প্রেমের নয়ন নীর।

(৪)

উল্লাসে উথলি মর্ম্ম-মন্দাকিনী
ভাসাবে মধুর হৃদিপদ্মাসন,
সাজিবে মধুর চিন্ময় মূরতি
রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম মধুর মোহন।

(৫)

লীলার কারণ মুট জীব পায়
মায়া ভরা দুটি আঁখি,
সংসারের লীলা সাঙ্গ রুচি নাই
দু চোকে দেখিনু ফাঁকি।

(৬)

খোল খোল মন তৃতীয় নয়ন
অসারে মজনা আর,
ভোগে মহা-ভোগ, এ অশান্তি রোগ
কর্ম্মভোগ হাহাকার।

(৭)

ভোগে জন্ম মম, ভোগেতে পালিত
ভোগেতে ধমনী বয়,

ত্যাগের রাগিণী ধর মনবীণা
তোলো মধু তান লয়।

(৮)

(মন।) ত্যাগ। কিবা ত্যাগ? ত্যাজ্য কি তোমার
ত্যাজ্য শুধু অজ্ঞানতা,
ত্যাজ্য অহঙ্কার অবিদ্যা আঁধার
ত্যাজ্য আমি তুমি ভুল) কথা।

(৯)

"চিন্মণি" জড়িত জীবাত্মা সকল
মম প্রিয় প্রাণাধার,
এস বিশ্ববাসী। অসংখ্য বা এক,
'আমি তুমি' ভিন্নাকার।

(১০)

(মন।) ভোগ। কিবা ভোগ? কিবা ভোগ্য মন?
ভোগ 'রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম'' নাম।
ভোগ—নামামৃত উপভোগ সুখ
চিত্ত স্থির, প্রাণারাম।

(১১)

হে সুন্দর। আজি বসন্ত রজনী
চন্দ্রকরোজ্জ্বলা ধরা,
নিঝুম নির্জন শান্তিময় গেহ
তব "চিত্রে" আলো করা।

(১২)

গুঞ্জে চরণে এ মন ভ্রমরী
"প্রাণারাম কৃষ্ণ রাম"
বসন্ত মলয়া পূরিত ধরণী
মধুময় বিশ্বধাম।

(১৩)

মধুর নিশীথে স্মরিয়া "সুন্দরে"
চিত্ত চকোর ভোর,
নিত্য ডাকিও আমারে "সুন্দর!"
ছিঁড়ে দাও মোহ ডোর।

শ্রীসুনীতিবালা সরকার।